পদার্থবিজ্ঞান

নবম-দশম শ্রেণি

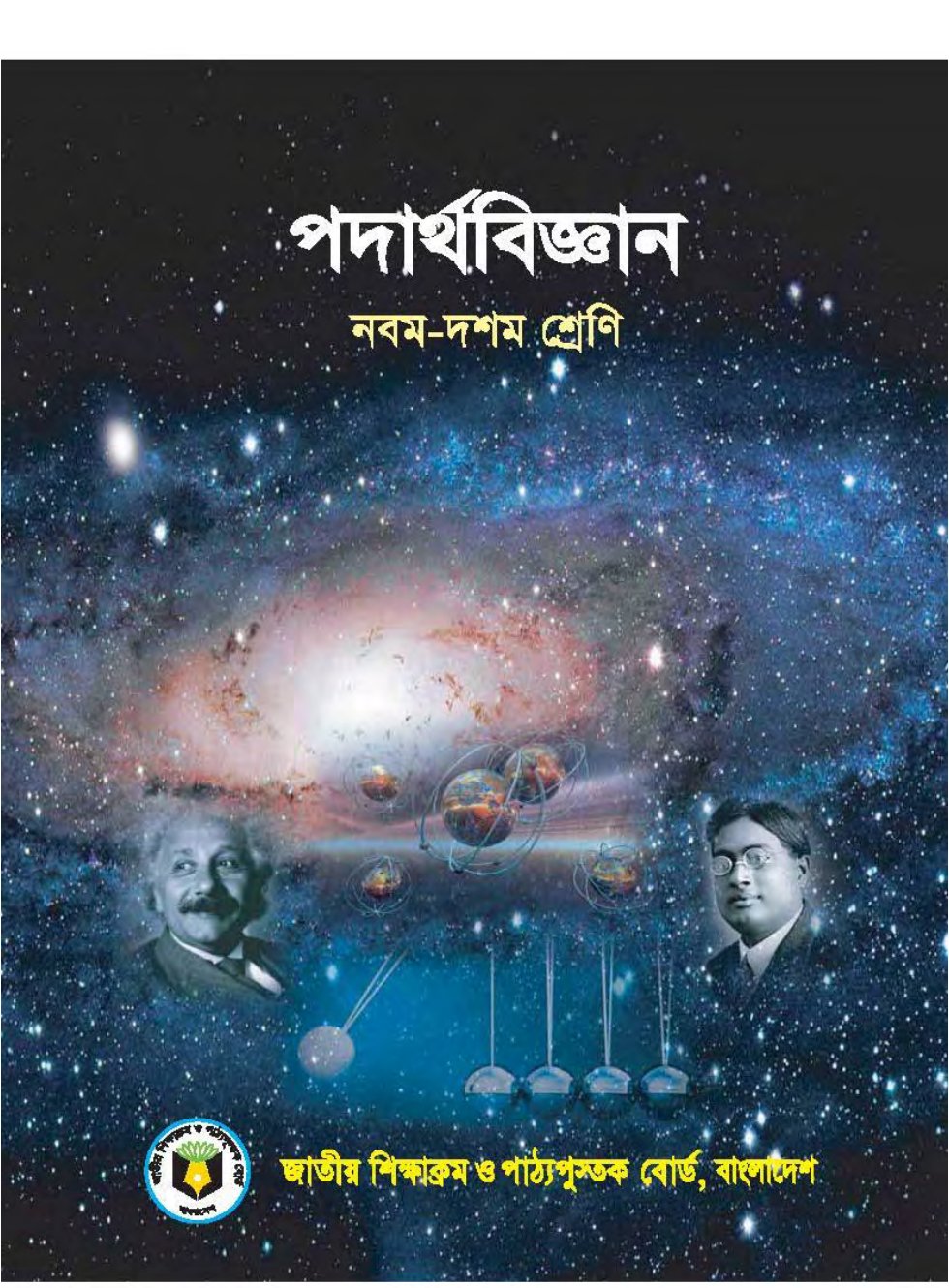

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম–দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

পদার্থবিজ্ঞান

নবম–দশম শ্রেণি

রচনা
ড. শাহজাহান তপন
ড. রানা চৌধুরী
ড. ইকরাম আলী শেখ
ড. রমা বিজয় সরকার

সম্পাদনা
ড. আলী আসগর

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : জুন, ২০১৬

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক
মোঃ মোখলেস উর রহমান

প্রচ্ছদ
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন
মোঃ হাসানুল কবীর সোহাগ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার মেকাপ এন্ড এডিটিং
পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স (প্রাঃ) লিঃ

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত এবং সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

সত্যতার শুরু থেকেই প্রযুক্তি বিকাশের যে অধ্যায় শুরু হয়েছে তার সাথে পদার্থবিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৌশলশাস্ত্র, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান সর্বত্র পদার্থবিজ্ঞানের পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির প্রভূত ব্যবহার রয়েছে। মূলত এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই পদার্থবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া পাঠ্যপুস্তকটি রচনায় আমাদের চারপাশে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার আলোকে পদার্থবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিষয়টির ব্যবহারিক গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতে এ বিষয় সম্পর্কে আরও বেশি আগ্রহী হতে অনুপ্রাণিত করবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়ন ও ট্রাই আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে- যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	ভৌত রাশি ও পরিমাপ	১
দ্বিতীয়	গতি	২৫
তৃতীয়	বল	৪৭
চতুর্থ	কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি	৬৬
পঞ্চম	পদার্থের অবস্থা ও চাপ	৮৬
ষষ্ঠ	বস্তুর উপর তাপের প্রভাব	৯৯
সপ্তম	তরঙ্গ ও শব্দ	১১৩
অষ্টম	আলোর প্রতিফলন	১২৫
নবম	আলোর প্রতিসরণ	১৪১
দশম	স্থির তড়িৎ	১৬০
একাদশ	চল তড়িৎ	১৭৫
দ্বাদশ	তড়িতের চৌম্বক ক্রিয়া	১৯৮
ত্রয়োদশ	আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স	২০৯
চতুর্দশ	জীবন বাঁচাতে পদার্থবিজ্ঞান	২২৭

প্রথম অধ্যায়

ভৌত রাশি ও পরিমাপ

PHYSICAL QUANTITIES AND MEASUREMENT

[। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে বিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভোরের টুথপেস্ট থেকে শুরু করে সারাদিনে ব্যবহৃত ইন্টারনেট, মোবাইলসহ রাতের টেলিভিশন সবই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফসল। বিজ্ঞান মানব জীবনকে করেছে সুন্দর ও সমৃদ্ধ, বাড়িয়ে দিয়েছে আরাম-আয়েশ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু বিজ্ঞানের এই সমৃদ্ধি একদিনে সম্ভব হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে অগণিত বিজ্ঞানীর নিরলস সাধনার ফলে বিজ্ঞান আজকের এই অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ভৌতবিজ্ঞানের বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানের বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনার মাধ্যমে সেই সব নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীদের কাজের সাথে পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করব।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রতিটি কাজের সাথে মাপ-জোখের ব্যাপারটি জড়িত। এই মাপ-জোখের বিষয়টাকে বলা হয় পরিমাপ। পদার্থবিজ্ঞানের প্রায় সকল পরীক্ষণেই বিভিন্ন রাশি পরিমাপ করতে হয়। এই অধ্যায়ে আমরা পরিমাপ, পরিমাপের একক, এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি, পরিমাপের বিভিন্ন যন্ত্র ও এদের ব্যবহার আলোচনা করব।]

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১. পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারব ।

২.

৩. ভৌত রাশি [মান এবং এককসহ] পদার্থবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে পারব ।

৪.

৫. মৌলিক রাশি ও লব্ধ রাশির পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব ।

৬. পরিমাপের আন্তর্জাতিক একক ব্যাখ্যা করতে পারব ।

৭. রাশির মাত্রা হিসাব করতে পারব ।

৮. এককের উপসর্গের গুণিতক ও উপগুণিতকের রূপান্তরের হিসাব করতে পারব ।

৯. বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, প্রতীক এবং চিহ্ন ব্যবহার করে পদার্থবিজ্ঞানের ধারণা এবং তত্ত্বকে প্রকাশ করতে পারব ।

১০. যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ভৌতরাশি পরিমাপ করতে পারব ।

১১. পরিমাপে যথার্থতা, নির্ভুলতা বজায় রাখার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব ।

১২. সরল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সুষম আকৃতির বস্তুর ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করতে পারব ।

১৩. দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সুষম আকৃতির বস্তুসামগ্রীর দৈর্ঘ্য, ভর, ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করতে পারব ।

১.১ পদার্থবিজ্ঞান
Physics

বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থ ও শক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয় সেই শাখাকে বলা হয় পদার্থবিজ্ঞান। পদাথবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণের আলোকে বস্তু ও শক্তির রূপান্তর ও সম্পর্ক উদঘাটন এবং পরিমাণগতভাবে তা প্রকাশ করা ।

পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর

বিজ্ঞানের চাবিকাঠি হলো পদার্থবিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি মৌলিক শাখা কেননা এর নীতিগুলোই বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাসমূহের ভিত্তি তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের একটি মূল নীতি যা হচ্ছে পরমাণুর গঠন থেকে শুরু করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিস্তৃত এলাকার মূল ভিত্তি। প্রকৌশলশাস্ত্র থেকে শুরু করে চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সমুদ্রবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান থেকে শুরু করে মনোবিজ্ঞান সর্বত্র পদার্থবিজ্ঞানের পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির প্রভূত ব্যবহার রয়েছে। পঠন পাঠনের সুবিধার জন্য পদার্থবিজ্ঞানকে আমরা প্রধানত নিম্নোক্ত শাখাগুলোতে ভাগ করতে পারি : (১) বলবিজ্ঞান (২) তাপ ও তাপগতিবিজ্ঞান (৩) শব্দবিজ্ঞান (৪) আলোকবিজ্ঞান (৫) তাড়িত চৌম্বকবিজ্ঞান (৬) কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞান (৭) পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান (৮) নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞান (৯) কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান (১০) ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি।

পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞানের ফসল। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নানা আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। বিজ্ঞানের কোনো জাতীয় বা রাজনৈতিক সীমা নেই। বিজ্ঞানের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ সকল জাতির সকল মানুষের জন্য। প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের উন্নয়নে অবদান রেখে আসছেন। আমরা এই অনুচ্ছেদে পদার্থবিজ্ঞানীদের অবদান তুলে ধরতে চেষ্টা করব। থেলিস (খ্রিস্টপূর্ব ৬২৪–৫৬৯) সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য বিখ্যাত। তিনি লোডস্টোনের চৌম্বক ধর্ম সম্পর্কেও জানতেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে পিথাগোরাস (খ্রিস্টপূর্ব ৫২৭–৪৯৭) একটি স্মরণীয় নাম। বিভিন্ন জ্যামিতিক উপপাদ্য ছাড়াও কম্পমান তারের উপর তাঁর কাজ অধিক স্থায়ী অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানে বাদ্যযন্ত্র ও সংগীত বিষয়ক যে স্কেল রয়েছে তা তারের কম্পন বিষয়ক তাঁর অনুসন্ধানের আংশিক অবদান।

গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০–৩৭০) ধারণা দেন যে পদার্থের অবিভাজ্য একক রয়েছে। তিনি একে নাম দেন এটম বা পরমাণু। পারমাণু সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা বর্তমান ধারণার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হলেও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

গ্রিক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস (খ্রিস্টপূর্ব ২৮৭–২১২) লিভারের নীতি ও তরলে নিমজ্জিত বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল ঊর্ধ্বমুখী বলের সূত্র আবিষ্কার করে ধাতুর ভেজাল নির্ণয়ে সক্ষম হন। তিনি গোলীয় দর্পণের সাহায্যে সূর্যের রশ্মি কেন্দ্রীভূত করে আগুন ধরানোর কৌশলও জানতেন।

আর্কিমিডিসের পর কয়েক শতাব্দীকাল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মন্থর গতিতে চলে। প্রকৃতপক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পুনর্জীবন ঘটেনি। এই সময় পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতা বাইজানটাইন ও মুসলিম সভ্যতার জ্ঞানের ধারা বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিল। আরবরা বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই সময় পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা আলোক তত্ত্বের ক্ষেত্রে ইবনে আল হাইথাম

(৯৬৫–১০৩৯) এবং আল হাজেন (৯৬৫–১০৩৮) এর অবদান বিশেষ উল্লেযোগ্য। টলেমি (১২৭ –১৫১) ও অন্যান্য প্রাচীন বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যেকোনো বস্তু দেখার জন্য চোখ নিজে আলোক রশ্মি পাঠায়। আল হাজেন এই মতের বিরোধিতা করেন এবং বলেন বস্তু থেকে আমাদের চোখে আলো আসে বলেই আমরা বস্তুকে দেখতে পাই। আতশি কাচ নিয়ে পরীক্ষা তাঁকে উত্তল লেন্সের আধুনিক তত্ত্বের কাছাকাছি নিয়ে আসে। আল–মাসুদী (৮৯৬–৯৫৬) প্রকৃতির ইতিহাস সম্পর্কে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া লেখেন। এই বইয়ে বায়ুকলের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে এই বায়ুকলের সাহায্যে তড়িৎশক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে।

রজার বেকন (১২১৪–১২৯৪) ছিলেন পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবক্তা। তাঁর মতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমেই বিজ্ঞানের সব সত্য যাচাই করা উচিত। লিউনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২–১৫১৯) পনেরো শতকের শেষদিকে পাখির উড়া পর্যবেক্ষণ করে উড়োজাহাজের একটি মডেল তৈরি করেছিলেন। তিনি মূলত একজন চিত্রশিল্পী হলেও বলবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য জ্ঞান ছিল। ফলে তিনি কিছু সাধারণ যন্ত্র দক্ষতার সাথে উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন।

গ্যালিলিও –নিউটনীয় যুগে এবং তারও আগে সংখ্যায় কম হলেও কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় তারা অপরিসীম অবদানও রাখেন। ডা. গিলবার্ট (১৫৪০–১৬০৩) চুম্বকত্ব নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা ও তত্ত্ব প্রদানের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। আলোর প্রতিসরণের সূত্র আবিষ্কার করেন জার্মানির স্নেল (১৫৯১–১৬২৬)। হাইগেন (১৬২৬–১৬৯৫) দোলকীয় গতি পর্যালোচনা করেন, ঘড়ির যান্ত্রিক কৌশলের বিকাশ ঘটান এবং আলোর তরঙ্গ তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। রবার্ট হুক (১৬৩৫–১৭০৩) পদার্থের স্থিতিস্থাপক ধর্মের অনুসন্ধান করেন। বিভিন্ন চাপে গ্যাসের ধর্ম বের করার জন্য পরীক্ষা–নীরিক্ষা চালান রবার্ট বয়েল (১৬২৭–১৬৯১)। ভন গুয়েরিক (১৬০২–১৬৮৬)) বায়ু পাম্প আবিষ্কার করেন। রোমার (১৬৪৪–১৭১০) বৃহস্পতির একটি উপগ্রহের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে আলোর বেগ পরিমাপ করেন, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের কেউই বিশ্বাস করেননি যে আলোর বেগ এত বেশি হতে পারে।

কোপার্নিকাস যে সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের ধারণা উপস্থিত করেন কেপলার (১৫৭১–১৬৩০) সেই ধারণার সাধারণ গাণিতিক বর্ণনা দেন তিনটি সূত্রের সাহায্যে। কেপলারের সাফল্যের মূল ভিত্তি হলো, তিনি প্রচলিত বৃত্তাকার কক্ষপথের পরিবর্তে উপবৃত্তাকার কক্ষপথ কল্পনা করেন। গ্রহদের গতিপথ সম্পর্কে তাঁর গাণিতিক সূত্রগুলোর সত্যতা তিনি যাচাই করলেন তার গুরু টাইকোব্রাহের (১৫৪৬–১৬০১) পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যের দ্বারা।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনা ঘটে ইতালির বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর (১৫৬৪–১৬৪২) হাতে। তিনিই প্রথম দেখান যে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সুশৃঙ্খলভাবে ভৌত রাশির সংজ্ঞা প্রদান ও এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ বৈজ্ঞানিক কর্মের মূল ভিত্তি। গাণিতিক তত্ত্ব নির্মাণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে সে তত্ত্বের সত্যতা যাচাইয়ের বৈজ্ঞানিক ধারার সূচনা করেন গ্যালিলিও। আর এর পূর্ণতা দান করেন নিউটন (১৬৪২–১৭২৭)। গ্যালিলিও সরণ, গতি, ত্বরণ, সময় ইত্যাদির সংজ্ঞা প্রদান ও এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করেন। ফলে তিনি বস্তুর পতনের নিয়ম আবিষ্কার ও সৃতিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন। নিউটন তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার দ্বারা আবিষ্কার করেন বলবিদ্যা ও বলবিদ্যার বিখ্যাত তিনটি সূত্র এবং বিশ্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র। আলোক, তাপ ও শব্দবিজ্ঞানেও তার অবদান আছে। গণিতের নতুন শাখা ক্যালকুলাসও তাঁর আবিষ্কার।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ইউরোপকে শিল্প বিপ্লবের দিকে নিয়ে যায়। জেমস ওয়াটের (১৭৩৬–১৮১৯) আবিষ্কৃত বাষ্পীয় ইঞ্জিন শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান ওয়েরস্টেড (১৭৭৭–১৮৫১) দেখান যে, তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া আছে। এই আবিষ্কার মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১–১৮৬৭), হেনরী (১৭৯৭–১৮৭৯) ও লেঞ্জকে (১৮০৪–১৮৬৫) পরিচালিত করে চৌম্বক ক্রিয়া তড়িৎ প্রবাহ উৎপাদন করে এই ঘটনা আবিষ্কারের দিকে। আসলে এটি হলো যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া আবিষ্কার।

১৮৬৪ সালে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১–১৮৭৯) দেখান যে, আলো এক প্রকার তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ। তিনি তড়িৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রকে একীভূত করে তাড়িতচৌম্বক তত্ত্বের বিকাশ ঘটান। ১৮৮৮ সালে হেনরিখ হার্জও (১৮৫৭–১৮৯৪) একই রকম বিকিরণ উৎপাদন ও উদ্ঘাটন করেন। ১৮৯৬ সালে মার্কনী (১৮৭৪–১৯৩৭) এ রকম তরঙ্গ ব্যবহার করে অধিক দূরত্বে মোর্সকোডে সংকেত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তারও আগে বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু (১৮৫৮ – ১৯৩৭) তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি প্রেরণ করতে সক্ষম হন। এভাবে বেতার যোগাযোগ জন্মলাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রনজেন (১৮৪৫–১৯২৩) এক্স–রে এবং বেকেরেল (১৮৫২–১৯০৮) ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন।

বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটে। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (১৮৫৮–১৯৪৭) আবিষ্কার করেন বিকিরণ সংক্রান্ত কোয়ান্টাম তত্ত্ব। আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯–১৯৫৫) প্রদান করেন আপেক্ষিক তত্ত্ব। এই দুই তত্ত্ব আগেকার পরীক্ষালব্ধ ফলাফলকেই শুধু ব্যাখ্যা করেনি, এমন ভবিষ্যদ্বাণীও প্রদান করেছে যা পরে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের (১৮৭১–১৯৩৭) পরমাণু বিষয়ক তত্ত্ব ও নিলস বোরের (১৮৮৫ – ১৯৬২) হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন স্তরের ধারণা পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটে ১৯৩৮ সালে। এই সময় ওটো হান (১৮৭৯–১৯৬৮) ও স্ট্রেসম্যান (১৯০২–১৯৮০) বের করেন যে, নিউক্লিয়াস ফিশনযোগ্য। ফিশনের ফলে একটি বড় ভর সংখ্যাবিশিষ্ট নিউক্লিয়াস প্রায় সমান ভর সংখ্যা বিশিষ্ট দুটি নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হয় এবং নিউক্লিয়াসের ভরের একটি অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়– জন্ম নেয় নিউক্লীয় বোমা ও নিউক্লীয় চুল্লির। বর্তমানে আমরা নিউক্লিয়াস থেকে যে শক্তি পাচ্ছি তা অতীতের সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত শক্তির তুলনায় বিপুল। দিন দিন নিউক্লীয় শক্তি শক্তির একটি প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এই শতাব্দীতেই তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে বিকাশ লাভ করেছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব, আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রভৃতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর সত্যেন্দ্র নাথ বসু (১৮৯৪–১৯৭৪) তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ সূত্রের বিকল্প প্রতিপাদন উপস্থাপন করেন। তার আরেকটি তত্ত্ব বোস– আইনস্টাইন সংখ্যায়ন নামে পরিচিত। তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ একশ্রেণির মৌলিক কণাকে তাঁর নামানুসারে "বোসন" বলা হয়। তিনজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী পাকিস্তানের প্রফেসর আবদুস সালাম (১৯২৬–১৯৯৬), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেলডন গ্লাশো (১৯৩২–) এবং স্টিভেন ওয়াইনবার্গ (১৯৩৩–) একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের বেলায় মৌলিক বলগুলোকে একত্রীকরণের ক্ষেত্রে তাড়িত দুর্বল বল আবিষ্কার করে অসামান্য অবদান রাখেন। তারও আগে ভারতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেংকট রমন (১৮৮৮–১৯৭০) রমনপ্রভাব আবিষ্কার করেন। বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পদার্থবিজ্ঞান রাখছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের

পাশাপাশি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বিভিন্ন চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও অসামান্য অবদান রাখছে। বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের আরেকটি গুরত্বপূর্ণ অগ্রগতি মহাশূন্যে অভিযান। চাঁদে মানুষের পদার্পণ থেকে শুরু করে মঙ্গল গ্রহে অভিযানসহ মহাশূন্য স্টেশনে মাসের পর মাস মানুষের বসবাস জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসামান্য অগ্রগতি। কৃত্রিম উপগ্রহ আবহাওয়ার পূর্বাভাস দানে কিংবা যোগাযোগকে সহজ করতে চমৎকার অবদান রাখছে।

আর ইলেকট্রনিক্স তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিয়ে এসেছে বিপ্লব, পাল্টে দিচ্ছে জীবন যাপন প্রণালি।

রেডিও, টেলিভিশন, ডিজিটাল ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, আইপ্যাড আর কম্পিউটারের কথা এখন ঘরে ঘরে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ও কম্পিউটার মানুষের ক্ষমতাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে।

১.২ পদার্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

Objectives of Physics

পদার্থবিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করে : পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি মৌলিক শাখা কেননা এর নীতিগুলোই বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাসমূহের ভিত্তি তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের একটি মূল নীতি যা হচ্ছে পরমাণুর অভ্যন্তরের অবস্থা থেকে শুরু করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দান পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিস্তৃত এলাকার মৌল ভিত্তি।

যদিও পদার্থ ও শক্তির অধ্যয়নই পদার্থবিজ্ঞানের মূল কাজ বলে বর্ণনা করা যায়, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন তথা প্রকৃতির নিয়মগুলো অনুধাবন করা। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পদার্থবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে, পরমাণু ধনাত্মকভাবে আহিত নিউক্লিয়াস দ্বারা গঠিত যার চারপাশে ইলেকট্রন ঘোরে। পরবর্তী পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে পাওয়া যায় যে, নিউক্লিয়াস প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। এখন পদার্থবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করছেন যে, প্রোটন ও নিউট্রন আরও ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত।

পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে ভালোভাবে বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে যেমন সাহায্য করে তেমনি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তার প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহারই সম্ভবত পদার্থবিজ্ঞানকে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এর কেন্দ্রে পরিণত করেছে। উনিশ শতকের শেষার্ধে ইলেকট্রনের আবিষ্কারই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের উদ্ভাবন ঘটিয়েছে যা বস্তুবিজ্ঞান ও কোষ-জীববিজ্ঞানে বিপ্লব এনেছে।

একদিকে পদার্থবিজ্ঞানে যেমন তত্ত্ব সৃষ্টি ও গণিতের প্রয়োগ আছে অপর দিকে এতে ব্যবহারিক উন্নয়ন বা বিকাশ যেমন, প্রকৌশলশাস্ত্রও রয়েছে। রসায়ন, ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আবহাওয়াবিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে মৌলিক ব্যাখ্যা ও ধারণা গঠনে পদার্থবিজ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এছাড়া জীববিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞানের পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির প্রভূত ব্যবহার রয়েছে।

পদার্থবিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়মগুলো বর্ণনা করে : আমরা যে প্রাকৃতিক জগতে বাস করি, তা কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম যেমন নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র, শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি ইত্যাদি মেনে চলে। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে শিশুকাল থেকে এইসব নিয়মনীতি শিখে আসছি। এই জ্ঞান আমাদের জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক। প্রকৃতির

কাজের নিয়ম–কানুন আমরা পাল্টাতে পারি না, নিয়মগুলোকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। এজন্য প্রয়োজন নিয়মগুলো সম্পর্কে আমাদের প্রচুর জ্ঞান। এছাড়াও আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবীতে অনুসন্ধান চালায় পদার্থবিজ্ঞান।

পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রগুলোর অনুসরণে প্রযুক্তির উন্নতি ঘটে : টেলিভিশন কী করে কাজ করে, রকেট কী করে মহাশূন্যে উড়ে যায়, কৃত্রিম উপগ্রহ কীভাবে পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে, ইন্টারনেট দিয়ে কীভাবে মুহূর্তে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ঘুরে আসা যায়, মোবাইল ফোন কীভাবে কাজ করে, সাবমেরিন কীভাবে পানিতে ডুবে থাকে ইত্যাদি বুঝতে হলে আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রগুলো জানতে হবে। এই সব প্রযুক্তির উদ্ভাবনের মূলে কাজ করছে পদার্থবিজ্ঞানে আবিষ্কৃত নিয়মাবলি।

পদার্থবিজ্ঞান অধ্যয়ন একটি প্রকৃষ্ট মানবিক প্রশিক্ষণ : পদার্থবিজ্ঞান পাঠে আমরা নতুন ধারণা লাভ করতে পারি। কী করে চিন্তা করতে হয়, কারণ দর্শাতে হয়, যুক্তি দিতে হয়, কীভাবে যুক্তিবিজ্ঞান ও এর নিকট আত্মীয় গণিতকে কাজে লাগাতে হয় পদার্থবিজ্ঞান তা আমাদের শিখিয়ে থাকে। এটি আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে এবং চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটায়।

পদার্থবিজ্ঞান আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে শেখায় : পদার্থবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারি। কী করে সঠিক পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ করতে হয়, পদার্থবিজ্ঞান পাঠে তা আমরা জানতে পারি।

১.৩ ভৌত রাশি

Physical quantities

এ ভৌত জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকে আমরা রাশি বলি। যেমন তোমার সামনের ডেস্কের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায়, দৈর্ঘ্য একটি রাশি। তোমার দেহের ভর পরিমাপ করা যায়, ভর একটি রাশি। তুমি কতক্ষণ ধরে স্কুলে আছ সেই সময় মাপা যায়, সময় একটি রাশি। তুমি যদি একটি বইকে উপরে উঠাও, তাহলে কতটুকু কাজ করলে তা পরিমাপ করা যায়, সুতরাং কাজ একটি রাশি। এ ভৌত জগতে এরূপ বহু রাশি আছে। এই সকল রাশির মধ্যে মাত্র কয়েকটি রাশি আছে যেগুলো পরিমাপ করতে অন্য কোনো রাশির সাহায্য প্রয়োজন হয় না। এ রাশিগুলো মৌলিক রাশি। যেমন ডেস্কের দৈর্ঘ্য মাপতে গেলে কেবল দৈর্ঘ্য মাপলেই চলে। এ দৈর্ঘ্য মাপার জন্য অন্য কোনো রাশি মাপতে হয় না বা অন্য কোনো রাশির সাহায্য দরকার হয় না। সুতরাং দৈর্ঘ্য একটি মৌলিক রাশি। অপরদিকে কয়েকটি রাশি ছাড়া অপর যে সকল রাশি আছে সেগুলো মাপতে হলে অন্য রাশির দরকার হয়। যেমন তামার ঘনত্ব পরিমাপ করতে হলে এক খণ্ড তামার ভর এবং আয়তন পরিমাপ করতে হবে এবং ভরকে আয়তন দিয়ে ভাগ করে ঘনত্ব বের করতে হবে। আবার আয়তন মাপতে হলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মাপতে হবে অর্থাৎ তিনবার বা তিনদিকে দৈর্ঘ্য মাপতে হবে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু রাশি আছে, যেগুলো মূল রাশি; এগুলো অন্য রাশির উপর নির্ভর করে না। এই রাশিগুলোকে মৌলিক রাশি বলা হয়।

সুতরাং যে সকল রাশি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ যেগুলো অন্য রাশির উপর নির্ভর করে না বরং অন্যান্য রাশি এদের উপর নির্ভর করে তাদেরকে মৌলিক রাশি বলে। জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখায় মাপ–জোখের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা এরূপ

সাতটি রাশিকে মৌলিক রাশিরূপে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো (১) দৈর্ঘ্য (২) ভর (৩) সময় (৪) তাপমাত্রা (৫) তড়িৎ প্রবাহ (৬) দীপন তীব্রতা ও (৭) পদার্থের পরিমাণ।

আর অন্য সকল রাশি মৌলিক রাশিগুলো থেকে লাভ করা যায় অর্থাৎ এক বা একাধিক মৌলিক রাশির গুণফল বা ভাগফল থেকে প্রতিপাদন করা যায়। এদেরকে বলা হয় লব্ধ রাশি বা যৌগিক রাশি।

সুতরাং যে সকল রাশি মৌলিক রাশির উপর নির্ভর করে বা মৌলিক রাশি থেকে লাভ করা যায় তাদেরকে লব্ধ রাশি বলে।

বেগ, ত্বরণ, বল, কাজ, তাপ, তড়িৎ বিভব ইত্যাদি রাশিগুলো মৌলিক রাশিসমূহ থেকে লাভ করা যায় বলে এগুলো লব্ধ রাশি।

যেমন :

$$\text{বল} = \text{ভর} \times \text{ত্বরণ}$$

$$= \text{ভর} \times \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$$

$$= \text{ভর} \times \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}^2}$$

সুতরাং, বল একটি লব্ধ রাশি।

১.৪ পরিমাপের একক
Units of measurements

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রতিটি কাজের সাথে মাপ-জোখের ব্যাপারটি জড়িত। এ ছাড়াও বিভিন্ন গবেষণার কাজে প্রয়োজন হয় সূক্ষ্ম মাপ-জোখের। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এই মাপ-জোখের বিষয়টাকে বলা হয় পরিমাপ। সাধারণভাবে পরিমাপ বলতে বুঝায় কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করা। যেমন, রিজুর বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব 700 মিটার। সোহেল দোকান থেকে 5 কিলোগ্রাম চাল কিনে আনল। রিনার ক্লাস থেকে অফিস রুমে যেতে 50 সেকেন্ড সময় লাগে। এখানে 700 মিটার হলো বাড়ি থেকে দূরত্বের পরিমাণ। 5 কিলোগ্রাম হলো কিনে আনা চালের ভরের পরিমাণ এবং 50 সেকেন্ড হলো সময়ের পরিমাণ। কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে আমাদের দুইটি জিনিসের প্রয়োজন হয়। একটি সংখ্যা আর একটি একক।

যেকোনো পরিমাপের জন্য প্রয়োজন একটি স্ট্যান্ডার্ড বা আদর্শ পরিমাণের যার সাথে তুলনা করে পরিমাপ করা যায়। পরিমাপের এই আদর্শ পরিমাণকে বলা হয় পরিমাপের একক। মনে করা যাক, কোনো লাঠির দৈর্ঘ্য 4 মিটার। এখানে মিটার হলো দৈর্ঘ্যের একক এবং 1 মিটার বলতে কিছু একটা দৈর্ঘ্য আছে। আর লাঠির দৈর্ঘ্য 4 মিটার বলতে বুঝায় লাঠিটির দৈর্ঘ্য 1 মিটারের 4 গুণ। সময়, আয়তন, বেগ, ভর, বল, শক্তি, তাপমাত্রা, তড়িৎ প্রবাহ ইত্যাদি মাপার জন্য ভিন্ন ভিন্ন একক রয়েছে। এ এককগুলো এমনভাবে ঠিক করা হয়েছে যাতে এগুলো হয় সুবিধাজনক আকারের এবং সহজে ও সঠিকভাবে তা পুনরুৎপাদন করা যায়। এই এককের কয়েকটি ছাড়া বাকিগুলো আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

এসআই (SI)–এর মৌলিক এককসমূহ :

মৌলিক রাশির এককসমূহ যেহেতু অন্য এককগুলোর উপর নির্ভর করে না, তাই মৌলিক একক ইচ্ছেমতো নির্বাচন করা যায়। কিন্তু সেই নির্বাচনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি থাকতে হবে। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও থাকতে হবে। যেমন এটি হতে হবে অপরিবর্তী– স্থান, কাল, পাত্র কোনো কিছুর উপর নির্ভর করবে না। কালের বিবর্তনে বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে এর কোনো পরিবর্তন হবে না। সহজে এককটি পুনরুৎপাদন করা যাবে। 1960 সালে এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি চালুর সময় মৌলিক এককগুলোর যে আদর্শ বা স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করা হয়েছিল পরবর্তীকালে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এদের অনেকগুলোর আদর্শ বদল করা হয়েছে, কিন্তু তাতে এককগুলোর মানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। যেমন এখন আলোর অতিক্রান্ত দূরত্ব দিয়ে মিটারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তার আগে এক প্রকার আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাহায্যে মিটারের সংজ্ঞা দেওয়া হতো। তারও আগে প্যারিসের নিকটে স্যাভ্রেতে রাখা একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্যকে মিটারের আদর্শ ধরা হতো। নিচে আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে মৌলিক এককগুলোর জন্য সর্বশেষ গৃহীত আদর্শ বর্ণনা করা হলো।

দৈর্ঘ্যের একক মিটার : শূন্যস্থানে আলো $\frac{1}{299\,792\,458}$ সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে 1 মিটার (m) বলে।

ভরের একক কিলোগ্রাম : ফ্রান্সের স্যাভ্রেতে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েটস এন্ড মেজারসে রক্ষিত প্লাটিনাম–ইরিডিয়াম সংকর ধাতুর তৈরি একটি সিলিন্ডারের ভরকে 1 কিলোগ্রাম (kg) বলে। এই সিলিন্ডারটির ব্যাস 3.9 cm এবং উচ্চতা 3.9 cm।

সময়ের একক সেকেন্ড : একটি সিজিয়াম – 133 পরমাণুর 9 192 631 770 টি স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে 1 সেকেন্ড (s) বলে।

তাপমাত্রার একক কেলভিন : পানির ত্রৈধ বিন্দুর তাপমাত্রার $\frac{1}{273.16}$ ভাগকে 1 কেলভিন (K) বলে।

তড়িৎ প্রবাহের একক অ্যাম্পিয়ার : শূন্যস্থানে 1 মিটার দূরত্বে অবস্থিত অসীম দৈর্ঘ্যের এবং উপক্ষেণীয় বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদের দুটি সমান্তরাল সরল পরিবাহীর প্রত্যেকটিতে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ চললে পরস্পরের মধ্যে প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে 2×10^{-7} নিউটন বল উৎপন্ন হয় তাকে 1 অ্যাম্পিয়ার (A) বলে।

দীপন তীব্রতার একক ক্যান্ডেলা : ক্যান্ডেলা হচ্ছে সেই পরিমাণ দীপন তীব্রতা যা কোনো আলোক উৎস একটি নির্দিষ্ট দিকে 540×10^{12} হার্জ কম্পাঙ্কের এক বর্ণী বিকিরণ নিঃসরণ করে এবং ঐ নির্দিষ্ট দিকে তার বিকিরণ তীব্রতা হচ্ছে প্রতি স্টেরেডিয়ান ঘনকোণে $\frac{1}{683}$ ওয়াট।

পদার্থের পরিমাণের একক মোল : যে পরিমাণ পদার্থে 0.012 কিলোগ্রাম কার্বন– 12 এ অবস্থিত পরমাণুর সমান সংখ্যক প্রাথমিক ইউনিট (যেমন পরমাণু, অণু, আয়ন, ইলেকট্রন ইত্যাদি বা এগুলোর নির্দিষ্ট কোনো গ্রুপ) থাকে তাকে 1 মোল (mol) বলে।

সারণি
মৌলিক রাশি ও তাদের একক

রাশি	রাশির প্রতীক	এসআই একক	এককের প্রতীক
১.দৈর্ঘ্য (length)	l	মিটার (meter)	m
২. ভর (mass)	m	কিলোগ্রাম (kilogram)	kg
৩. সময় (time)	t	সেকেন্ড (second)	s
৪. তাপমাত্রা (temperature)	θ, T	কেলভিন (kelvin)	K
৫. তড়িৎ প্রবাহ (electric current)	I	অ্যাম্পিয়ার (ampere)	A
৬. দীপন তীব্রতা (luminous intensity)	I_v	ক্যান্ডেলা (candela)	Cd
৭. পদার্থের পরিমাণ (amount of substance)	n	মোল (mole)	mol

এককের গুণিতক ও উপগুণিতক

অনেক সময় মৌলিক এককগুলোর ভগ্নাংশ বা গুণিতক ব্যবহার করা সুবিধাজনক হয়। যখন একটি রাশির মান খুব বড় বা খুব ছোট হয়, তখন নিচের সারণিতে বর্ণিত উপসর্গগুলো খুবই প্রয়োজনীয় হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি বাতাসের দুইটি অণুর মধ্যকার দূরত্ব বিবেচনা করি, তাহলে দেখি যে এই দূরত্ব খুবই ছোট। এটি হচ্ছে 0.000 00001 m। আমরা যদি বার বার এই সংখ্যাটা ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের সাবধান থাকতে হবে প্রতি ক্ষেত্রে শূন্যের সংখ্যা ঠিকমতো উল্লেখ করা হয়েছি কিনা? কিন্তু এই সংখ্যাটাকেই যদি আমরা একটা উপসর্গ ব্যবহার করে লিখি, তাহলে 0.000 00001 m কে হয়তো লিখব 0.01 μm, এখানে 'μ' (মাইক্রো) উপসর্গটি 10^{-6} নির্দেশ করে। তেমনিভাবে যদি বলি আমাদের নবনির্মিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ক্ষমতা 2000 000 000 W। এটাকে যদি আমরা 2000×10^6 W = 2000 MW হিসেবে প্রকাশ করি তাহলে সুবিধা হয়। এককগুলোর পূর্বে দশের সূচকের নিম্নোক্ত উপসর্গগুলো আন্তর্জাতিক প[]তি তে ব্যবহার অনুমোদিত।

গুণিতক/উপগুণিতক	উৎপাদক	সংকেত	উদাহরণ
এক্সা (exa)	10^{18}	E	1 এক্সামিটার = 1 Em = 10^{18} m
পেটা (peta)	10^{15}	P	1 পেটামিটার = 1 Pm = 10^{15} m
টেরা (tera)	10^{12}	T	1 টেরাগ্রাম = 1 Tg= 10^{12} g
গিগা (giga)	10^{9}	G	1 গিগাবাইট = 1 GB= 10^{9} B
মেগা (mega)	10^{6}	M	1 মেগাওয়াট = 1 MW=10^{6} W
কিলো (kilo)	10^{3}	k	1 কিলোভোল্ট = 1 kV=10^{3} V
হেক্টো (hecto)	10^{2}	h	1 হেক্টোজুল = 1hJ=10^{2} J
ডেকা (deca)	10^{1}	da	1 ডেকানিউটন = 1 daN=10^{1} N
ডেসি (deci)	10^{-1}	d	1 ডেসিওম = 1dΩ= 10^{-1} Ω
সেন্টি (centi)	10^{-2}	c	1 সেন্টিমিটার= 1 cm= 10^{-2} m

গুণিতক/উপগুণিতক	উৎপাদক	সংকেত	উদাহরণ
মিলি (milli)	10^{-3}	m	1 মিলিঅ্যাম্পিয়ার = 1 mA= 10^{-3} A
মাইক্রো (micro)	10^{-6}	μ	1 মাইক্রোভোল্ট =1 μV= 10^{-6} V
ন্যানো (nano)	10^{-9}	n	1 ন্যানোসেকেন্ড = 1 ns=10^{-9} s
পিকো (pico)	10^{-12}	p	1 পিকোফ্যারাড =1 pF= 10^{-12} F
ফেমটো (femto)	10^{-15}	f	1 ফেমটোমিটার = 1 fm=10^{-15} m
অটো (atto)	10^{-18}	a	1 অটোওয়াট = 1 aW=10^{-18} W

কোনো সংখ্যাকে 10 এর যেকোনো ঘাত এবং 1 থেকে 10 –এর মধ্যে অপর সংখ্যার গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা হলে তাকে বৈজ্ঞানিক প্রতীক বলে। যেমন 6733000000 হলো 6.733×10^{9} এবং 0.00000846 হলো 8.46×10^{-6}। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এ প্রতীকে প্রকাশিত সংখ্যাটির 10 –এর ধনাত্মক সূচক যত, দশমিক বিন্দুকে ডানদিকে ততঘর সরালে মূল সংখ্যাটি পাওয়া যায়। আর 10 এর ঋণাত্মক সূচক যত দশমিক বিন্দুকে বামদিকে তত ঘর সরালে মূল সংখ্যাটি পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক প্রতীকে প্রকাশিত সংখ্যার ক্ষেত্রে গুণের নিম্নোক্ত সাধারণ নিয়মটি খাটে :

$10^{m} \times 10^{n} = 10^{m+n}$

এখানে m এবং n যেকোনো সংখ্যা – ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে।

যেমন $10^{6} \times 10^{7} = 10^{13}$, $10^{7} \times 10^{-20} = 10^{-13}$

ভাগের ক্ষেত্রেও নিম্নোক্ত নিয়মটি প্রযোজ্য

$$\frac{10^{n}}{10^{m}} = 10^{n} \div 10^{m} = 10^{n-m}$$

যেমন $10^{6} \div 10^{4} = 10^{2}$ বা $10^{3} \div 10^{-7} = 10^{3-(-7)} = 10^{10}$

১.৫ মাত্রা

Dimensions

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, কোনো ভৌত রাশি এক বা একাধিক মৌলিক রাশির সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং যে কোনো ভৌত রাশিকে বিভিন্ন সূচকের (power) এক বা একাধিক মৌলিক রাশির গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা যায়। কোনো ভৌত রাশিতে উপস্থিত মৌলিক রাশিগুলোর সূচককে রাশিটির মাত্রা বলে।

যেমন, বল = ভর × ত্বরণ = ভর × $\frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$ = ভর × $\frac{\text{দৈর্ঘ্য}}{\text{সময়}^2}$ । এখানে দৈর্ঘ্যের মাত্রা L, ভরের মাত্রা M, সময়ের মাত্রা T বসালে বলের মাত্রা পাওয়া যাবে $\frac{ML}{T^2}$ বা MLT^{-2} অর্থাৎ, বলের রয়েছে ভরের মাত্রা (1), দৈর্ঘ্যের মাত্রা (1) এবং সময়ের মাত্রা (- 2)। কোনো রাশির মাত্রা নির্দেশ করতে তৃতীয় কন্ধনী [ ] ব্যবহার করা হয়। যেমন বলের মাত্রা $[F] = MLT^{-2}$

উপরে বর্ণিত তিনটি মৌলিক রাশি দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় ছাড়া অন্যান্য মৌলিক রাশিসমূহের মাত্রা হলো :

তাপমাত্রার মাত্রা হলো Θ (বড় হাতের গ্রিক অক্ষর θ), তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা হলো I, দীপন তীব্রতার মাত্রা হলো J এবং পদার্থের পরিমাণের মাত্রা হলো N।

মাত্রা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা কোনো সমীকরণ বা ফর্মুলার সঠিকতা যাচাই করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ

$s = ut + \frac{1}{2}at^2$

সমীকরণটি বিবেচনা করা যাক। আমরা জানি কেবলমাত্র একই জাতীয় রাশির যোগ, বিয়োগ বা সমতা সম্ভব। সুতরাং একটি সমীকরণের প্রতিটি পদ অবশ্যই একই জাতীয় রাশিকে নির্দেশ করতে হবে, অর্থাৎ প্রতিটি পদের মাত্রা একই হতে হবে। এখন উপরোক্ত সমীকরণে তিনটি পদ আছে, বাঁদিকে একটি এবং ডানদিকে দুইটি। এই সমীকরণে

s হলো সরণ, এর মাত্রা L

u হলো আদি বেগ, এর মাত্রা $\frac{L}{T} = LT^{-1}$

a হলো ত্বরণ, এর মাত্রা $\frac{L}{T^2} = LT^{-2}$

t হলো সময়, এর মাত্রা T

$\therefore$ ut–এর মাত্রা হলো $LT^{-1} \times T = L$

at^2 এর মাত্রা হলো $LT^{-2} \times T^2 = L$

দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত সমীকরণের বামদিকের পদটির মাত্রা L এবং ডান দিকের দুইটি পদের মাত্রাও L।

সুতরাং, সমীকরণটি সিদ্ধ।

১.৬ বৈজ্ঞানিক প্রতীক ও সংকেত

Scientific symbols and notations

বলা হয়ে থাকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষা হচ্ছে গণিত। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোকে আমরা সাধারণত গাণিতিক সমীকরণ আকারে প্রকাশ করে থাকি। সেই সূত্র বা সমীকরণকে কাজে লাগিয়ে পদার্থবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে থাকেন। এর জন্য বিভিন্ন রাশির বা এককের জন্য বিভিন্ন সংকেত ও প্রতীক ব্যবহার করা হয় এবং তা করা হয় এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। শুধু পদার্থবিজ্ঞানই নয়, যেকোনো বিষয়ে তথা জ্ঞান বিজ্ঞানের যে কোনো শাখা প্রশাখায়ই পরিমাপ করতে গিয়ে আজকাল এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে।

এককের সংকেত ও বিভিন্ন রাশির মান লেখার জন্য এই বইয়ে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

১। কোনো রাশির মান প্রকাশ করার জন্য একটি সংখ্যা লিখে তারপর একটি ফাঁক (ফাকা জায়গা বা space যা আসলে গুণ বুঝায়) রেখে এককের সংকেত লিখে প্রকাশ করতে হয়। যেমন "2.21 kg", "7.3×10^2 m^2", "22 K"। শতকরা চিহ্নও (%) এই নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে কোণের একক তথা ডিগ্রি, মিনিট বা সেকেন্ড (°, ′ এবং ″) লেখার সময়। এই সকল ক্ষেত্রে সংখ্যার ক্ষেত্রে কোনো ফাঁক (space) দিতে হয় না।

২। গুণনে প্রাপ্ত লব্ধ একক লেখার সময় দুই এককের মাঝখানে একটা ফাঁক (space) দিতে হয় যেমন N m.

৩। ভাগ দ্বারা গঠিত লব্ধ এককের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক সূচক হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন মিটার / সেকেন্ড (মিটার প্রতি সেকেন্ড metre per second) কে $m\ s^{-1}$ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

৪। প্রতীকগুলো যেহেতু গাণিতিক প্রকাশ, কোনো কিছুর সংক্ষিপ্ত রূপ (abbreviations) নয়, কাজেই তাদের সাথে কোনো যতি চিহ্ন বা ফুল স্টপ [full stop (.)] ব্যবহৃত হয় না।

৫। এককের সংকেত লেখা হয় সোজা অক্ষরে (Roman type) যেমন মিটারের (metre) জন্য m, সেকেন্ডের জন্য s ইত্যাদি। কোনো রাশির সংকেত লিখতে হয় বাঁকা হরফে (*italic* type) যেমন ভরের (mass) জন্য *m*, সরণের (displacement) জন্য *s* ইত্যাদি। এই সকল রাশির সংকেত ও একক লেখার সময় আগে পরে কোন ভাষার কোন ফন্ট (font) ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে কিছু যায় আসে না।

৬। এককের সংকেত ছোট হাতের হরফে (lower case) লেখা হয় (যেমন "m", "s", "mol")। তবে যে সকল একক ব্যক্তির নাম থেকে নেওয়া হয়েছে সেগুলোর সংকেত লেখার সময় (এক অক্ষরের হলে) বড় হাতের হরফে বা প্রথম অক্ষর (একাধিক অক্ষরের ক্ষেত্রে) বড় হাতের হরফে হবে। যেমন নিউটনের নামানুসারে গৃহীত একক নিউটন হবে N এবং প্যাস্কালের নামানুসারে গৃহীত একক হবে Pa। তবে পুরো একক লিখলে অবশ্যই ছোট হাতের হরফে হবে যেমন newton বা pascal।

৭। এককের উপসর্গ এককেরই অংশ বিধায় এর সংকেত এককের সাথে কোনো ফাঁক ছাড়াই যুক্ত হয়। যেমন km–এ k, MW এ M, GHz–এ G। একাধিক উপসর্গ অনুমোদিত নয় যেমন μμF হবে না, হবে pF।

৮। কিলো (10^3) এর চেয়ে বড় সকল উপসর্গ বড় হাতের হরফে হবে।

৯। এককের সংকেতগুলোর কখনো বহুবচন হয় না। যেমন "25 kg", হবে, কিন্তু "25 kgs" হবে না।

১০। কোনো সংখ্যা বা কোনো যৌগিক একক বা সংখ্যা ও একক দুই লাইনে লেখা (line-break) পরিহার করা উচিত। খুব প্রয়োজন হলে সংখ্যা ও এককে দুই ভাগ করা যেতে পারে (line-break)।

১.৭ পরিমাপের যন্ত্রপাতি

Measuring instruments

মিটার স্কেল

পরীক্ষাগারে দৈর্ঘ্য পরিমাপের সবচেয়ে সরল যন্ত্র হলো মিটার স্কেল। এর দৈর্ঘ্য 1 মিটার বা 100 সেন্টিমিটার। এজন্য একে মিটার স্কেল বলা হয়। এই স্কেলের এক পাশ সেন্টিমিটার এবং অপর পাশ ইঞ্চিতে দাগ কাটা থাকে। প্রত্যেক সেন্টিমিটারকে সমান দশ ভাগে ভাগ করা থাকে। এই প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় 1 মিলিমিটার বা 0.1 সেন্টিমিটার। প্রত্যেক ইঞ্চিকে সমান আট ভাগ, দশ ভাগ বা ষোলো ভাগে ভাগ করা হয়।

মিটার স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ : মিটার স্কেলের সাহায্যে যে দন্ড বা কাঠির দৈর্ঘ্য মাপতে হবে তার একপ্রান্ত স্কেলের 0 দাগে বা কোনো সুবিধাজনক দাগে স্থাপন করতে হবে। দন্ডের অপর প্রান্তে স্কেলের যে দাগের সাথে মিশেছে তার পাঠ নিতে হবে। দন্ডের দুই প্রান্তের পাঠের বিয়োগফল হলো দন্ডের দৈর্ঘ্য। সাধারণভাবে যে দন্ডের

দৈর্ঘ্য মাপতে হবে তার বাম প্রান্ত স্কেলের x দাগে স্থাপন করলে যদি ডান প্রান্ত y দাগের সাথে মিশে যায় তবে দণ্ডের দৈর্ঘ্য $L = y - x$। এ স্কেলের সাহায্যে মিলিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে মাপা যায়। এর চেয়ে সূক্ষ্ম পরিমাপ করতে হলে ব্যবহার করতে হয় ভার্নিয়ার স্কেল।

ভার্নিয়ার স্কেল

সাধারণ মিটার স্কেলে আমরা মিলিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মাপতে পারি। মিলিমিটারের ভগ্নাংশ যেমন 0.2 মিলিমিটার, 0.6 মিলিমিটার বা 0.8 মিলিমিটার ইত্যাদি মাপতে হলে আমাদের ব্যবহার করতে হয় ভার্নিয়ার স্কেল। গণিত শাস্ত্রবিদ পিয়েরে ভার্নিয়ার এ স্কেল আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারে এ স্কেলের নাম ভার্নিয়ার স্কেল।

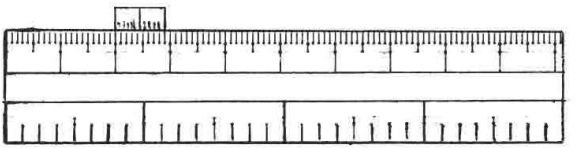

চিত্র : ১.১

মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের ভগ্নাংশের নির্ভুল পরিমাপের জন্য মূল স্কেলের পাশে যে ছোট আর একটি স্কেল ব্যবহার করা হয় তার নাম ভার্নিয়ার স্কেল। ভার্নিয়ার স্কেলকে মিটার স্কেলের সাথে ব্যবহার করে মিলিমিটারের ভগ্নাংশ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

ভার্নিয়ার স্কেল মূল বা প্রধান স্কেলের পাশে সংযুক্ত থাকে এবং প্রধান স্কেলের পাশ দিয়ে সামনে বা পেছনে সরানো যায়। ধরা যাক, একটি ভার্নিয়ার স্কেলে দশটি ভাগ আছে তথা দশটি দাগ কাটা আছে। এই দশ ভাগ প্রধান স্কেলের নয়টি ক্ষুদ্রতম ভাগের সমান (চিত্র : ১.১)। প্রধান স্কেলের নয়টি ক্ষুদ্রতম ভাগ হলো 9 মিলিমিটার বা 0.9 সেন্টিমিটার। ভার্নিয়ার স্কেলের 10 ভাগ যেহেতু প্রধান স্কেলের 9 ক্ষুদ্রতম ভাগের সমান। সুতরাং ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগগুলো প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের চেয়ে সামান্য ছোট। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের চেয়ে ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগ কতটুকু ছোট তার পরিমাণকে বলা হয় ভার্নিয়ার ধ্রুবক (Vernier Constant)। একে সাধারণত VC লেখা হয়। একটি সহজ সূত্র দ্বারা ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ণয় করা যায় তা হলো, ভার্নিয়ার ধ্রুবক $= \frac{s}{n}$ যেখানে s প্রধান স্কেলের 1 ক্ষুদ্রতম ভাগের দৈর্ঘ্য এবং n ভার্নিয়ারের ভাগের সংখ্যা।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে s = 1 মিমি এবং $n = 10$ ভাগ

$$\therefore \text{ভার্নিয়ার ধ্রুবক} = \frac{s}{n} = \frac{1 \text{ মিমি}}{10} = 0.1 \text{ মিমি} = 0.01 \text{ সেমি}$$

কোনো কোনো সময় ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ভাগ প্রধান স্কেলের 19 ক্ষুদ্রতম ভাগের সমান থাকে এবং প্রধান স্কেলের এক ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm –এর চেয়ে কম থাকে। তখন ভার্নিয়ার ধ্রুবক পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ভর করে প্রধান স্কেল ও ভার্নিয়ার স্কেলের দাগ কাটার বৈশিষ্ট্যের উপর।

স্লাইড ক্যালিপার্স

স্লাইড ক্যালিপার্সের অপর নাম ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স। কারণ এই যন্ত্রে মাপজোখের বেলায় ভার্নিয়ার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। একটি আয়তকার ইস্পাত দণ্ডের গায়ে দাগ কেটে স্লাইড ক্যালিপার্সের মূল বা প্রধান স্কেল তৈরি করা হয়। প্রধান স্কেলের যে প্রান্তে শূন্য দাগ কাটা থাকে অর্থাৎ যে প্রান্ত থেকে স্কেলের সূচনা হয় সেই প্রান্তে একটি ধাতব চোয়াল আটকানো থাকে। মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের ভগ্নাংশের নির্ভুল পরিমাপের জন্য মূল স্কেলের গায়ে চোয়ালযুক্ত একটি ছোট স্কেল পরানো থাকে। এর নামই ভার্নিয়ার স্কেল। (চিত্র : ১.২)।

চিত্র : ১.২

এই চোয়ালযুক্ত ভার্নিয়ার প্রধান স্কেলের উপর সামনে বা পেছনে সরানো যায়। এই স্কেলের সাথে একটি স্ক্রু থাকে। এই স্ক্রুর সাহায্যে ভার্নিয়ার স্কেলকে প্রধান স্কেলের গায়ে যেকোনো জায়গায় আটকিয়ে রাখা যায়। প্রধান স্কেলের চোয়াল এবং ভার্নিয়ার স্কেলের চোয়াল যখন লেগে থাকে তখন সাধারণত ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে যায়। ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করে মিলিমিটারের ভগ্নাংশ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

উপরে ভার্নিয়ার স্কেল পরিচ্ছদে বর্ণিত উপায়ে স্লাইড ক্যালিপার্সের ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ণয় করা হয় ।

স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে পরিমাপ : মনে করা যাক, কোনো একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে। দণ্ডটিকে স্লাইড ক্যালিপার্সের চোয়াল দুইটির মাঝখানে স্থাপন করতে হয়। ভার্নিয়ার স্কেলের সাথে লাগানো চোয়াল ঠেলে সামনে আনতে হয় যাতে প্রধান স্কেলের চোয়াল ও ভার্নিয়ারের চোয়াল বস্তুটিকে বিপরীত দিক থেকে স্পর্শ করে। দণ্ডটির বাম প্রান্ত প্রধান স্কেলের শূন্য (0) দাগের সাথে মিলিয়ে ভার্নিয়ারটি সামনে বা পেছনে সরিয়ে দণ্ডের ডান প্রান্তের সাথে মিলানো হয়। মনে করা যাক, দণ্ডের ডান প্রান্ত স্কেলের M মিমি দাগ অতিক্রম করেছে। তাহলে এর দৈর্ঘ্য M ও $(M + 1)$ মিমি এর মাঝামাঝি। এই M মিমি –এর চেয়ে বাড়তি দৈর্ঘ্য ভার্নিয়ার ব্যবহার করে বের করতে হবে। এর দৈর্ঘ্যটুকু হবে ভার্নিয়ার পাঠ।

এবার দেখতে হবে ভার্নিয়ারের কোন দাগটি প্রধান স্কেলের কোনো একটি দাগের সাথে মিলেছে। যদি কোনো দাগ না মিলে থাকে, তাহলে দেখতে হবে ভার্নিয়ারের কোন দাগটি প্রধান স্কেলের কোনো একটি দাগের সাথে সবচেয়ে কাছাকাছি হয়েছে। ভার্নিয়ার স্কেলের এই দাগই হবে ভার্নিয়ারের সমপাতন।

মনে করা যাক, ভার্নিয়ারের V নম্বর দাগটি প্রধান স্কেলের একটি দাগের সাথে মিলেছে বা কাছাকাছি হয়েছে। সুতরাং যন্ত্রের ভার্নিয়ার ধ্রুবক VC হলে

দণ্ডের দৈর্ঘ্য = প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ

= প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার সমপাতন × ভার্নিয়ার ধ্রুবক

অর্থাৎ, $L = M + V \times VC$

উদাহরণ : ধরা যাক, দন্ডের B প্রান্ত প্রধান স্কেলের 12 mm দাগ অতিক্রম করেছে এবং ভার্নিয়ারের 7 নম্বর দাগটি প্রধান স্কেলের একটি দাগের সাথে মিলেছে। তাহলে দন্ডের দৈর্ঘ্য হবে

$L = 12 \text{ mm} + 7 \times 0.1 \text{ mm}$ (ভার্নিয়ার ধ্রুবক হলো 0.1 mm)

$= 12.7 \text{ mm} = 1.27 \text{ cm}$

প্রধান স্কেলের চোয়াল এবং ভার্নিয়ার স্কেলের চোয়াল যখন লেগে থাকে তখন সাধারণত ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে যায়। অনেক যন্ত্রের নাও মিলতে পারে। তখন বুঝতে হবে যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে এবং এর জন্য পাঠ সংশোধন করে নিতে হয়।

স্ক্রু গেজ

এই যন্ত্রের সাহায্যে তারের ব্যাসার্ধ, সরু চোঙের ব্যাসার্ধ ও ছোট দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায়। এতে রয়েছে দুই প্রান্তে দুইটি সমান্তরাল বাহুবিশিষ্ট U আকৃতির ফ্রেম কাঠামো F (চিত্র : ১.৩)।

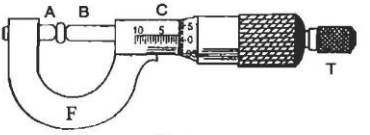

চিত্র : ১.৩

এর এক বাহুর সমতল পিঠ A এর সাথে একটি সমতল প্রান্তবিশিষ্ট দন্ড বা কীলক স্থায়ীভাবে আটকানো রয়েছে এবং অপর বাহুতে রয়েছে একটি ফাঁপা নল C। এই নলে রয়েছে মিলিমিটারে দাগাঙ্কিত একটি সরল স্কেল এবং একটি বেলনাকৃতির টুপি T পরিহিত একটি স্ক্রু। স্ক্রুটি ফাঁপা নল C এর ভিতর চলাফেরা করতে পারে। বেলনাকৃতি টুপি T এর কিনারাকে সাধারণত 50 বা 100 ভাগ করা হয়। স্ক্রুর মাথা B যখন স্থায়ী কীলক বা সমতল প্রান্তবিশিষ্ট দন্ড A স্পর্শ করে তখন বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে যায়। এরকম অবস্থায় দুইটি স্কেলের শূন্য দাগ যদি মিলে না যায় তাহলে বুঝতে হবে যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে।

টুপি T একবার ঘুরালে এর যতটুকু সরণ ঘটে এবং রৈখিক স্কেল বরাবর যে দৈর্ঘ্য এটি অতিক্রম করে তাকে বলা হয় স্ক্রুর পিচ (Pitch)। বৃত্তাকার স্কেলের মাত্র এক ভাগ ঘুরালে – এর প্রান্ত বা স্ক্রুটি যতটুকু সরে আসে তাকে বলা হয় যন্ত্রের লঘিষ্ঠ গণন (Least Count)। একে LC দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যন্ত্রের পিচকে বৃত্তাকার স্কেলের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে লঘিষ্ঠ গণন পাওয়া যায়। সুতরাং,

$$\text{লঘিষ্ঠ গণন} = \frac{\text{পিচ}}{\text{বৃত্তাকার স্কেলের ভাগের সংখ্যা}}$$

বৃত্তাকার স্কেলে সাধারণত 100 ভাগ থাকে এবং এই যন্ত্রে পিচ থাকে 1 mm।

$\therefore$ লঘিষ্ঠ গণন = $\frac{1}{100}$ mm = 0.01 mm।

স্ক্রু গেজের সাহায্যে পরিমাপ : যে তারের ব্যাস মাপতে হবে বা যে পাতের পুরুত্ব বের করতে হবে তাকে A ও B এর মাঝে স্থাপন করতে হবে। তার বা পাতটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে এর এক পাশ A কে এবং অপর পাশ B কে স্পর্শ করে। এবার বৃত্তাকার ও রৈখিক স্কেলের পাঠ নিতে হবে। মনে করা যাক, রৈখিক স্কেলের পাঠ L mm এবং বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা C। সুতরাং, তারের ব্যাস বা পাতের পুরুত্ব হবে :

ব্যাস বা পুরুত্ব = রৈখিক স্কেল পাঠ + বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা × লঘিষ্ঠ গণন

অর্থাৎ $D = L + C \times LC$

উদাহরণ : মনে করা যাক, রৈখিক স্কেল পাঠ 3 mm এবং বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা 20, তখন তারের ব্যাস

= 3 mm + 20 ×0.01 mm = 3 mm + 0.2 mm = 3.2 mm।

স্ক্রুর মাথা যখন সমতল প্রান্তবিশিষ্ট দণ্ড A স্পর্শ করে তখন বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ যদি রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে না যায় তাহলে বুঝতে হবে যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে। এর জন্য পাঠ সংশোধন করে নিতে হয়।

তুলা যন্ত্র

কোনো কোনো সময় পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নে খুব অল্প পরিমাণ জিনিসের ভর সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করতে হয়, যা সাধারণ নিক্তি দিয়ে করা যায় না। বস্তু বা পদার্থের পরিমাণ যত কম হবে তার ভর পরিমাপের নিক্তি হতে হবে তত সূক্ষ্ম। এরকম একটি সূক্ষ্ম নিক্তি হলো তুলা যন্ত্র বা ব্যালান্স। এই যন্ত্র পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন ল্যাবরেটরিতে কোনো অল্প জিনিসের ভর সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। কারণ ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষাগারে কোনো জিনিসের ভর পরিমাপ সঠিক না হলে পরীক্ষণ থেকে ভুল ফলাফল আসতে পারে এবং পরীক্ষণটির উদ্দেশ্য ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে।

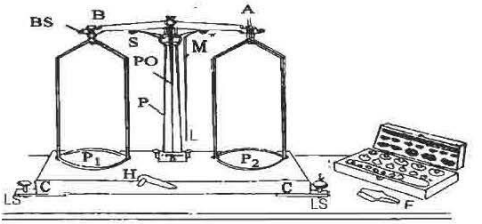

চিত্র : ১.৪

তুলা যন্ত্রে সাধারণ নিক্তির মতো দুইটি সমান ওজনের পাল্লা P_1 ও P_2 নিক্তির দুইপ্রান্তে থাকে (চিত্র : ১.৪)। এই পাল্লা দুইটি একটি ধাতব দণ্ড AB এর দুই প্রান্তে দুইটি খাঁজের মধ্যে উল্টানো ছুরির ফালের উপর দুইটি সমান ওজনের ফ্রেমের সাহায্যে ঝুলানো থাকে। AB দণ্ডের কেন্দ্রে একটি ছুরি (knife) আটকিয়ে দেওয়া হয়। এটি নিচের দিকে মুখ করে থাকে।

AB দণ্ডটিকে একটি উলম্ব ফাঁপা থাম P–এর উপর রাখা হয়। এই থামটি একটি কাঠের পাটাতন (CC) –এর মাঝখানে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। এই পাটাতনের সাথে তিনটি লেভেলিং স্ক্রু (LS) থাকে। (তৃতীয়টি চিত্রে দেখানো হয়নি)। এসব স্ক্রুর সাহায্যে যন্ত্রটিকে লেভেলিং করা হয়। ফাঁপা থামটির মধ্যে একটি নিরেট ধাতব দণ্ড পাটাতন সংলগ্ন হাতল H ঘুরিয়ে উঠানো নামানো যায়।

দণ্ড AB–এর ঠিক মধ্যস্থলে একটি ত্রিকোণাকৃতি অ্যাগেট পাথরের মোটা দিকটা আটকিয়ে সরু ধারটা থামটির নিরেট দণ্ডের উপর অবস্থিত একটি অ্যাগেট প্লেটের উপর বসানো থাকে। নিরেট দণ্ডকে উপরে তুললে দণ্ড AB অ্যাগেট পাথরের সরু দিকটাকে ফালক্রাম করে দুলতে পারে।

তুলাদণ্ডের মধ্যস্থলে একটি লম্বা সূচকের (PO) চওড়া দিকটা আটকিয়ে এর নিচের সরু প্রান্তকে একটি স্কেলের উপর মুক্ত রাখা হয়। তুলাদণ্ড আনুভূমিক থাকলে সূচকের সরু প্রান্ত স্কেলের 0 দাগের উপর থাকে। ওলন দড়ি (ML) ও পাটাতনের নিচের স্ক্রুর সাহায্যে দণ্ডটিকে আনুভূমিক করা হয়। সমগ্র যন্ত্রটিকে একটি কাচের বক্সে রাখা হয়।

তুলা যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ : তুলা যন্ত্রটি ব্যবহারের সময় হাতল H ঘুরিয়ে থামটিকে উপরে উঠাতে হবে, এতে AB দণ্ডটিও উপরে উঠবে এবং ছুরির কিনারার উপর মুক্তভাবে দুলতে থাকবে। দণ্ডের সাথে পাল্লা দুইটিও উপরে নিচে দুলতে থাকবে। হাতল H উল্টা দিকে ঘুরালে থাম নিচে নেমে যাবে এবং দণ্ড AB ও পাল্লার দোলন বন্ধ হয়ে যাবে।

AB দণ্ড দুলতে থাকলে সূচক কাঁটাটি নিচের স্কেলের উপর ডানে বামে দুলতে থাকবে। পাল্লায় কোনো জিনিস না থাকলে সূচকটির দোলন স্কেলের শূন্য দাগের দুইপাশে সমান হবে। এই দোলন শূন্য দাগের দুইপাশে সমান না হলে AB দণ্ডের দুই পাশের সমন্বয় স্ক্রু (BS) দ্বারা এমনভাবে সমন্বয় করে নিতে হবে যাতে সূচকের দোলন স্কেলের শূন্য দাগের দুইপাশে সমান হয়। থাম P উলম্ব হলো কি না ওলন রেখা ML দ্বারা দেখে নিতে হয়।

কোনো বস্তু বা জিনিসের ভর মাপতে হলে বস্তুটিকে বামদিকের পাল্লায় রাখতে হয় এবং ডান দিকের পাল্লায় একটা একটা করে জানা বাটখারা ধীরে ধীরে রাখতে হয় যতক্ষণ না সূচকটি স্কেলের শূন্য দাগের দুই পাশে সমানভাবে দুলতে থাকে। এভাবে জানা বাটখারার সাহায্যে বস্তুর ভর নির্ণয় করা যায়।

থামা ঘড়ি

ক্ষুদ্র সময় ব্যবধান পরিমাপের জন্য থামা ঘড়ি (Stop watch) ব্যবহার করা হয়। এখন থামা ঘড়ি দুই ধরনের হয়ে থাকে; ডিজিটাল থামা ঘড়ি এবং এনালগ থামা ঘড়ি। এনালগ থামা ঘড়ির চেয়ে ডিজিটাল থামা ঘড়ি অনেক নির্ভুল পাঠ দেয়। একটি এনালগ থামা ঘড়ি যেখানে ± 0.1s পর্যন্ত নির্ভুলভাবে পাঠ দিতে পারে সেখানে একটি ডিজিটাল থামা ঘড়ি ± 0.01 s পর্যন্ত সঠিকভাবে পাঠ দিতে পারে। আজকাল ডিজিটাল ঘড়ি এবং মোবাইলেও থামা ঘড়ি থাকে।

কোনো সময় পরিমাপ করতে হলে ঘড়িটি হাত দিয়ে চালু করতে হয় এবং বন্ধও করতে হয়। এতে সময় ব্যবধানের পাঠে একটি ত্রুটি চলে আসে, যা কমপক্ষে এক সেকেন্ডের একটি বড়সড় ভগ্নাংশ। যদিও এটি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে

পরিবর্তিত হয়। বয়স্ক লোকদের তুলনায় তরুণদের এই ত্রুটির পরিমাণ কম হয়। অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে এই ত্রুটির পরিমাণ হয় প্রায় 0.3 s।

১.৮ পরিমাপে ত্রুটি ও নির্ভুলতা

Error and accuracy in measurement

সব পরিমাপের নির্ভুলতারই একটি সীমা আছে। ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং পরীক্ষকের দক্ষতার উপর পরিমাপের নির্ভুলতা নির্ভর করে। ধরা যাক, একটি মিটার স্কেল সেন্টিমিটার ও সেন্টিমিটারের দশমাংশে (মিলিমিটারে) দাগ কাটা আছে। এই মিটার স্কেল দ্বারা যদি আমরা এই বইটির দৈর্ঘ্য মাপতে যাই তাহলে ফলাফল হয়তো 0.1 cm (স্কেলের ক্ষুদ্রতম একভাগ) সঠিক বা নির্ভুল হতে পারে। যদি কোনো ঘরের দৈর্ঘ্য মাপা হয় তাহলে নির্ভুলতা হয়তো আরো কমে যাবে। কারণ স্কেলটি কয়েকবার পরপর রেখে দৈর্ঘ্য মাপতে হবে। প্রত্যেকবার স্কেলের সম্মুখ প্রান্তের অবস্থান মেঝেতে চিহ্নিত করতে হবে। এর ফলে পরিমাপের ভুলের উৎস আরও বেড়ে যাবে। অর্থাৎ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

পরিমাপের নির্ভুলতা পরিমাপের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সব পরীক্ষকেরই উচিত তার পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে ফলাফলের নির্ভুলতার পরিমাণ উল্লেখ করা। এই বই –এর দৈর্ঘ্য হয়তো 26.0 cm ±0.1 cm লেখা যেতে পারে। সংকেত ± এর অর্থ হলো যে, বই এর প্রকৃত দৈর্ঘ্য 25.9 cm ও 26.1 cm –এর মধ্যে রয়েছে। 0.1 cm হলো পরিমাপের অনিশ্চয়তা বা ত্রুটি।

পরিমাপের বেলায় সাধারণত তিন ধরনের ত্রুটি থাকতে পারে। এগুলো হলো :

(ক) দৈব ত্রুটি
(খ) যান্ত্রিক ত্রুটি
(গ) ব্যক্তিগত ত্রুটি

(ক) দৈব ত্রুটি : কোনো একটি ধ্রুব রাশি কয়েকবার পরিমাপ করলে যে ত্রুটির কারণে পরিমাপকৃত মানে অসামঞ্জস্য দেখা যায় তাকে দৈব ত্রুটি বলে। 'দৈব' নাম থেকেই বুঝা যায় এই ত্রুটি সম্পর্কে আগেই অনুমান করা যায় না এবং এই ত্রুটির প্রত্যাশিত মান হবে শূন্য। কেননা পরিমাপকৃত মানগুলো সঠিক মানের এদিক সেদিক ইতস্ততভাবে থাকবে এবং একই যন্ত্র দিয়ে একই রাশির মান বারবার পরিমাপ করলে এ ত্রুটিগুলোর গড় মান শূন্য হওয়া উচিত। ঘরের দৈর্ঘ্য মাপার জন্য যতবারই মিটার স্কেলটি ঘরের মেঝেতে ফেলা হয় ততবারই দৈব ত্রুটি পরিমাপের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রত্যেকবার মিটার স্কেল ফেলার পর সম্মুখ প্রান্তের অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য মেঝেতে যে দাগ দেওয়া হয়, তা প্রকৃত দাগ থেকে কিছুটা সামনে বা পেছনে দেওয়া হয়। এই দাগের সাথে মিলিয়ে যখন আবার মিটার স্কেলটি ফেলা হয় তখন আরও একটি দৈব ত্রুটি পরিমাপে এসে যায়। এ দাগের সাথে মিলানোর সময়ও স্কেলটির পেছনের প্রান্ত কখনো দাগের কিছুটা সম্মুখে বা পেছনে মিলানো হয়। দৈব ত্রুটির ফলে চূড়ান্ত ফলাফল হয়তো অত্যন্ত বেশি বা খুব কম হয়ে যেতে পারে। দৈব ত্রুটিকে এড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু, সতর্কতা অবলম্বন করলে এই ত্রুটি কমিয়ে আনা যায়। দৈব ত্রুটিকে কমিয়ে আনতে হলে পরিমাপটি বারবার নিয়ে এদের গড় নিতে হয়।

(খ) যান্ত্রিক ত্রুটি : পদার্থবিজ্ঞানে পরীক্ষণের জন্য তথা মাপ–জোখের জন্য আমাদের যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। সেই যন্ত্রে যদি ত্রুটি থাকে তাকে যান্ত্রিক ত্রুটি বলে। যেমন স্লাইড ক্যালিপার্সে পরীক্ষণ শুরুর আগে যদি প্রধান স্কেলের শূন্য দাগ আর ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ মিলে না যায় তাহলে প্রাপ্ত পরিমাপ সঠিক হবে না। এটা যান্ত্রিক ত্রুটি। তেমনিভাবে অ্যামিটার বা ভোল্টমিটারের কাঁটা যদি যন্ত্রের স্কেলের শূন্যের সাথে মিলে না থাকে তাহলে সেই যন্ত্রেও

ত্রুটি আছে। পরীক্ষণ শুরুর আগে এই যান্ত্রিক ত্রুটি নির্ণয় করে নিতে হয়। তারপর প্রাপ্ত পাঠ থেকে এই পাঠ বিয়োগ করে প্রকৃত পাঠ বের করতে হয়।

(গ) ব্যক্তিগত ত্রুটি : পরীক্ষণের সময় আমাদের নানাবিধ পাঠ নিতে হয়। পর্যবেক্ষকের নিজের কারণে পাঠে যে ত্রুটি আসে তাকে ব্যক্তিগত ত্রুটি বলে। যদি পর্যবেক্ষকের দৃষ্টির সমস্যা থাকে তাহলে পাঠে ভুল হবে। পর্যবেক্ষকের অবস্থান, কোনো দাগ দেখা বা কিছু গণনার ক্ষেত্রে যে ত্রুটি হয় সেগুলোও ব্যক্তিগত ত্রুটি। যেমন স্কেলের সাহায্যে কোনো দন্ডের দৈর্ঘ্য মাপার সময় দন্ডের মাথা স্কেলের কোন দাগের সাথে মিলেছে তা লম্বভাবে না দেখে যদি তির্যকভাবে দেখা হয় তাহলে পাঠে ত্রুটি হবে। একটি স্ক্রুগেজের বৃত্তাকার স্কেলের কততম ভাগ রৈখিক স্কেলের সাথে মিলেছে সেটা গুনতে যদি ভুল হয় তাহলে পাঠে ভুল আসবে। কিংবা দোলকের দোলনকাল নির্ণয়ের সময় দোলন সংখ্যা নির্ণয়ে ভুল করলে সঠিক দোলন কাল পাওয়া যাবে না। এসবই ব্যক্তিগত ত্রুটি। এই সকল ত্রুটি দূর করার সময় সাবধানে যথাযথভাবে পাঠ নিতে হয়।

অনুসন্ধান ১.১

একটি আয়তাকার বস্তুর একটি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ও বস্তুর আয়তন নির্ণয়।

উদ্দেশ্য : স্লাইড ক্যালিপার্স ব্যবহার করে বস্তুর দৈর্ঘ্য নির্ণয়।

সূত্র : ক্ষেত্রফল হলো কোনো বস্তুর পৃষ্ঠের পরিমাণ। আর কোনো বস্তু যে স্থান দখল করে তাকে সেই বস্তুর আয়তন বলে। কোনো আয়তাকার বস্তুর কোনো পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল A এবং আয়তন V হলে,

$$A = L \times B \tag{1.1}$$

এবং $$V = L \times B \times H \tag{1.2}$$

এখানে, L = বস্তুর দৈর্ঘ্য

B = বস্তুর প্রস্থ

H = বস্তুর উচ্চতা

স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে যেকোনো দৈর্ঘ্যের পাঠ নির্ণয়ের সূত্র :

দৈর্ঘ্য = প্রধান স্কেল পাঠ (M) + ভার্নিয়ার সমপাতন (V) × ভার্নিয়ার ধ্রুবক (VC)

অর্থাৎ L বা B বা $H = M + V \times VC$

যন্ত্রপাতি : স্লাইড ক্যালিপার্স, আয়তকার বস্তু।

কাজের ধারা

১. স্লাইড ক্যালিপার্সটি নিয়ে এর প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের মান এবং ভার্নিয়ার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা কত তা লক্ষ কর। এরপর যন্ত্রটির ভার্নিয়ার ধ্রুবক (VC) বের কর।

২. এখন আয়তাকার বস্তুটিকে দৈর্ঘ্য বরাবর স্লাইড ক্যালিপার্সের দুই চোয়ালের মধ্যে স্থাপন করে চোয়াল দুইটিকে বস্তুর দুই প্রান্তের সাথে স্পর্শ করাও। এই অবস্থায় ভার্নিয়ারের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের যে দাগ অতিক্রম করে, সেই দাগের পাঠই হলো প্রধান স্কেল পাঠ M।

৩. এই অবস্থায় ভার্নিয়ারের কত সংখ্যক দাগ প্রধান স্কেলের যেকোনো একটি দাগের সাথে মিলে যায় তা নির্ণয় কর। এটি ভার্নিয়ার সমপাতন V।

৪. বস্তুটিকে দৈর্ঘ্য বরাবর কয়েকটি অবস্থানে বসিয়ে ২ ও ৩ নং প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি কর এবং প্রাপ্ত মানগুলো ছকে স্থাপন কর।

৫. এরপর বস্তুটি প্রস্থ বরাবর স্লাইড ক্যালিপার্সের চোয়ালের মধ্যে স্থাপন করে ২ ও ৩ নং প্রক্রিয়ায় কয়েক জায়গায় পাঠ নাও এবং ছকে স্থাপন কর।

৬. এবার বস্তুটি উচ্চতা বরাবর স্লাইড ক্যালিপার্সের চোয়ালের মধ্যে স্থাপন করে ২ ও ৩ নং প্রক্রিয়ায় কয়েক জায়গায় পাঠ নাও এবং ছকে স্থাপন কর।

৭. প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে বস্তুটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নির্ণয় করে (1.1) এবং (1. 2) সমীকরণে তা বসিয়ে আয়তকার বস্তুটির একটি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ও বস্তুটির আয়তন নির্ণয় কর।

অনুসন্ধানের ছক

পর্যবেক্ষণ

ক. ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ণয় :

প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘরের মান, $s =$ ..... cm

ভার্নিয়ার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা, $n =$ .....

$\therefore$ ভার্নিয়ার ধ্রুবক, $VC = \frac{s}{n} =$ ..... cm

খ. আয়তকার বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নির্ণয়ের ছক

আয়তকার বস্তুর	পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	প্রধান স্কেল পাঠ, M (cm)	ভার্নিয়ার সমপাতন V	ভার্নিয়ার ধ্রুবক VC (cm)	পাঠ $M + V \times VC$ (cm)	গড় পাঠ (cm)
দৈর্ঘ্য L	1.					
	2.					
	3.					
প্রস্থ B	1.					
	2.					
	3.					
উচ্চতা H	1.					
	2.					
	3.					

হিসাব ও ফলাফল :

আয়তকার বস্তুর এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল, $A = L \times B =$ ..... $cm^2 =$ .....$\times 10^{-4}\ m^2$

এবং আয়তন, $V = L \times B \times H$ = ... $cm^3 =$ .....$\times 10^{-6}\ m^3$

অনুসন্ধান ১.২

একটি বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয়।

উদ্দেশ্য : স্ক্রুগেজ ব্যবহার করে তারের ব্যাস নির্ণয়।

সূত্র : ক্ষেত্রফল হলো কোনো বস্তুর পৃষ্ঠের পরিমাণ। কোনো তারের প্রস্থ বরাবর দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে ছেদ কাটলে যে তল পাওয়া যায় তার পরিমাণই হচ্ছে প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল। কোনো বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A হলে

$A = \pi r^2$

এখানে, r = তারের ব্যাসার্ধ

$\pi = 3.14$; ধ্রুব সংখ্যা

এখন তারের ব্যাস d হলে $r = d/2$, সুতরাং

$$A = \pi\left(\frac{d}{2}\right)^2$$

$$\therefore A = \frac{1}{4}\pi d^2 \qquad (1.3)$$

স্ক্রু গেজের সাহায্যে যেকোনো দৈর্ঘ্যের পাঠ নির্ণয়ের সূত্র :

দৈর্ঘ্য = রৈখিক স্কেল পাঠ (L) + বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা (C) × লঘিষ্ঠ গণন (LC)

অর্থাৎ $d = L + C \times LC$

যন্ত্রপাতি : স্ক্রু গেজ, তার।

কাজের ধারা

১. প্রথমে রৈখিক স্কেলের ক্ষুদ্রতম ঘরের মান ও বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা দেখে নাও।

২. এরপর যন্ত্রের পিচ নির্ণয় কর। বৃত্তাকার স্কেল সম্পূর্ণ একবার ঘুরালে এটি রৈখিক স্কেল বরাবর যে দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে তাই হলো যন্ত্রের পিচ। পিচকে বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে লঘিষ্ঠ গণন (LC) বের কর।

৩. এখন পরীক্ষাধীন তারটিকে স্ক্রু গেজের স্থায়ী দন্ড ও স্ক্রুর মাঝখানে রেখে স্ক্রুটিকে একদিক বরাবর ঘুরিয়ে কীলক ও স্ক্রুকে আলতোভাবে তারের গায়ে স্পর্শ করাও।

৪. এই অবস্থায় রৈখিক স্কেলের যে দাগটি বৃত্তাকার স্কেলের বামদিকে দেখা যায় সেই দাগের পাঠ নাও।এটি রৈখিক স্কেল পাঠ (L)। এবার দেখো বৃত্তাকার স্কেলের কত নম্বর দাগ রৈখিক স্কেলের দাগের সাথে মিলে গেছে। এটি হলো বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা (C)।

৫. এভাবে তারের অন্তত পাঁচটি ভিন্ন জায়গায় পাঠ নিয়ে ছকে স্থাপন কর।

৬. প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে তারের ব্যাস বের করে (1.3) সমীকরণে বসিয়ে তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

অনুসন্ধানের ছক

পর্যবেক্ষণ

ক. লঘিষ্ঠ গণন নির্ণয় :

রৈখিক স্কেলের এক ভাগের মান, s = ... mm

বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা, n = ...

পিচ (বৃত্তাকার স্কেল সম্পূর্ণ একবার ঘুরালে রৈখিক স্কেলে যে দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে),

p = ... mm

$\therefore$ লঘিষ্ঠ গণন, $LC = \frac{p}{n}$ = ... mm

খ. তারের ব্যাস নির্ণয়ের ছক

পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	রৈখিক স্কেল পাঠ, L (mm)	বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা C	লঘিষ্ঠ গণন LC (mm)	ব্যাস $d = L + C \times LC$ (mm)	গড় ব্যাস (mm)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

হিসাব ও ফলাফল :

তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, $A = \frac{1}{4}\pi d^2$ = ... mm^2 = ...$\times 10^{-6}$ m^2

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

১। কোয়ান্টাম তত্ত্ব কে প্রদান করেন?

(ক) প্ল্যাঙ্ক (খ) আইনস্টাইন

(গ) রাদারফোর্ড (ঘ) হাইজেনবার্গ

২। বোসন কার নাম থেকে এসেছে?

(ক) জগদীশ চন্দ্র বসু (খ) সুভাষ চন্দ্র বসু

(গ) সত্যেন্দ্র নাথ বসু (ঘ) শরৎ চন্দ্র বসু

৩। নিচের কোনটি মৌলিক রাশি নয়?

(ক) ভর (খ) তাপ

(গ) তড়িৎ প্রবাহ (ঘ) পদার্থের পরিমাণ

৪। একটি দন্ডকে ফ্লাইড ক্যালিপার্সে স্থাপনের পর যে পাঠ পাওয়া গেল তা হচ্ছে প্রধান স্কেল পাঠ 4 cm, ভার্নিয়ার সমপাতন 7 এবং ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.1 mm। দন্ডটির দৈর্ঘ্য কত?

(ক) 4.07 cm (খ) 4.7 cm

(গ) 4.07 mm (ঘ) 4.7 mm

নিচের চিত্র থেকে ৫ এবং ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

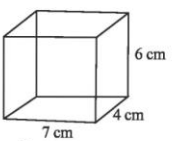

চিত্র 'ক'

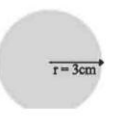

চিত্র 'খ'

৫। খ চিত্রটির আয়তন

(ক) $\frac{1}{3}\pi r^3$ (খ) $\frac{4}{3}\pi r^3$

(গ) $\frac{3}{4}\pi r^3$ (ঘ) πr^3

৬। ক ও খ চিত্রের আয়তনের অনুপাত :

(ক) 1 : 0.673 (খ) 1 : 0.0673

(গ) 1: 0.763 (ঘ) 1 : 0.637

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাশেদ তার সদ্য কেনা স্কেল দিয়ে পেন্সিলের দৈর্ঘ্য মেপে বলল পেন্সিলটির দৈর্ঘ্য 11.73cm । তার বন্ধু সুজন বলল এই পরিমাপ সঠিক নাও হতে পারে। রাশেদ বলল যে এই স্কেল দিয়ে কয়েকবার পরিমাপ করে একই ফল পেয়েছে। তারা শিক্ষকের কাছে গেলে শিক্ষক তাদের 0.005 cm ভার্নিয়ার ধ্রুবকবিশিষ্ট ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করতে বললেন। রাশেদ ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে সঠিক দৈর্ঘ্য পরিমাপ করল।

ক. ভার্নিয়ার ধ্রুবক কী?

খ. কোনো রাশির পরিমাণ প্রকাশ করতে এককের প্রয়োজন হয় কেন?

গ. ব্যবহৃত ভার্নিয়ার স্কেলের কয় ভাগ প্রধান স্কেলের কত ভাগের সমান নির্ণয় কর।

ঘ. রাশেদের প্রথম দৈর্ঘ্য পরিমাপ সঠিক পরিমাপের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না যুক্তি সহকারে লিখ।

গ. সাধারণ প্রশ্ন

১। আমরা কেন পদার্থবিজ্ঞান পড়ব – এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

২। " বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটে" – উদাহরণসহ এর সপক্ষে যুক্তি দাও।

৩। (ক) রাশি বলতে কী বুঝায় ?

(খ) মৌলিক রাশি ও লব্ধ রাশির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

৪। (ক) এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে কোন কোন রাশিকে মৌলিক রাশি ধরা হয়েছে ?

(খ) এই সকল রাশির এককের নাম কর।

৫। মাত্রা বলতে কী বুঝ ?

দ্বিতীয় অধ্যায়
গতি
MOTION

[আমরা আমাদের চারপাশে যত বস্তু দেখি, সেগুলো হয় স্থির না হয় গতিশীল। স্থিতি ও গতি বলতে আসলে আমরা কী বুঝি? একটি গতিশীল বস্তুর গতির বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশের জন্য আমাদের গতি সংক্রান্ত বিভিন্ন রাশির প্রয়োজন হয়। এই অধ্যায়ে আমরা গতি সংক্রান্ত বিভিন্ন রাশি, তাদের মাত্রা, একক, তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব।]

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১. স্থিতি ও গতি ব্যাখ্যা করতে পারব।

২. বিভিন্ন প্রকার গতির মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।

৩. স্কেলার ও ভেক্টর রাশি ব্যাখ্যা করতে পারব।

৪. গতি সম্পর্কিত রাশিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।

৫. বাধাহীন ও মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর গতি ব্যাখ্যা করতে পারব।

৬. লেখচিত্রের সাহায্যে গতি সম্পর্কিত রাশিসমূহের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।

৭. আমাদের জীবনে গতির প্রভাব উপলব্ধি করতে পারব।

২.১ স্থিতি ও গতি

Rest and motion

অবস্থান : তোমার স্কুল কোথায়? এই প্রশ্নের জবাব থেকে আমরা জানতে পারব তোমার স্কুলের অবস্থান। তুমি যদি বল তোমার স্কুল ঝিলটুলিতে তাহলে তোমার কথা পুরোপুরি সত্য, কিন্তু এ থেকে আমরা স্কুলের সঠিক অবস্থান জানতে পারব না। সঠিক অবস্থান জানতে গেলে তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে কোথা থেকে কোন দিকে কত দূরে। তাহলেই কেবল অবস্থান ঠিক ঠিক জানা যাবে। আমাদের প্রথমেই একটা জানা কিন্দু বা বস্তু ধরে নিতে হবে যার সাপেক্ষে অন্য কিন্দু বা বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করা হয়। যেমন, যদি বলা হয় তোমার বাসার গেট থেকে তোমার স্কুল পূর্ব দিকে ১ কিলোমিটার দূরে, তাহলে এটির অবস্থান নিশ্চিতভাবে বলা যাবে। সুতরাং আমাদের আশেপাশে, আমাদের গ্রামে বা শহরে, আমাদের দেশে বা এই পৃথিবীতে কিংবা এই মহাবিশ্বে কোনো কিছুর অবস্থান নির্দেশ করার জন্য আমাদের একটি কিন্দুকে স্থির ধরে নিতে হয়। এই কিন্দুকে আমরা বলি প্রসঙ্গ কিন্দু বা মূলকিন্দু আর যে দৃঢ় বস্তুর সাথে তুলনা করে আমরা অন্য বস্তুর অবস্থান, স্থিতি, গতি ইত্যাদি নির্ণয় করি তাকে বলি প্রসঙ্গ কাঠামো। আমাদের সুবিধামতো আমরা যেকোনো কিন্দুকে প্রসঙ্গ কিন্দু ধরতে পারি। উপরিউক্ত উদাহরণে আমরা অন্য কিন্দুকে প্রসঙ্গ কিন্দু ধরতে পারতাম।

স্থিতি ও গতি : আমরা আমাদের চারপাশে অনেক বস্তু দেখি। এদের কতোগুলো স্থির বাকিগুলো গতিশীল। আসলে আমরা স্থির ও গতিশীল বস্তু বলতে কী বুঝি?

নিজে কর : হাত দিয়ে একটা কলম ধরে রাখ ।

কলমের আশেপাশে কী আছে? আশেপাশের বস্তুগুলোর তুলনায় কলমের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কি? না। তোমার হাতে ধরে থাকা কলমের আশেপাশের প্রত্যেক বস্তু যেমন তোমার চেয়ার, টেবিল, তোমার বই, খাতা, ঘরের দরজা, জানালা সবকিছু থেকে এই কলমের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব ও দিক আছে। অর্থাৎ তোমার কলমের চারপাশের অন্যান্য বস্তুর তুলনায় বা সাপেক্ষে তোমার কলমের অবস্থান নির্দিষ্ট। সময়ের সাথে কলমটির অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে না। আমরা বলি পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কলমটি স্থির। আর কলমটির স্থির থাকার এই ঘটনাটিই হচ্ছে স্থিতি। সুতরাং, সময়ের পরিবর্তনের সাথে পারিপার্শ্বের সাপেক্ষে যখন কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে না তখন ঐ বস্তুকে স্থিতিশীল বা স্থির বস্তু বলে। আর এই অবস্থান অপরিবর্তিত থাকাকে বলে স্থিতি।

অনি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলে যে, ঘরবাড়ি, গাছপালা বৈদ্যুতিক খুঁটি, ইত্যাদি সব স্থির দাঁড়িয়ে আছে। সে কেন এ কথা বলে? কারণ অনির মতে এই সকল বস্তু সময়ের সাথে অবস্থানের পরিবর্তন করছে না।

নিজে কর : তোমার হাতে ধরে থাকা কলমটিকে এদিক সেদিক নাড়তে থাক ।

আশেপাশের বস্তুগুলোর তুলনায় কলমের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কি? এখন কলমের আশেপাশের প্রত্যেকটি বস্তু থেকে কলমের দূরত্ব এবং দিক ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। সময়ের সাথে কলমটির অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা বলি পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কলমটি গতিশীল। সময়ের পরিবর্তনের সাথে পারিপার্শ্বের সাপেক্ষে যখন কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে তখন তাকে গতিশীল বস্তু বলে। আর অবস্থানের এ পরিবর্তনের ঘটনাকে বলে গতি।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি কোনো বস্তু স্থির না গতিশীল তা বুঝার জন্য প্রসঙ্গ বস্তু তথা প্রসঙ্গ কাঠামো পছন্দ করা জরুরি। এই প্রসঙ্গ বস্তু ও আমাদের আলোচ্য বস্তুর পারস্পরিক অবস্থান যদি সময়ের সাথে অপরিবর্তিত থাকে তাহলে আলোচ্য বস্তুটিকে প্রসঙ্গ বস্তুর সাপেক্ষে স্থির ধরা হয়। আলোচ্য বস্তু ও প্রসঙ্গ বস্তু যদি একই দিকে একই বেগে চলতে থাকে তাহলেও কিন্তু সময়ের সাথে বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না, যদিও প্রকৃতপক্ষে বস্তুটি গতিশীল। চলন্ত ট্রেনের কামরায় দুই বন্ধু যদি মুখোমুখি বসে থাকে, তবে একজনের সাপেক্ষে অন্যজনের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় না। সুতরাং বলা যেতে পারে একজনের সাপেক্ষে অন্যজন স্থির। কিন্তু যদি ট্রেন লাইনের পাশে দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তি তাদেরকে দেখেন তবে তিনি দেখবেন তার সাপেক্ষে ঐ দুই বন্ধুর অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থাৎ লাইনের পাশে দাঁড়ানো ব্যক্তির সাপেক্ষে তারা উভয়ই গতিশীল।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কোনো বস্তু প্রকৃতপক্ষে স্থির কি না তা নির্ভর করছে প্রসঙ্গ বস্তুর উপর। প্রসঙ্গ বস্তু যদি প্রকৃতপক্ষে স্থির হয় তাহলে তার সাপেক্ষে যে বস্তু স্থিতিশীল রয়েছে সেও প্রকৃতপক্ষে স্থির। এ ধরনের অবস্থাকে আমরা পরম স্থিতি বলতে পারি। অর্থাৎ প্রসঙ্গ বস্তুটি যদি পরম স্থিতিতে থাকে তাহলেই কোনো বস্তু তার সাপেক্ষে স্থির থাকলে সে বস্তুকে পরম স্থিতিশীল বলা যেতে পারে। সেরূপ পরম স্থিতিশীল প্রসঙ্গ বস্তুর সাপেক্ষে কোনো বস্তুর গতিকে আমরা পরম গতি বলি। কিন্তু এ মহাবিশ্বে এমন কোনো প্রসঙ্গ বস্তু পাওয়া সম্ভব নয় যা প্রকৃতপক্ষে স্থির রয়েছে। কারণ পৃথিবী প্রতিনিয়ত সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সূর্যও তার গ্রহ, উপগ্রহ নিয়ে ছায়াপথে গতিশীল। কাজেই আমরা যখন কোনো বস্তুকে স্থিতিশীল বা গতিশীল বলি, তা আমরা কোনো আপাত স্থিতিশীল বস্তুর সাপেক্ষে বলে থাকি। কাজেই আমরা বলতে পারি এ মহাবিশ্বের সকল স্থিতিই আপেক্ষিক– সকল গতিই আপেক্ষিক। কোনো গতিই পরম নয়, পরম নয় কোনো স্থিতিই।

মিতু কোথাও যাওয়ার জন্য বাস স্ট্যান্ডে বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। সে দেখল তার বন্ধু রনি রিকশায় তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। সে বলে যে রিকশাটি গতিশীল। কারণ মিতুর সাপেক্ষে সময়ের সাথে সাথে রিকশাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে তার অবস্থানের পরিবর্তন করছে।

কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন কিন্তু দুইভাবে হতে পারে।

নিচের উদাহরণগুলো বিবেচনা করা যাক :

(ক) মৌ একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে এবং দেখল যে তার বন্ধু ঐশি তার থেকে দৌড়ে দূরে সরে যাচ্ছে। মৌ ও ঐশির মধ্যবর্তী দূরত্ব সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। (চিত্র : ২.১ক)।

(খ) রাজুদের স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়ায় দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য মাঠে একটি বিরাট বৃত্তাকার ট্র্যাক করা হয়েছে। সেই বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাজু দেখল তার বন্ধু শিহাব ঐ ট্র্যাক বরাবর দৌড়ে প্র্যাকটিস করছে (চিত্র : ২.১খ)। রাজু বলে যে শিহাব গতিশীল, কিন্তু রাজু ও শিহাবের মধ্যবর্তী দূরত্ব সময়ের সাথে সাথে তো পরিবর্তিত হচ্ছে না। তাহলে কীভাবে বলা যাবে যে শিহাব রাজুর সাপেক্ষে গতিশীল?

চিত্র : ২.১ (ক)

চিত্র : ২.১ (খ)

প্রথম উদাহরণে মৌ –এর সাপেক্ষে সময়ের সাথে দূরত্বের পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐশির অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে। দ্বিতীয় উদাহরণে রাজুর সাপেক্ষে সময়ের সাথে শিহাবের অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে, যদিও দূরত্বের পরিবর্তন হচ্ছে না। তাহলে কী পরিবর্তন হচ্ছে? রাজুর সাপেক্ষে শিহাবের অবস্থানের দিকের পরিবর্তন হচ্ছে। পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতিশীল কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন হতে পারে দূরত্বে বা দিকে বা উভয়েই।

২.২ বিভিন্ন প্রকার গতি

Types of motion

রৈখিক গতি : কোনো বস্তু যদি একটি সরল রেখা বরাবর গতিশীল হয় অর্থাৎ কোনো বস্তুর গতি যদি একটি সরল রেখার উপর সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তার গতিকে রৈখিক গতি বলে। একটি লোহা সড়কে কোনো গাড়ির গতি রৈখিক গতি।

ঘূর্ণন গতি : যখন কোনো বস্তু কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু বা রেখা থেকে বস্তু কণাগুলোর দূরত্ব অপরিবর্তিত রেখে ঐ বিন্দু বা রেখাকে কেন্দ্র করে ঘোরে তখন সে বস্তুর গতিকে ঘূর্ণন গতি বা বৃত্তাকার গতি বলে। যেমন বৈদ্যুতিক পাখার গতি, ঘড়ির কাঁটার গতি ইত্যাদি।

চলন গতি : কোনো বস্তু যদি এমনভাবে চলতে থাকে যাতে বস্তুর সকল কণা একই সময়ে একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে ঐ গতিকে চলন গতি বলে।

একখানা বইকে ঘুরতে না দিয়ে ঠেলে টেবিলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে গেলে এই গতি চলন গতি হবে। কারণ বই এর প্রতিটি কণা সমান সময়ে একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে।

পর্যায়বৃত্ত গতি : কোনো গতিশীল বস্তুকণার গতি যদি এমন হয় যে, এটি এর গতি পথে কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পর পর একই দিক থেকে অতিক্রম করে, তাহলে সেই গতিকে পর্যায়বৃত্ত গতি বলে।

এই গতি বৃত্তাকার, উপবৃত্তাকার বা সরলরৈখিক হতে পারে। ঘড়ির কাঁটার গতি, সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর গতি, বাল্ব বা পেট্রোল ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের মধ্যে পিস্টনের গতি পর্যায়বৃত্ত গতি।

পর্যায়বৃত্ত গতিসম্পন্ন কোনো কণা যে নির্দিষ্ট সময় পর পর নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট দিক দিয়ে অতিক্রম করে সেই সময়কে পর্যায়কাল বলে।

স্পন্দন গতি : পর্যায়বৃত্ত গতিসম্পন্ন কোনো বস্তু যদি পর্যায়কালের অর্ধেক সময় কোনো নির্দিষ্ট দিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় একই পথে তার বিপরীত দিকে চলে তবে এর গতিকে স্পন্দন বা দোলন বা কম্পন গতি বলে।

স্পন্দন গতির উদাহরণ হচ্ছে সরল দোলকের গতি, কম্পনশীল সুরশলাকার ও গিটারের তারের গতি।

২.৩ স্কেলার রাশি ও ভেক্টর রাশি

Scalar and vector quantities

আগের অধ্যায়ে আমরা জেনেছি ভৌত জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকে রাশি বলে। কোনো রাশি যখন পরিমাপ করা হয় তখন তার একটি মান থাকে। এই মান প্রকাশ করতে আমরা একটি সংখ্যা এবং একটি একক ব্যবহার করি। যেমন আমরা যদি বলি বেঞ্চটির দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার, তাহলে বুঝা যায় দৈর্ঘ্যের একক মিটার আর বেঞ্চের দৈর্ঘ্য তার 1.5 গুণ। কিন্তু কেবল মান দিয়ে সকল রাশিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। কিছু কিছু রাশি প্রকাশের জন্য মানের সাথে দিকেরও প্রয়োজন হয়।

যেমন আমরা যদি বলি একটি গাড়ি ঘণ্টায় 40 কিলোমিটার বেগে চলছে, তাহলে এটা বুঝা যাবে যে গাড়িটি এক ঘণ্টায় 40 km দূরত্ব অতিক্রম করেছে, কিন্তু গাড়িটি কোনোদিকে সে দূরত্ব অতিক্রম করেছে, তা জানা যাবে না। গাড়িটির প্রকৃত অবস্থা বুঝতে হলে গাড়িটির বেগ কোনো দিকে সেটাও উল্লেখ করতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু রাশি আছে যেগুলো সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে হলে মানের সাথে দিকের অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। দিকের বিবেচনায় আমরা বস্তু জগতের সকল রাশিকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি; যথা–

১। অদিক রাশি বা স্কেলার রাশি

২। দিক রাশি বা ভেক্টর রাশি।

স্কেলার রাশি : যে সকল ভৌত রাশিকে শুধু মান দিয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, দিক নির্দেশের প্রয়োজন হয় না তাদেরকে স্কেলার রাশি বলে। দৈর্ঘ্য, ভর, দ্রুতি, কাজ, শক্তি, সময়, তাপমাত্রা ইত্যাদি স্কেলার রাশির উদাহরণ।

ভেক্টর রাশি : যে সকল ভৌত রাশিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য মান ও দিক উভয়ের প্রয়োজন হয় তাদেরকে ভেক্টর রাশি বলে। সরণ, বেগ, ত্বরণ, বল, তড়িৎ প্রাবল্য ইত্যাদি ভেক্টর রাশির উদাহরণ।

২.১ সারণি থেকে দেখা যচ্ছে যে প্রতিটি ভেক্টরকে মান ও দিক দিয়ে আর স্কেলার রাশিগুলোকে কেবল মান দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে।

সারণি ২.১

স্কেলার ও ভেক্টর রাশির উদাহরণ

স্কেলার রাশি			ভেক্টর রাশি		
নাম	সংকেত	উদাহরণ	নাম	সংকেত	উদাহরণ
দূরত্ব	d	40 m	সরণ	s বা $\vec{s}$	40 m পূর্ব দিকে
দ্রুতি	v	30 m s^{-1}	বেগ	v বা $\vec{v}$	30 m s^{-1} উত্তর দিকে
সময়	t	15 s	বল	F বা $\vec{F}$	100 N উপরের দিকে
শক্তি	E	2000 J	ত্বরণ	a বা $\vec{a}$	9.8 m s^{-2} নিচের দিকে

ভেক্টর রাশির নির্দেশনা

কোনো রাশির সংকেতের উপর তীর চিহ্ন দিয়ে ভেক্টর রাশি নির্দেশ করা হয়, যেমন $\vec{A}$। ভেক্টর রাশি $\vec{A}$ এর মান A বা $|\vec{A}|$ দিয়ে নির্দেশ করে। ছাপার অক্ষরের ক্ষেত্রে অনেক সময় $\vec{A}$ এর বদলে বোল্ড হরফ **A** ভেক্টর এবং সাধারণ হরফ A দিয়ে রাশিটির মান প্রকাশ করা হয়। সারণি ২.১ এ ভেক্টর রাশিকে বোল্ড হরফ দিয়ে এবং তীর চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে।

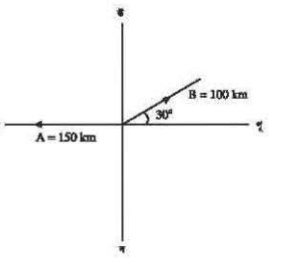

চিত্র: ২.২

চিত্রে কোনো ভেক্টর রাশিকে একটি তীর চিহ্নিত সরলরেখা দ্বারা নির্দেশ করা হয়। সরলরেখার দৈর্ঘ্য রাশিটির মান এবং তীর চিহ্ন এর দিক নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ ২.২ চিত্রে সরণ 50 km কে 1 cm দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং ঐ চিত্রে A ভেক্টরটি যার দৈর্ঘ্য 3 cm, সেটি পশ্চিম দিকে 150 km সরণ নির্দেশ করে। B ভেক্টরটি পূর্ব দিকের সাথে 30° কোণে উত্তর দিকে 100 km সরণ নির্দেশ করে।

২.৪ গতি সংক্রান্ত বিভিন্ন রাশি

Different quantities related to motion

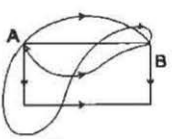

চিত্র : ২.৩

দূরত্ব ও সরণ :

ধরা যাক, অভি তার স্কুলের গেট থেকে 100 মিটার দৌড়ে গেল। অভি গেট থেকে 100 মিটার দূরে আছে সত্য, কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় আছে তা বলা যাবে না। কেননা অভি গেট থেকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম বা অন্যকোনো দিকে 100 মিটার

দূরে থাকতে পারে। অভির অবস্থানের পরিবর্তন সঠিকভাবে জানতে হলে অভি কোন দিকে 100 মিটার দূরে গেছে তা জানতে হবে। যদি বলা হয় অভি গেট থেকে 100 মিটার পূর্ব দিকে দৌড়ে গেছে, তাহলে নিশ্চিতভাবে অভির অবস্থান জানা যাবে। গেট থেকে সোজা পূর্ব দিকে 100 মিটার গেলেই অভিকে পাওয়া যাবে। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা অভির অবস্থানের পরিবর্তন বুঝবার জন্য যে রাশিটি ব্যবহার করেছি তাহলো দূরত্ব। এটি একটি স্কেলার রাশি। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা দূরত্বের সাথে সাথে দিকও উল্লেখ করেছি –সেটি সরণ। এটি একটি ভেক্টর রাশি। একটি নির্দিষ্ট দিকে যে দূরত্ব বা অবস্থানের পরিবর্তন তা হলো সরণ। সুতরাং নির্দিষ্ট দিকে পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে অবস্থানের পরিবর্তনকে সরণ বলে।

কোনো বস্তুর আদি অবস্থান ও শেষ অবস্থানের মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব অর্থাৎ সরলরৈখিক দূরত্বই হচ্ছে সরণের মান এবং সরণের দিক হচ্ছে বস্তুর আদি অবস্থান থেকে শেষ অবস্থানের দিকে।

সরণ বস্তুর গতিপথের উপর নির্ভর করে না। কোনো একটি বস্তু A অবস্থান থেকে B অবস্থানে (চিত্র ২.৩) বিভিন্ন পথে যেতে পারে। কিন্তু বস্তুটির সরণ হবে A থেকে B–এর দিকে। A ও B এর মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে AB সরলরৈখিক দূরত্ব হলো সরণের মান $AB = s$ এবং দিক হলো A থেকে B এর দিকে। যেহেতু সরণের মান ও দিক উভয়ই আছে, কাজেই এটি একটি ভেক্টর রাশি।

সরণের মাত্রা হলো দৈর্ঘ্যের মাত্রা।

$\therefore [s] = L$

সরণের একক হলো দৈর্ঘ্যের একক অর্থাৎ মিটার (m)। কোনো বস্তুর সরণ 60 m দক্ষিণ দিকে বলতে বুঝায় বস্তুটি তার আদি অবস্থান থেকে 60 m দক্ষিণ দিকে সরে গেছে।

দ্রুতি

ধরা যাক, আগের উদাহরণে অভি ঐ 100 মিটার দূরত্ব 50 সেকেন্ডে পার হলো। একই দূরত্ব মিতু যদি 40 সেকেন্ডে পার হয়ে থাকে তাহলে কে দ্রুত চলেছে? অভি না মিতু? নিশ্চয়ই মিতু। কেননা তার সময় কম লেগেছে।

মনে করা যাক, অভি 100 মিটার দূরত্ব 50 সেকেন্ডে পার হলো। মিতু 75 মিটার দূরত্ব 30 সেকেন্ডে পার হলো। আমরা কি বলতে পারি অভি মিতুর চেয়ে ধীরে চলেছে? অভি কি মিতুর চেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেনি? কে বেশি দ্রুত চলেছে অভি না মিতু তা জানতে হলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে উভয়ের অতিক্রান্ত দূরত্বের তুলনা করতে হবে। ধরা যাক, এই নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে 1 সেকেন্ড। সুতরাং,

1 সেকেন্ডে অভির অতিক্রান্ত দূরত্ব $100/50 = 2$ মিটার

1 সেকেন্ডে মিতুর অতিক্রান্ত দূরত্ব $75/30 = 2.5$ মিটার

সুতরাং, মিতু অভির চেয়ে দ্রুত চলেছে, কেননা 1 সেকেন্ডে মিতু অভির চেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি কে দ্রুত চলছে তা নির্ভর করে সময় এবং অতিক্রান্ত দূরত্বের উপর। কোনো বস্তু কত দ্রুত চলছে তথা দূরত্ব অতিক্রম করছে তা যে রাশি দিয়ে পরিমাপ করা হয় তাকে দ্রুতি বলা হয়। দ্রুতি বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হার নির্দেশ করে। সময়ের সাথে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে দ্রুতি বলে।

বস্তুর একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব দ্বারা দ্রুতি পরিমাপ করা হয়। সুতরাং,

$$\text{দ্রুতি} = \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}$$

কোনো গতিশীল বস্তু যদি t সময়ে d দূরত্ব অতিক্রম করে, তাহলে দ্রুতি

$$v = \frac{d}{t}$$

দ্রুতি দ্বারা অবস্থানের পরিবর্তনের হার কোন দিকে ঘটেছে তা জানা যায় না, ফলে দ্রুতির কোনো দিক নেই। সুতরাং দ্রুতি একটি স্কেলার রাশি।

দ্রুতির মাত্রা হলো $\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}$ এর মাত্রা।

$$\therefore [v] = \frac{L}{T} = LT^{-1}$$

যেহেতু দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করলে দ্রুতি পাওয়া যায়, কাজেই দূরত্বের একককে সময়ের একক দিয়ে ভাগ করলে দ্রুতির একক পাওয়া যাবে। দূরত্বের একক মিটার (m) এবং সময়ের একক সেকেন্ড (s) হওয়ায় দ্রুতির একক হবে মিটার/সেকেন্ড (m s^{-1})। যেমন কোনো বস্তুর দ্রুতি $4\ \text{m s}^{-1}$ বলতে বুঝায় বস্তুটি প্রতি সেকেন্ডে 4 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে।

দ্রুতির একক মিটার/সেকেন্ড হলেও আমাদের উপলব্ধির সুবিধার জন্য আমরা অনেক সময় দূরত্বের একক কিলোমিটার এবং সময়ের একক ঘণ্টা ধরে দ্রুতির একক কিলোমিটার/ঘণ্টা (km h^{-1}) ধরি। গাড়ির স্পিডোমিটার যে দ্রুতি নির্দেশ করে তা km h^{-1} -এ দেওয়া থাকে।

গড় দ্রুতি : কোনো বস্তুর গতিকালে যদি কখনো দ্রুতির মানের কোনো পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ বস্তুটি যদি সর্বদা সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে ঐ বস্তুর দ্রুতিকে সুষম বা সমদ্রুতি বলে। আর যদি সমান সময়ে বস্তু সমান দূরত্ব অতিক্রম না করে তাহলে সেই দ্রুতিকে অসম দ্রুতি বলে।

বস্তু যদি সুষম দ্রুতিতে না চলে তাহলে তার অতিক্রান্ত মোট দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করলে গড়ে প্রতি একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব পাওয়া যায় । একে গড় দ্রুতি বলা হয় ।

সুতরাং, গড় দ্রুতি = $\frac{\text{মোট দূরত্ব}}{\text{সময়}}$

যদি কোনো গাড়ি ঢাকা থেকে দিনাজপুর যাওয়ার পথে সকাল 7 টায় রওনা হয়ে 6 ঘণ্টায় 300 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে, তবে তার গড় দ্রুতি হচ্ছে $300\ \text{km} / 6\ \text{h} = 50\ \text{km h}^{-1}$। এখানে গড় দ্রুতি বলার কারণ গাড়িটি যে

তার চলার পথে প্রত্যেক ঘণ্টায় 50 কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে এমন কোনো কথা নেই। গাড়িটি কখনো এর চেয়ে দ্রুত চলে থাকতে পারে আবার এর চেয়ে আস্তেও চলতে পারে।

তাৎক্ষণিক দ্রুতি : আমরা যদি কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে কোনো বস্তুর দ্রুতি জানতে চাই, যেমন উল্লিখিত গাড়িটি চলা শুরু করার ঠিক 33 মিনিট পূর্ণ হওয়ার মুহূর্তে তার দ্রুতি কত ছিল, তাহলে সেটা হবে তার ঐ সময়ের প্রকৃত দ্রুতি বা তাৎক্ষণিক দ্রুতি। যেকোনো মুহূর্তে প্রকৃত বা তাৎক্ষণিক দ্রুতি বের করতে হলে আমাদেরকে অতি অল্প সময় ব্যবধানে অতিক্রান্ত দূরত্ব জানতে হবে। তারপর সেই দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করে তাৎক্ষণিক দ্রুতি বের করতে হবে।

কেউ যদি সকাল 10টা 32 মিনিট 43 সেকেন্ডের সময় গাড়িটির দ্রুতি কত ছিল কিংবা কোনো স্কুলের পাশে হাইওয়েতে দেওয়া স্পীড ব্রেকার অতিক্রমকালে গাড়িটির দ্রুতি কত ছিল তা জানতে চান তাহলে তাকে ঐ সময়ে স্পিডোমিটারের পাঠ কত ছিল তা দেখতে হবে। যেকোনো মুহূর্তে দ্রুতি নির্ণয়ের জন্য যেমন হাইওয়েতে কোনো গাড়ি সর্বোচ্চ গতিসীমা লঙ্ঘন করছে কি না কিংবা বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের দ্রুততম বোলার মাশরাফি বিন মোর্তজার কোন বলের দ্রুতি কত তা নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে রাডার বা লেসার গানের সাহায্য নিতে হবে।

বেগ

অনেক সময় আমরা সাধারণ কথাবার্তায় বেগ শব্দ ব্যবহার করি এবং অনেকে তা করে থাকি দ্রুতি বুঝাতে। কিন্তু বিজ্ঞানের পরিভাষায় শব্দ দুটির অর্থে ভিন্নতা আছে। দ্রুতি কেবল কোনো বস্তুর দূরত্বের বা অবস্থানের পরিবর্তনের হার নির্দেশ করে, কোন দিকে সে পরিবর্তন হয়েছে তা বুঝায় না। বেগ দূরত্বের পরিবর্তনের হার বুঝাবার পাশাপাশি কোন দিকে সে পরিবর্তন ঘটে তাও নির্দেশ করে। বেগ দিয়ে নির্দিষ্ট দিকে দূরত্বের পরিবর্তনের হার তথা সরণের হারকে বুঝায়। সুতরাং সময়ের সাথে কোনো বস্তুর সরণের হারকে বেগ বলে অর্থাৎ বস্তু নির্দিষ্ট দিকে একক সময়ে যে পথ অতিক্রম করে তাই বেগ।

যদি কোনো বস্তু t সময়ে নির্দিষ্ট দিকে s দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে বেগ, $v = \frac{s}{t}$ ।

বেগের মাত্রা ও দ্রুতির মাত্রা একই অর্থাৎ $[LT^{-1}]$

বেগের একক ও দ্রুতির একক একই অর্থাৎ $\mathrm{m\ s^{-1}}$।

বেগের মান ও দিক দুইই আছে। তাই বেগ একটি ভেক্টর রাশি। উদাহরণ হিসেবে একটি রাস্তার কথা ধরা যাক। রাস্তাটি কোনো স্থানে পূর্ব দিকের সাথে 30° কোণ করে উত্তর দিকে চলে গেছে (চিত্র: ২.৪)। সেই রাস্তায় যদি একটি গাড়ি 20 km h^{-1} সমদ্রুতিতে চলে, তাহলে আমরা সঠিকভাবে বলতে পারব গাড়িটির বেগ পূর্ব দিকের সাথে 30° কোণে উত্তর দিকে 20kmh $^{-1}$। কিন্তু যদি এই গাড়িটিই একটি বৃত্তাকার পথে 20 km h^{-1} সমদ্রুতিতেই

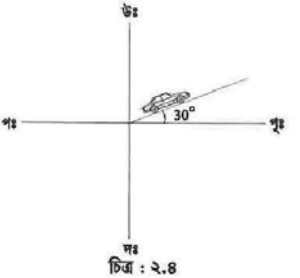

চিত্র : ২.৪

চলে, তাহলে তার গতির দিক ক্রমাগত পরিবর্তন হবে। সুতরাং এর বেগও ক্রমাগত পরিবর্তন হবে যদিও এর দ্রুতি সবসময় একই থাকবে। বস্তুর বেগের মানই তার দ্রুতি। নির্দিষ্ট দিকে বস্তুর দ্রুতিই তার বেগ।

যদি গতিশীল কোনো বস্তুর বেগের মান ও দিক অপরিবর্তিত থাকে তাহলে সেই বস্তুর বেগকে সুষমবেগ বা সমবেগ বলে। শব্দের বেগ সুষমবেগের একটি প্রকৃষ্ট প্রাকৃতিক উদাহরণ। শব্দ নির্দিষ্ট মাধ্যমে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট দিকে সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করে, আর তা হচ্ছে $0^{\circ}C$ তাপমাত্রায় বায়ুতে প্রতি সেকেন্ডে 332 মিটার। শব্দ কোনো নির্দিষ্ট দিকে প্রথম সেকেন্ডে 332 মিটার, দ্বিতীয় সেকেন্ডে 332 মিটার এবং এইরূপ প্রতি সেকেন্ডে 332 মিটার করে চলতে থাকে। এখানে শব্দের বেগের মান ও দিক একই থাকায় শব্দের বেগ $332\ m\ s^{-1}$ হলো সুষমবেগ।

কোনো বস্তুর যদি গতিকালে তার বেগের মান বা দিক বা উভয়ের পরিবর্তন ঘটে তাহলে বস্তুর সেই বেগকে অসম বেগ বলে। অর্থাৎ কোনো বস্তু যদি সমান সময়ে, সমান দূরত্ব অতিক্রম না করে কিংবা চলার সময় গতির দিক পরিবর্তন করে তাহলে সেই বেগ অসমবেগ হবে। আমরা যে চলাফেরা করি, গাড়ি চলে ইত্যাদির বেগ সাধারণত অসমবেগ।

ত্বরণ ও মন্দন

কোনো বস্তু যদি সুষমবেগে না চলে তাহলে বস্তুর বেগের মানের কিংবা দিকের কিংবা উভয়ের পরিবর্তন হতে পারে। বস্তুর বেগের পরিবর্তন হলে আমরা বলি বস্তুর ত্বরণ হচ্ছে। ধরা যাক, একটি গাড়ি একটি সোজা সড়কে চলছে। এই গাড়িতে বসে মিলু প্রতি 8 সেকেন্ড পর পর গাড়ির স্পিডোমিটার থেকে গাড়িটির বেগ লিপিবদ্ধ করছে। বিভিন্ন সময়ে এই গাড়ির বেগ $km\ h^{-1}$ ও $m\ s^{-1}$ এককে নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ২.২
বেগ – সময় সারণি

ক্রমিক নং	সময় (s)	বেগ ($km\ h^{-1}$)	বেগ ($m\ s^{-1}$)
1	0	0	0
2	8	14.4	4
3	16	28.8	8
4	24	43.2	12
5	32	57.6	16
6	40	72	20

এই সারণি থেকে দেখা যায় যে, গাড়িটির বেগ প্রথম 8 সেকেন্ডে 0 থেকে $4\ m\ s^{-1}$ এ বৃদ্ধি পেয়েছে; পরের 8 সেকেন্ডেও এর বেগ বেড়েছে $4\ m\ s^{-1}$ এবং এইরূপে বাকি সময়ও বেগ বেড়েছে। সুতরাং প্রতি 8 সেকেন্ড সময় ব্যবধানে গাড়িটির বেগের পরিবর্তন হয়েছে $4\ m\ s^{-1}$। অন্য কথায়, এক সেকেন্ড গাড়িটির বেগের পরিবর্তন হয়েছে $0.5\ m\ s^{-1}$। তাহলে সময়ের সাথে গাড়িটির বেগের পরিবর্তনের হার হলো $\frac{4ms^{-1}}{8s} = 0.5\ m\ s^{-2}$।

বেগের পরিবর্তনের হার তথা একক সময়ে বেগের পরিবর্তনই ত্বরণ। সরল পথে চলমান বস্তুর সময়ের সাথে বেগ বৃদ্ধির হারকে ধনাত্মক ত্বরণ বা ত্বরণ এবং সময়ের সাথে বেগ হ্রাসের হারকে ঋণাত্মক ত্বরণ বলা হয়। অনেক সময় ঋণাত্মক ত্বরণকে মন্দন বলা হয়।

সময়ের সাথে বস্তুর অসমবেগের বৃদ্ধির হারকে ত্বরণ বলে। কোনো বস্তুর আদি বেগ যদি u হয় এবং t সময় পরে তার শেষ বেগ যদি v হয়, তাহলে,

t সময়ে বেগের পরিবর্তন $= v - u$

$\therefore$ একক সময়ে বেগের পরিবর্তন $= \dfrac{v-u}{t}$

$\therefore$ বেগের পরিবর্তনের হার, অর্থাৎ ত্বরণ, $a = \dfrac{v-u}{t}$

সুতরাং, ত্বরণ $= \dfrac{\text{বেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}}$

ত্বরণ একটি ভেক্টর রাশি। এর দিক আছে। এর দিক হচ্ছে বেগের পরিবর্তনের দিকে। যেহেতু আমরা একটি সরল রেখা বরাবর গতি বিবেচনা করছি, কাজেই বেগের পরিবর্তন হবে হয় বেগের দিকে কিংবা বেগের বিপরীত দিকে। বেগ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে বেগের পরিবর্তন হবে বেগের দিকে। সেক্ষেত্রে ত্বরণ হবে ধনাত্মক। যদি বেগ হ্রাস পায় তাহলে বেগের পরিবর্তন হবে বেগের বিপরীত দিকে। সেক্ষেত্রে ত্বরণকে ঋণাত্মক ধরা হয় অর্থাৎ মন্দন হয়।

মাত্রা : ত্বরণের মাত্রা হলো $\dfrac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$ এর মাত্রা।

অর্থাৎ, ত্বরণ $= \dfrac{\text{বেগ}}{\text{সময়}} = \dfrac{\text{সরণ}}{\text{সময়} \times \text{সময়}} = \dfrac{\text{সরণ}}{\text{সময়}^2}$

$\therefore [a] = \dfrac{L}{T^2} = LT^{-2}$

একক : ত্বরণের একক হলো $\dfrac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$ এর একক।

অর্থাৎ, $\dfrac{\text{m s}^{-1}}{\text{s}}$ বা m s^{-2}

কোনো বস্তুর ত্বরণ $5\ \text{m s}^{-2}$ উত্তর দিকে বলতে বুঝায় বস্তুটির বেগ উত্তর দিকে $1\ \text{s}$ এ $5\ \text{m s}^{-1}$ বৃদ্ধি পায়।

সুষম ত্বরণ ও অসম ত্বরণ : ত্বরণ দুই রকমের হতে পারে, যথা– সুষম ত্বরণ ও অসম ত্বরণ। কোনো বস্তুর বেগ যদি নির্দিষ্ট দিকে সবসময় একই হারে বাড়তে থাকে তাহলে সে ত্বরণকে সুষম ত্বরণ বা সমত্বরণ বলে। আর বেগ বৃদ্ধির হার যদি সমান না থাকে, তাহলে সে ত্বরণকে অসম ত্বরণ বলা হয়।

সুষম ত্বরণের একটি উদাহরণ হলো অভিকর্ষের প্রভাবে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর ত্বরণ। যদি একটি বস্তু ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়তে থাকে তখন তার ত্বরণ হয় $9.8\ \text{m s}^{-2}$ অর্থাৎ, বস্তুটি যখন ভূপৃষ্ঠের দিকে আসতে থাকে তখন এর বেগ প্রতি সেকেন্ডে $9.8\ \text{m s}^{-1}$ করে বাড়তে থাকে।
আর আমরা সাধারণভাবে যে সকল চলমান বস্তু দেখি, যেমন গাড়ি, সাইকেল, রিকশা ইত্যাদির ত্বরণ হয় অসম।

গাণিতিক উদাহরণ ২.১ : একটি গাড়ির বেগ $5\ m\ s^{-1}$ থেকে সুষমভাবে বৃদ্ধি পেয়ে $10\ s$ পরে $45\ m\ s^{-1}$ হয়। গাড়িটির ত্বরণ বের কর।

আমরা জানি,

$$a = \frac{v-u}{t}$$

বা, $a = \frac{45\ m\ s^{-1} - 5\ m\ s^{-1}}{10\ s}$

$= \frac{40\ m\ s^{-1}}{10\ s}$

$= 4\ m\ s^{-2}$

এখানে,
আদি বেগ, $u = 5\ m\ s^{-1}$
শেষ বেগ, $v = 45\ m\ s^{-1}$
সময়, $t = 10\ s$
ত্বরণ, $a = ?$

উ : $4\ m\ s^{-2}$

গাণিতিক উদাহরণ ২.২ : একটি গাড়ির বেগ $20\ m\ s^{-1}$ থেকে সুষমভাবে হ্রাস পেয়ে $4\ s$ পরে $4\ m\ s^{-1}$ হয়। গাড়িটির ত্বরণ বের কর।

আমরা জানি,

$$a = \frac{v-u}{t}$$

বা, $a = \frac{4\ m\ s^{-1} - 20\ m\ s^{-1}}{4\ s}$

$= \frac{-16\ m\ s^{-1}}{4\ s}$

$= -4\ m\ s^{-2}$

এখানে,
আদি বেগ, $u = 20\ m\ s^{-1}$
শেষ বেগ, $v = 4\ m\ s^{-1}$
সময়, $t = 4\ s$
ত্বরণ , $a = ?$

উ : $-4\ m\ s^{-2}$

২.৫ গতি সংক্রান্ত বিভিন্ন রাশির পারস্পরিক সম্পর্ক : গতির সমীকরণ

Equations of motion

মাত্র চারটি সমীকরণ ব্যবহার করে কোনো গতিশীল বস্তুর গতি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা যায়। এই সমীকরণগুলোকে বলা হয় গতির সমীকরণ। এই সমীকরণগুলো প্রযোজ্য হয় বস্তু যখন সুষম ত্বরণে সরলরেখায় গতিশীল থাকে। ধরা যাক, কোনো বস্তু u আদিবেগ নিয়ে a সুষম ত্বরণে t সময় চলে s দূরত্ব অতিক্রম করে শেষ বেগ v প্রাপ্ত হয়। আমরা গতির সমীকরণগুলো নিম্নোক্ত প্রতীকগুলোর সাহায্যে প্রকাশ করি। এই প্রতীকগুলো হলো :

u = আদি বেগ অর্থাৎ সময় গণনার শুরুতে যে বেগ

a = সুষম ত্বরণ

t = অতিক্রান্ত সময়

s = সরণ অর্থাৎ t সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব

v = শেষ বেগ অর্থাৎ t সময় শেষে বস্তুর বেগ।

এই পাঁচটি রাশি *"suvat"* পরস্পর এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে এর যেকোনো তিনটি রাশি জানা থাকলে বাকি দুইটি রাশি বের করা যায়। এই জন্য চারটি সমীকরণ আছে। প্রত্যেকটি সমীকরণে চারটি করে রাশি আছে। জানা রাশিগুলোর মান বসিয়ে এই সমীকরণগুলোর সাহায্যে অজ্ঞাত রাশিগুলো সহজে নির্ণয় করা যায়।

২.৪ অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি ত্বরণ,

$$a = \frac{v-u}{t}$$

$$\therefore \quad v = u + at \tag{2.1}$$

আবার ঐ অনুচ্ছেদে আমরা পেয়েছি,

$$\text{গড় দ্রুতি} = \frac{\text{অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{সময়}}$$

বা, $\frac{u+v}{2} = \frac{s}{t}$

$$\therefore \quad s = \frac{(u+v)}{2}t \tag{2.2}$$

হিসাব কর : (2.1) সমীকরণের v এর মান (2.2) সমীকরণে বসাও।

$$\therefore \quad s = ut + \tfrac{1}{2}at^2 \tag{2.3}$$

হিসাব কর : (2.1) সমীকরণ থেকে t এর মান বের করে (2.2) সমীকরণে বসিয়ে বজ্র গুণন কর এবং পদগুলোকে বিন্যস্ত কর ।

$$\therefore \quad v^2 = u^2 + 2as \tag{2.4}$$

যদি কোনো সমস্যায় বলা হয় বস্তুটি স্থির অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করেছে, তাহলে আদি বেগ u = 0 হবে।

গাণিতিক উদাহরণ ২.৩ : স্থির অবস্থান থেকে চলন্ত একটি গাড়িতে $2\ \text{m s}^{-2}$ ত্বরণ প্রয়োগ করা হলে এর বেগ $20\ \text{m s}^{-1}$ হলো। কত সময় ধরে ত্বরণ প্রয়োগ করা হয়েছিল?

আমরা জানি,

$$v = u + at$$

$$\text{বা, } t = \frac{v-u}{a}$$

$$= \frac{20\ \text{m s}^{-1} - 0}{2\ \text{m s}^{-2}}$$

$$= 10\ \text{s}$$

উ : 10 s

এখানে,

আদিবেগ, $u = 0$

শেষ বেগ, $v = 20\ \text{m s}^{-1}$

ত্বরণ, $a = 2\ \text{m s}^{-2}$

সময়, $t = ?$

গাণিতিক উদাহরণ ২.৪ : $54\ \text{km h}^{-1}$ বেগে চলন্ত একটি গাড়িতে 5 s যাবত $4\ \text{m s}^{-2}$ ত্বরণ প্রয়োগ করা হলো। গাড়িটির শেষ বেগ কত এবং ত্বরণকালে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?

আমরা জানি,

$$v = u + at$$

$$= 15\ \text{m s}^{-1} + 4\ \text{m s}^{-2} \times 5\ \text{s}$$

$$= 35\ \text{m s}^{-1}$$

আবার,

$$s = ut + \tfrac{1}{2}at^2$$

$$= 15\ \text{m s}^{-1} \times 5\ \text{s} + \tfrac{1}{2} \times 4\ \text{m s}^{-2} \times (5\ \text{s})^2$$

$$= 75\ \text{m} + 50\ \text{m}$$

$$= 125\ \text{m}$$

উ : শেষ বেগ $35\ \text{m s}^{-1}$; দূরত্ব 125 m

এখানে,

আদিবেগ, $u = 54\ \text{km h}^{-1}$

$$= 54\frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{54 \times 10^3\ \text{m}}{3600\ \text{s}} = 15\ \text{m s}^{-1}$$

ত্বরণ, $a = 4\ \text{m s}^{-2}$

সময়, $t = 5\ \text{s}$

শেষ বেগ, $v = ?$

দূরত্ব , $s = ?$

গাণিতিক উদাহরণ ২.৫ : সোজা রাস্তায় স্থির অবস্থান থেকে একটি বাস $10\ \text{m s}^{-2}$ সুষম ত্বরণে চলার সময় 80m দূরত্বে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো এক ব্যক্তিকে কত বেগে অতিক্রম করবে?

আমরা জানি,

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$\text{বা, } v^2 = 0 + 2 \times 10\ \text{m s}^{-2} \times 80\ \text{m}$$

$$= 1600\ \text{m}^2\ \text{s}^{-2}$$

$$\therefore v = 40\ \text{m s}^{-1}$$

উ : $40\ \text{m s}^{-1}$

এখানে,

আদিবেগ, $u = 0$

ত্বরণ, $a = 10\ \text{m s}^{-2}$

দূরত্ব , $s = 80\ \text{m}$

শেষ বেগ, $v = ?$

২.৬ পড়ন্ত বস্তুর গতি
Motion of falling bodies

অভিকর্ষ : এই মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু কণাই একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই মহাবিশ্বের যেকোনো দুইটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে মহাকর্ষ বলে। দুইটি বস্তুর একটি যদি পৃথিবী হয় তবে তাকে অভিকর্ষ বলে অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণকে অভিকর্ষ বলা হয়। মহাবিশ্বের যেকোনো দুইটি বস্তুর আকর্ষণ সম্পর্কে নিউটনের একটি সূত্র আছে যা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নামে পরিচিত।

নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা জানি যে বল প্রযুক্ত হলে কোনো বস্তুর ত্বরণ হয়, সুতরাং অভিকর্ষ বলের প্রভাবেও বস্তুর ত্বরণ হয়। এই ত্বরণকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলা হয়।

অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলে। একে g দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

যেহেতু অভিকর্ষজ ত্বরণ এক প্রকার ত্বরণ, সুতরাং এর মাত্রা হবে $[LT^{-2}]$ এবং একক হবে $\mathrm{m\,s^{-2}}$।

ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানে g এর মানের রাশিমালা হচ্ছে,

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

এখানে, M = পৃথিবীর ভর

G= একটি বিশ্বজনীন ধ্রুবক। একে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বলে।

R= পৃথিবীর ব্যাসার্ধ।

যেহেতু পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নয়, মেরু অঞ্চলে একটুখানি চাপা, তাই পৃথিবীর ব্যাসার্ধ Rও ধ্রুবক নয়। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র g এর মান সমান নয়। মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R সবচেয়ে কম বলে সেখানে g এর মান সবচেয়ে বেশি। আর বিষুব অঞ্চলে R এর মান সবচেয়ে বেশি বলে g এর মান সবচেয়ে কম।

ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানে g এর মান বিভিন্ন বলে 45° অক্ষাংশে সমুদ্র সমতলে g এর মানকে আদর্শ মান ধরা হয়। g এর এ আদর্শ মান হচ্ছে $9.80665\ \mathrm{m\,s^{-2}}$। হিসাবের সুবিধার জন্য আদর্শমান ধরা হয় $9.8\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ বা $9.81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$।

পড়ন্ত বস্তু

কোনো বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে অভিকর্ষের প্রভাবে ভূমিতে পৌঁছায়। একই উচ্চতা থেকে একই সময় একটি ভারী ও একটি হালকা বস্তু ছেড়ে দিলে এগুলো কি একই সময়ে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাবে?

এক টুকরা পাথর ও এক টুকরা কাগজ একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে দেখা যায় যে, পাথরটি কাগজের আগেই মাটিতে পৌঁছায়। যেহেতু বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না, তাই কাগজ ও পাথরের উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ ত্বরণ একই। সুতরাং তাদের একই সময়ে মাটিতে পৌঁছানোর কথা। বাতাসের বাধার জন্য বস্তু দুইটি ভিন্ন সময়ে মাটিতে পৌঁছায়। বাতাসের বাধা না থাকলে এগুলো অবশ্যই একই সময় মাটিতে পৌঁছাত।

পড়ন্ত বস্তুর সূত্রাবলি : পড়ন্ত বস্তু সম্পর্কে গ্যালিলিও তিনটি সূত্র বের করেন। এগুলোকে পড়ন্ত বস্তুর সূত্র বলে। এই সূত্রগুলো একমাত্র স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ বস্তু পড়ার সময় স্থির অবস্থান থেকে পড়বে, এর কোনো আদি বেগ থাকবে না। বস্তু বিনা বাধায় মুক্তভাবে পড়বে অর্থাৎ এর উপর অভিকর্ষজ বল ছাড়া অন্য কোনো বল ক্রিয়া করবে না। যেমন– বাতাসের বাধা এর উপর ক্রিয়া করবে না।

প্রথম সূত্র : স্থির অবস্থান ও একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত সকল বস্তু সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করে।

দ্বিতীয় সূত্র : স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে (t) প্রাপ্ত বেগ (v) ঐ সময়ের সমানুপাতিক অর্থাৎ, $v \propto t$

তৃতীয় সূত্র : স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব (h) অতিক্রম করে তা ঐ সময়ের (t) বর্গের সমানুপাতিক অর্থাৎ, $h \propto t^2$

পড়ন্ত বস্তুর সমীকরণ :

ধরা যাক, কোনো বস্তু u আদি বেগ নিয়ে অভিকর্ষের প্রভাবে মুক্তভাবে পড়ছে। t সময় পরে বস্তুটি v বেগ প্রাপ্ত হয়। বস্তুটি যদি এই সময়ে h দূরত্ব নেমে আসে, তাহলে গতির সমীকরণে দূরত্ব s এর পরিবর্তে h এবং ত্বরণ a এর পরিবর্তে অভিকর্ষজ ত্বরণ g বসালেই পড়ন্ত বস্তুর গতির নিম্নোক্ত সমীকরণগুলো পাওয়া যাবে।

$$v = u + gt$$

$$h = \frac{(u+v)}{2}t$$

$$h = ut + \tfrac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 = u^2 + 2gh$$

গাণিতিক উদাহরণ ২.৬ : 50 m উঁচু দালানের ছাদ থেকে কোনো বস্তু ছেড়ে দিলে এটি কত বেগে ভূপৃষ্ঠকে আঘাত করবে ? $g = 9.8\ \text{m s}^{-2}$

আমরা জানি, পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে

$v^2 = u^2 + 2gh$

বা, $v^2 = 0 + 2 \times 9.8\ \text{m s}^{-2} \times 50\ \text{m}$

$= 980\ \text{m}^2\ \text{s}^{-2}$

$\therefore v = 31.3\ \text{m s}^{-1}$

উ: $31.3\ \text{m s}^{-1}$

এখানে,
আদিবেগ, $u = 0$
অতিক্রান্ত দূরত্ব, $h = 50\ \text{m}$
শেষ বেগ, $v = ?$
$g = 9.8\ \text{m s}^{-2}$

২.৭ গতি ও লেখচিত্র

Motion and graph

১. দূরত্ব–সময় লেখচিত্র

সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে একটি গতিশীল বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব সময়ের উপর নির্ভর করে। এই সম্পর্ক একটি লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। এই ক্ষেত্রে ছক কাগজের X–অক্ষ বরাবর সময় (t) এবং Y– অক্ষ বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব (s) স্থাপন করা হয়। এই লেখচিত্রকে দূরত্ব –সময় লেখচিত্র বলা হয়। এই লেখচিত্র থেকে সহজে বস্তুর বেগ নির্ণয় করা যায়। নিম্নে সুষম বেগ ও অসম বেগের ক্ষেত্রে দূরত্ব –সময় লেখচিত্র থেকে বেগ নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করা হলো। জটিলতা পরিহারের জন্য আমরা এখানে কেবল সরল রেখা বরাবর চলমান বস্তুর গতি আলোচনা করব। এই ক্ষেত্রে একটি গতিশীল বস্তুর বেগের দিকের কোনো পরিবর্তন হবে না ; সুতরাং কেবল মানের পরিবর্তনের জন্য বেগের পরিবর্তন ঘটবে।

(ক) সুষম বেগের ক্ষেত্রে :

ধরা যাক, কোনো সোজা সমতল রাস্তায় সিএনজি (CNG) চালিত দূষণমুক্ত একটি অটোরিকশা চলছে। প্রতি 12 মিনিট পরপর এর অতিক্রান্ত দূরত্ব নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

দূরত্ব –সময় সারণি

সারণি ২.৩

সময়, t (min)	দূরত্ব, s (km)
0	0
12	6
24	12
36	18
48	24
60	30

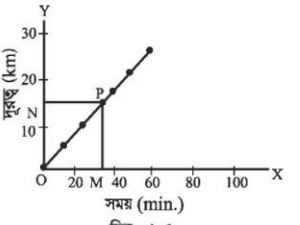

চিত্র : ২.৫

উপরের সারণিতে বর্ণিত গতির জন্য দূরত্ব –সময় লেখ চিত্রটি ২.৫ চিত্রে দেখানো হলো। এই চিত্র থেকে যেকোনো সময়ে ধরা যাক, 32 মিনিটে অটোরিকশাটি কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করা যাবে। এজন্য আমাদেরকে প্রথমে X–অক্ষের উপর 32 মিনিট নির্দেশকারী বিন্দুটি (M) চিহ্নিত করতে হবে। তারপর ঐ বিন্দু থেকে লেখচিত্রের উপর Y অক্ষের সমান্তরাল একটি রেখা আঁকতে হবে। মনে করা যাক, রেখাটি লেখচিত্রের উপর P বিন্দুতে মিলিত হয়। এখন P বিন্দু থেকে Y অক্ষের উপর লম্ব টানতে হবে। এই লম্ব Y অক্ষকে যে বিন্দুতে (N) ছেদ করে তাই হচ্ছে 32 মিনিটে অতিক্রান্ত দূরত্ব (ON)। দেখা যায় যে, অটোরিকশাটি এ সময়ে 16 km দূরত্ব অতিক্রম করেছে। সুতরাং, লেখচিত্র থেকে যেকোনো সময় $t = OM$ এর জন্য অতিক্রান্ত দূরত্ব $s = PM$ পাওয়া যায়।

$$\therefore \text{বেগ} = \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}} = \frac{PM}{OM} = \frac{ON}{OM}, \text{ এখানে, } \frac{PM}{OM} \text{ কে } OP \text{ রেখার ঢাল (slope) বলে।}$$

নিজে করঃ একটি ছক কাগজ নাও। এই কাগজে তোমার পছন্দমতো ও সুবিধাজনক একক নিয়ে উপরের সারণিতে বর্ণিত গতির জন্য দূরত্ব –সময় লেখ চিত্রটি অঙ্কন কর। এই লেখচিত্র থেকে 32 মিনিটে অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং বেগ বের কর। 44 মিনিটে অতিক্রান্ত দূরত্ব ও বেগ কত হবে?

(খ) অসম বেগের ক্ষেত্রে :

২.৬ চিত্রে অসম বেগে গতিশীল একটি বস্তুর দূরত্ব–সময় লেখচিত্র দেখানো হলো। যেহেতু এ ক্ষেত্রে বস্তুটি সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে না তাই লেখচিত্রটি সরল রেখা হবে না। এটি একটি বক্র রেখা হবে। যেহেতু এ ক্ষেত্রে বস্তুটি সুষম বেগে চলছে না,

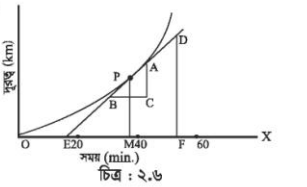

চিত্র : ২.৬

কাজেই গতিকালের সকল মুহূর্তে এর বেগ সমান হয় না। লেখচিত্র থেকে আমরা বস্তুটির যেকোনো মুহূর্তের বেগ নির্ণয় করতে পারব। ধরা যাক 36 মিনিটে বস্তুটির বেগ নির্ণয় করতে হবে। এজন্য X অক্ষের উপর 36 মিনিট নির্দেশকারী বিন্দু (M) চিহ্নিত করতে হবে। M বিন্দু থেকে Y অক্ষের সমান্তরাল একটি রেখা আঁকতে হবে। ধরা যাক রেখাটি লেখচিত্রের উপর (P) বিন্দুতে মিলিত হলো। এবার P বিন্দুতে বেগ নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে একটি অতি ক্ষুদ্র সমকোণী ত্রিভুজ ABC বিবেচনা করতে হবে যার অতিভুজ AB এত ক্ষুদ্র যে এটি P বিন্দুর অতি সন্নিকটে বক্র রেখার সাথে কার্যত মিলে যায়। অন্য কথায়, আমরা এই বক্র রেখার একটি খণ্ডাংশ বিবেচনা করছি যেটি সরল রেখারূপে গণ্য করার মতো যথেষ্ট ক্ষুদ্র।

তাহলে, P বিন্দুতে

$$\text{বেগ} = \frac{AC \text{ দ্বারা নির্দেশিত দূরত্ব}}{BC \text{ দ্বারা নির্দেশিত সময় ব্যবধান}}$$

$$\text{বা, } v = \frac{AC}{BC}$$

কিন্তু এত ছোট ত্রিভুজ বিবেচনা করে তার থেকে পরিমাপ করে সঠিক ফল পাওয়া মুশকিল। তাই আমরা P বিন্দুতে ED স্পর্শক আঁকি এবং ABC ত্রিভুজের সদৃশ কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় ত্রিভুজ DEF অঙ্কন করি।

এখন ত্রিভুজ ABC এবং ত্রিভুজ DEF থেকে পাই, $\frac{AC}{BC} = \frac{DF}{EF}$

$$\text{সুতরাং, } v = \frac{DF}{EF}$$

কিন্তু $\frac{DF}{EF}$ হলো ED এর ঢাল।

সুতরাং P বিন্দুতে বেগ হলো ঐ বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল। তাই বলা যায় দূরত্ব–সময় লেখচিত্রের যেকোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল ঐ বিন্দুতে বেগ নির্দেশ করে।

২. বেগ–সময় লেখচিত্র

অসম বেগে চলমান বস্তুর বেগ সময়ের উপর নির্ভর করে। এই সম্পর্ক একটি লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। এই ক্ষেত্রে ছক কাগজের X –অক্ষ বরাবর সময় (t) এবং Y–অক্ষ বরাবর বেগ (v) স্থাপন করা হয়। এই লেখচিত্রকে বেগ–সময় লেখচিত্র বলা হয়। এই লেখচিত্র থেকে সহজে যেকোনো মুহূর্তে বেগ এবং ত্বরণ অর্থাৎ সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তনের হার নির্ণয় করা যায়। নিম্নে সুষম ত্বরণের ক্ষেত্রে বেগ–সময় লেখচিত্র থেকে ত্বরণ নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

সুষম ত্বরণের ক্ষেত্রে

একটি বস্তু যখন সুষম ত্বরণে চলে তখন তার সমান সময়ে বেগের বৃদ্ধি সমান হয়। সুতরাং X–অক্ষের দিকে সময় (t) এবং Y–অক্ষের দিকে বেগ (v) নিয়ে বেগ–সময় লেখচিত্র আঁকলে সেটি একটি সরল রেখা হবে (চিত্র: ২.৭)। এখন আমরা এই লেখচিত্রের উপর যেকোনো একটি বিন্দু P নেই। P থেকে X–অক্ষের উপর PM লম্ব টানি। তাহলে যেকোনো সময় OM এর জন্য বেগের পরিবর্তন PM পাওয়া যায়।

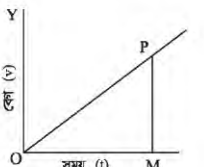

চিত্র : ২.৭

সুতরাং ত্বরণ $a = \frac{\text{বেগের পরিবর্তন}}{\text{সময় ব্যবধান}} = \frac{PM}{OM}$

কিন্তু $\frac{PM}{OM}$ হচ্ছে OP –এর ঢাল।

তাই বলা যায় বেগ–সময় লেখচিত্রের যেকোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল ঐ বিন্দুতে ত্বরণ নির্দেশ করে।

নিজে কর : নিচের সারণিতে পাঁচ সেকেন্ড পরপর একটি গাড়ির বেগ দেওয়া হলো।

সারণি : ২.৪

সময় (s)	বেগ ($km\ h^{-1}$)	বেগ ($m\ s^{-1}$)
0	0	0
5	9	2.5
10	18	5.0
15	27	7.5
20	36	10.0
25	45	12.5
30	54	15.0

একটি ছক কাগজ নাও। এই কাগজে তোমার পছন্দমতো সুবিধাজনক একক নিয়ে উপরের সারণিতে বর্ণিত গতির জন্য বেগ–সময় লেখচিত্রটি অঙ্কন কর। এই লেখচিত্র থেকে 12 সেকেন্ডের সময় গাড়িটির বেগ ও ত্বরণ বের কর।

অনুসন্ধান–২.১

একটি ঢালু তক্তার উপরে মার্বেল গড়িয়ে পড়তে দিয়ে গড় দ্রুতি নির্ণয়।

উদ্দেশ্য : বিভিন্ন ত্বরণে অতিক্রান্ত একই দূরত্বের জন্য সময় নির্ণয় করে প্রতিক্ষেত্রে গড় দ্রুতি নির্ণয়।

যন্ত্রপাতি : তক্তা, মিটার স্কেল,মার্বেল, থামা ঘড়ি।

কাজের ধারা :

১. যথাসম্ভব লম্বা একখানা তক্তা নাও। মিটার স্কেলের সাহায্যে এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

২. তক্তার এক প্রান্তের নিচে ইট বা বই দিয়ে উঁচু কর, ফলে তক্তাটি ঢালু হয়ে থাকবে।

৩. তক্তাটির উপরের প্রান্তে একটি মার্বেল ধর। মার্বেলটি ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে থামা ঘড়ি চালু কর। মার্বেলটি যখন তক্তা বেয়ে ভূমিতে আঘাত করবে তখন থামা ঘড়িটি বন্ধ করে দাও।

৭. ধারা –৪ এ উল্লিখিত গতির বৈশিষ্ট্যগুলো খাতায় লিপিবদ্ধ কর। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের গতি বৃত্তাকার গতি এবং পর্যায়বৃত্ত গতি। এই গতি বৃত্তাকার গতি এবং পর্যায়বৃত্ত গতি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

৮. ধারা –৫ এ উল্লিখিত গতির বৈশিষ্ট্যগুলো খাতায় লিপিবদ্ধ কর। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের গতি পর্যায়বৃত্ত গতি এবং স্পন্দন গতি। এই গতি পর্যায়বৃত্ত গতি এবং স্পন্দন গতি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

৯. এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন গতির তুলনা কর। এগুলোর মধ্যে পার্থক্য লিখ।

অনুসন্ধান–২.৩

১০০ মিটার দৌড়ে শিক্ষার্থীর দ্রুতি নির্ণয় এবং লেখচিত্রে তা বিশ্লেষণ।

উদ্দেশ্য : বিভিন্ন সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করে গড় দ্রুতি নির্ণয়, দূরত্ব–সময় লেখচিত্র অঙ্কন এবং যেকোনো সময়ে তাৎক্ষণিক দ্রুতি নির্ণয়।

যন্ত্রপাতি : মিটার স্কেল, থামা ঘড়ি, দড়ি অথবা মাপ ফিতা।

কাজের ধারা :

১. স্কুলের খেলার মাঠের (স্কুলের নিজস্ব মাঠ না থাকলে অন্য কোনো মাঠে) এক প্রান্তে একটি দড়ি সোজা করে বিছাও।

২. এই দড়ি থেকে 25 মিটার দূরে দূরে আরো চারটি দড়ি বিছাও। সুতরাং শেষ দড়িটি হবে 100 মিটার দূরে।

৩. প্রথম দড়ির কাছে তুমি দাড়াও এবং বাকি চারটি দড়ির পাশে তোমার চার বন্ধু চারটি থামা ঘড়ি নিয়ে দাঁড়াবে।

৪. শিক্ষক বাঁশিতে ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে তুমি দৌড় শুরু করবে এবং প্রত্যেকে যার যার থামা ঘড়ি চালু করবে।

৫. দৌড়বিদ যখন যার সামনের দড়ি অতিক্রম করবে তখন সে তার থামা ঘড়ি বন্ধ করবে। ঘড়ির পাঠ থেকে ঐ দূরত্বের জন্য সময় পাওয়া যাবে।

৬. দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করে ঐ সময় ব্যবধানের জন্য বা ঐ দূরত্বের জন্য গড় দ্রুতি পাওয়া যাবে।

৭. এখন একটি ছক কাগজে X –অক্ষের দিকে সময় (t) এবং Y –অক্ষের দিকে দূরত্ব (d) স্থাপন করে একটি লেখচিত্র অঙ্কন কর।

৮. লেখচিত্র থেকে যেকোনো সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং এই সময় ব্যবধানের গড় দ্রুতি এবং ঐ মুহূর্তের তাৎক্ষণিক দ্রুতি নির্ণয় কর।

৯. বিভিন্ন দ্রুতিতে হেঁটে এবং দৌড়ে এই পরীক্ষণটির পুনরাবৃত্তি কর।

১০. এইভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী পরীক্ষণটি সম্পন্ন কর।

অনুসন্ধানের ছক

পাঠ	অতিক্রান্ত দূরত্ব (m)	সময় (s)	গড় দ্রুতি = $\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}$ $(m\ s^{-1})$
1			
2			
3			
4			

৭. ধারা –৪ এ উল্লিখিত গতির বৈশিষ্ট্যগুলো খাতায় লিপিবদ্ধ কর। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের গতি বৃত্তাকার গতি এবং পর্যায়বৃত্ত গতি। এই গতি বৃত্তাকার গতি এবং পর্যায়বৃত্ত গতি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

৮. ধারা –৫ এ উল্লিখিত গতির বৈশিষ্ট্যগুলো খাতায় লিপিবদ্ধ কর। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের গতি পর্যায়বৃত্ত গতি এবং স্পন্দন গতি। এই গতি পর্যায়বৃত্ত গতি এবং স্পন্দন গতি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

৯. এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন গতির তুলনা কর। এগুলোর মধ্যে পার্থক্য লিখ।

অনুসন্ধান–২.৩

১০০ মিটার দৌড়ে শিক্ষার্থীর দ্রুতি নির্ণয় এবং লেখচিত্রে তা বিশ্লেষণ।

উদ্দেশ্য : বিভিন্ন সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করে গড় দ্রুতি নির্ণয়, দূরত্ব–সময় লেখচিত্র অঙ্কন এবং যেকোনো সময়ে তাৎক্ষণিক দ্রুতি নির্ণয়।

যন্ত্রপাতি : মিটার স্কেল, থামা ঘড়ি, দড়ি অথবা মাপ ফিতা।

কাজের ধারা :

১. স্কুলের খেলার মাঠের (স্কুলের নিজস্ব মাঠ না থাকলে অন্য কোনো মাঠে) এক প্রান্তে একটি দড়ি সোজা করে বিছাও।

২. এই দড়ি থেকে 25 মিটার দূরে দূরে আরো চারটি দড়ি বিছাও। সুতরাং শেষ দড়িটি হবে 100 মিটার দূরে।

৩. প্রথম দড়ির কাছে তুমি দাড়াও এবং বাকি চারটি দড়ির পাশে তোমার চার বন্ধু চারটি থামা ঘড়ি নিয়ে দাঁড়াবে।

৪. শিক্ষক বাঁশিতে ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে তুমি দৌড় শুরু করবে এবং প্রত্যেকে যার যার থামা ঘড়ি চালু করবে।

৫. দৌড়বিদ যখন যার সামনের দড়ি অতিক্রম করবে তখন সে তার থামা ঘড়ি বন্ধ করবে। ঘড়ির পাঠ থেকে ঐ দূরত্বের জন্য সময় পাওয়া যাবে।

৬. দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করে ঐ সময় ব্যবধানের জন্য বা ঐ দূরত্বের জন্য গড় দ্রুতি পাওয়া যাবে।

৭. এখন একটি ছক কাগজে X –অক্ষের দিকে সময় (t) এবং Y –অক্ষের দিকে দূরত্ব (d) স্থাপন করে একটি লেখচিত্র অঙ্কন কর।

৮. লেখচিত্র থেকে যেকোনো সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং এই সময় ব্যবধানের গড় দ্রুতি এবং ঐ মুহূর্তের তাৎক্ষণিক দ্রুতি নির্ণয় কর।

৯. বিভিন্ন দ্রুতিতে হেঁটে এবং দৌড়ে এই পরীক্ষণটির পুনরাবৃত্তি কর।

১০. এইভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী পরীক্ষণটি সম্পন্ন কর।

অনুসন্ধানের ছক

পাঠ	অতিক্রান্ত দূরত্ব (m)	সময় (s)	গড় দ্রুতি = $\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}$ $(m\ s^{-1})$
1			
2			
3			
4			

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

১। ত্বরণের একক কোনটি?

(ক) $m\,s^{-1}$ (খ) $m\,s^{-2}$ (গ) $N\,s$ (ঘ) $kg\,s^{-2}$

২। ঘড়ির কাঁটার গতি কী রকম গতি ?

(ক) রৈখিক গতি (খ) উপবৃত্তাকার গতি

(গ) পর্যায়বৃত্ত গতি (ঘ) স্পন্দন গতি

৩। স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তা ঐ সময়ের–

(ক) সমানুপাতিক (খ) বর্গের সমানুপাতিক

(গ) ব্যস্তানুপাতিক (ঘ) বর্গের ব্যস্তানুপাতিক

৪। একটি বস্তু স্থির অবস্থান থেকে a সমত্বরণে চলছে। নির্দিষ্ট সময়ে এই বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে –

(i) $s=\frac{(u+v)}{2}t$ (ii) $s=ut+\frac{1}{2}at^2$ (iii) $s^2=u\ +2a$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। নিচের বেগ–সময় লেখচিত্রের কোনটি মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর লেখচিত্র নির্দেশ করে?

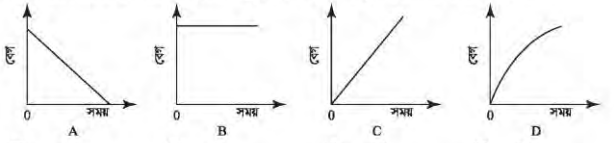

(ক) A (খ) B (গ) C (ঘ) D

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রাজীবরা সপরিবারে সিলেটের জাফলং বেড়াতে যাবার জন্য একটি মাইক্রোবাসে রওনা হলো। সে যাত্রার শুরু থেকে সিলেট যাওয়া পর্যন্ত প্রতি 5 min পরপর গাড়ির স্পিডোমিটার থেকে বেগের মান তথা দ্রুতি লিখে নিল। বেগের মান পেল যথাক্রমে প্রতি ঘণ্টায় 18,36,54,54,54,36 ও 18 কিলোমিটার।

(ক) তাৎক্ষণিক দ্রুতি কী ?

(খ) বৃত্তাকার পথে গতিশীল কোনো বস্তুর ত্বরণ ব্যাখ্যা কর ।

(গ) প্রথম ৫ মিনিটে গাড়িটির অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় কর।

(ঘ) সংগৃহীত উপাত্ত দিয়ে বেগ–সময় লেখচিত্র অঙ্কন করে তা ব্যাখ্যা কর ?

তৃতীয় অধ্যায়
বল
FORCE

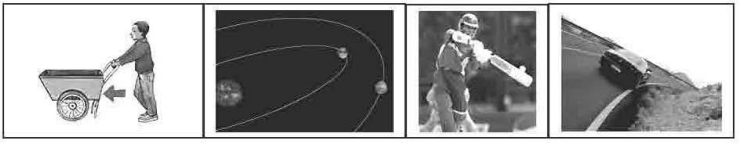

[স্যার আইজাক নিউটন বস্তুর গতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। তিনি গতির মৌলিক নীতিগুলোকে তিনটি সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এ অধ্যায়ে আমরা গতি বিষয়ক এই সূত্রগুলো আলোচনা করব। এ ছাড়াও বস্তুর জড়তা, বল, বলের প্রকৃতি, ভরবেগ, ঘর্ষণ ও নিরাপদ ভ্রমণ নিয়ে এ অধ্যায়ে আলোচিত হবে।]

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

১. বস্তুর জড়তা ও বলের গুণগত ধারণা নিউটনের গতির প্রথম সূত্র ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করতে পারব।

২. বিভিন্ন প্রকার বলের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব।

৩. সাম্য ও অসাম্য বলের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।

৪. ভরবেগ ব্যাখ্যা করতে পারব।

৫. গতি এবং বস্তুর আকারের উপর বলের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।

৬. নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র ব্যবহার করে বল পরিমাপ করতে পারব।

৭. নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র ব্যবহার করে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল ব্যাখ্যা করতে পারব।

৮. নিরাপদ ভ্রমণে গতি এবং বলের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।

৯. ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র ও সংঘর্ষ ব্যাখ্যা করতে পারব।

১০. বিভিন্ন প্রকার ঘর্ষণ এবং ঘর্ষণ বল ব্যাখ্যা করতে পারব।

১১. বস্তুর গতির উপর ঘর্ষণের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।

১২. ঘর্ষণ হ্রাস–বৃদ্ধি করার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।

১৩. আমাদের জীবনে ঘর্ষণের ইতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।

৩.১ জড়তা এবং বলের গুণগত ধারণা– নিউটনের প্রথম সূত্র
Inertia and qualitative concept of force- Newton's first law

আমরা আমাদের চারপাশে নানা ধরনের বস্তু দেখতে পাই। এদের কোনোটি স্থির, আবার কোনোটি গতিশীল। স্থিতি, গতি, সরণ, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি। স্থির বস্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে চেয়ার, টেবিল, ঘরবাড়ি, কাঠের গুঁড়ি ইত্যাদি। আবার গতিশীল বস্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে চলন্ত রিকশা, বাস, সাইকেল, পতনশীল বস্তু ইত্যাদি। স্থির বস্তুগুলো কি নিজে থেকে নিজেদের গতিশীল করতে পারে? আজ রাতে তোমার পড়ার টেবিলকে যেখানে দেখতে পেলে আগামীকাল সকালে এটি কি সেখানে থাকবে? এসব বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কী দেখতে পাই? আমরা দেখি, যে বস্তুগুলো স্থির ছিল সেগুলো স্থিরই রয়েছে। এগুলো নিজে থেকে গতিশীল হতে পারে না। আবার ধর, তোমার এক বন্ধু সমতল রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। কোনো এক সময় সে সাইকেলে প্যাডেল দেওয়া বন্ধ করে দিল। সাইকেলটি কি সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাবে? আমরা দেখতে পাই সাইকেলটি কিছু পথ চলার পর আস্তে আস্তে থেমে যায়। যদি বায়ুর বাধা এবং রাস্তার ঘর্ষণ না থাকত তাহলে সাইকেলটি কি অবিরাম গতিতে চলতে থাকত?

এ সকল ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, প্রত্যেক বস্তুই যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায়ই থাকতে চায়। কোনো বস্তু যদি স্থির থাকে, তবে এটি স্থিরই থাকতে চায়। আবার বস্তু গতিশীল থাকলে এটি গতিশীল থাকতে চায়। বস্তুর নিজস্ব অবস্থা বজায় রাখতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা ধর্ম তাই হলো জড়তা। সুতরাং বস্তু যে অবস্থায় আছে চিরকাল সে অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা সে অবস্থা বজায় রাখতে চাওয়ার যে ধর্ম তাকে জড়তা বলে।

কোনো বস্তুর জড়তা এর ভরের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ ভর হচ্ছে এর জড়তার পরিমাপ। যে বস্তুর ভর বেশি তার জড়তা বেশি। অন্যভাবে বলা যায়, যে বস্তুর জড়তা বেশি তাকে গতিশীল করা, বেগ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা কিংবা বেগের দিক পরিবর্তন করা তত কঠিন।

নিজে কর

- একটি কলম ও একটি বই টেবিলের উপর রাখ। এবার কলমটিকে হাতের আঙুল দিয়ে টোকা দাও। কী দেখতে পেলে? কলমটি টেবিলের উপর খানিকটা দূরে সরে গেল।
- এবার বইটিকে আগের মতোই আঙুল দিয়ে টোকা দাও। বইটি আদৌ সরছে না। এবার বইটিকে হাত দিয়ে ধাক্কা দাও। এখন বইটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যাবে।

কলম ও বইয়ের মধ্যে বইকে সরাতে বেশি চেষ্টা করতে হয়েছে কারণ, কলমের চেয়ে বইয়ের ভর বেশি অর্থাৎ জড়তা বেশি।

জড়তার উদাহরণ

থেমে থাকা বাস হঠাৎ চলতে শুরু করলে বাসযাত্রী পেছনের দিকে হেলে পড়েন। এর কারণ হলো স্থিতি জড়তা। বাস যখন স্থির অবস্থায় থাকে তখন যাত্রীর শরীরও স্থির থাকে। কিন্তু বাস চলতে আরম্ভ করলে যাত্রীর শরীরের বাস

সংলগ্ন অংশ গতিশীল হয়। কিন্তু শরীরের উপরের অংশ স্থিতি জড়তার জন্য স্থির অবস্থায় থাকতে চায়। তাই শরীরের নিচের অংশ সাপেক্ষে উপরের অংশ পিছিয়ে পড়ে। যার ফলে যাত্রী পেছনের দিকে হেলে পড়েন। আবার চলন্ত বাসে হঠাৎ ব্রেক করলে যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। বাস যখন চলন্ত অবস্থায় থাকে, তখন বাসের যাত্রীও বাসের সাথে একই গতিপ্রাপ্ত হয়। বাস হঠাৎ থেমে গেলে বাসের সাথে সাথে যাত্রীর শরীরের নিচের অংশ স্থির হয়। কিন্তু বাসযাত্রীর শরীরের উপরের অংশ গতি জড়তার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

গাড়ি চালানোর সময় গাড়ির চালকগণ নিরাপত্তার কারণে সিটবেল্ট বাঁধেন। এর কারণ কী ? এর মূলে রয়েছে জড়তা। যদি তিনি সিটবেল্ট ব্যবহার না করেন, তবে দ্রুত ব্রেক কষার কারণে গতি জড়তার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বেন। এর ফলে তিনি তার সামনে গাড়ির স্টিয়ারিংসহ অন্যান্য বস্তুতে সজোরে আঘাত করবেন, ফলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। শুধু চালক নন, যে সকল গাড়িতে সিট বেল্টের ব্যবস্থা আছে সেই সকল গাড়ির যাত্রীদেরও সিট বেল্ট বাঁধা উচিত ।

বল

আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে বল সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা আছে। আমরা যখন কোনো বস্তুকে টানি বা ঠেলি, তখন আমরা বলি যে বস্তুটিতে বল প্রয়োগ করা হয়েছে। এই প্রযুক্ত বল স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে পারে, আবার গতি সৃষ্টির চেষ্টাও করতে পারে। আবার বস্তুটি যদি গতিশীল অবস্থায় থাকে, তাহলে প্রযুক্ত বল বস্তুটিকে থামাতে পারে বা বেগ বৃদ্ধির চেষ্টা করতে পারে। অর্থাৎ কোনো বল বস্তুতে ত্বরণ সৃষ্টি করতে পারে। বল কোনো বস্তুকে বিকৃতও করতে পারে অর্থাৎ আকারের পরিবর্তন করতে পারে। আমরা যখন কোনো রাবারের টুকরা বা স্প্রিংয়ের দুইপ্রান্ত ধরে বল প্রয়োগ করি তখন তা বিকৃত হয়ে প্রসারিত বা সংকুচিত হয়।

চিত্র: ৩.১

এখন আমরা দেখব নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে কীভাবে জড়তা ও বল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। নিউটনের গতি বিষয়ক প্রথম সূত্রটি হলো–

'বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সুষম দ্রুতিতে সরলপথে চলতে থাকবে।'

নিউটনের প্রথম সূত্রটি পদার্থের জড়তা ধর্মকে প্রকাশ করে এবং বলের সংজ্ঞা প্রদান করে।

নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে দেখতে পাই যে, কোনো বস্তু নিজে থেকে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। বস্তু স্থির থাকলে চিরকাল স্থির থাকতে চায়, আর গতিশীল থাকলে চিরকাল সুষম দ্রুতিতে সরলপথে চলতে চায়। বস্তুর এ ধর্মই হলো জড়তা। অর্থাৎ নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে জড়তার ধারণা পাওয়া যায়।

আবার নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে জানা যায় যে, বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে বাইরে থেকে একটা কিছু প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ যা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করতে বাধ্য করে বা করতে চায় তাই হচ্ছে বল। তাই নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে বলের গুণগত সংজ্ঞা পাওয়া যায়। নিউটনের প্রথম সূত্রানুসারে যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করার চেষ্টা করে বা যা গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তার গতির পরিবর্তন করে বা করার চেষ্টা করে তাকে বল বলে।

৩.২ বলের প্রকৃতি

Nature of force

স্পর্শ বল :

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের বলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এদের প্রকৃতিও বিভিন্ন ধরনের। এদের কোনোটি দুইটি বস্তুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের ফলে সৃষ্টি হয়। আবার এমন কতকগুলো বল রয়েছে যেখানে দুইটি বস্তুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের প্রয়োজন নেই। যে বল সৃষ্টির জন্য দুইটি বস্তুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের প্রয়োজন তাকে স্পর্শ বল বলে। যখন আমরা হাত দিয়ে কোনো বস্তুকে ঠেলি বা টানি তখন আমাদের হাত বস্তুর উপর একটি বল প্রয়োগ করে। এই ঠেলা বা টানা বল হচ্ছে স্পর্শ বল। কেননা হাত ও বস্তুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের ফলশ্রুতি হচ্ছে এ বল। স্পর্শ বলের উদাহরণ হলো– ঘর্ষণ বল, টান বল এবং সংঘর্ষের সময় সৃষ্ট বল।

আমরা জানি, একটি বস্তু যখন অন্য একটি বস্তুর উপর দিয়ে চলতে চেষ্টা করে বা চলতে থাকে তখন বস্তুদ্বয়ের স্পর্শতলে গতির বিরুদ্ধে বাধাদানকারী ঘর্ষণ বলের সৃষ্টি হয়। এখানে দুইটি বস্তুর তলের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের ফলে ঘর্ষণ বলের উদ্ভব হয়। মেঝের উপর দিয়ে একটি বক্সকে টেনে নেওয়ার সময় আমরা টান বল প্রয়োগ করি। বক্সের গতির বিপরীত দিকে তখন ঘর্ষণ বলের সৃষ্টি হয়।

অস্পর্শ বল :

দুইটি বস্তুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ছাড়াই যে বল ক্রিয়া করে তাকে অস্পর্শ বল বলে। যেমন দুইটি বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণমূলক মহাকর্ষ বল, দুইটি আহিত বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণকারী তড়িৎ বল, দুইটি চুম্বকের মেরুর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণমূলক বল অথবা একটি চুম্বক ও একটি চৌম্বক পদার্থের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল হলো অস্পর্শ বল তথা দূরবর্তী বলের উদাহরণ।

নিজে কর : তুমি হাত থেকে কলম বা পেন্সিল বা অন্য যেকোনো একটি বস্তু ছেড়ে দাও ।

বস্তুটি নিচের দিকে পড়বে। কেউ নিশ্চয়ই বস্তুটিকে নিচের দিকে টানছে। কে টানছে ? পৃথিবী বস্তুটিকে তার দিকে টানছে , যদিও বস্তু ও পৃথিবীর মধ্যে সরাসরি কোনো সংযোগ নেই অর্থাৎ পৃথিবী বস্তুটিকে স্পর্শ করে নাই। পৃথিবী বস্তুর উপর মহাকর্ষ বল প্রয়োগ করছে। এখানে মহাকর্ষ বল হচ্ছে অস্পর্শ বল। মহাবিশ্বের যেকোনো দুইটি বস্তু পরস্পরের উপর মহাকর্ষ বল প্রয়োগ করে থাকে। অবশ্য পৃথিবী যখন কোনো বস্তুর উপর মহাকর্ষ বল প্রয়োগ করে তখন তাকে অভিকর্ষ বল বলা হয়ে থাকে।

৩.৩ সাম্য ও অসাম্য বল

Balanced and unbalanced forces

কোনো বস্তুর উপর একাধিক বল ক্রিয়া করলে যদি বলের লব্ধি শূন্য হয় অর্থাৎ বস্তুর কোনো ত্বরণ না হয়, তখন আমরা বলি বস্তুটি সাম্যাবস্থায় আছে। যে বলগুলো এই সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করে তাদেরকে সাম্য বল বলে।

চিত্রে দেখা যাচ্ছে একটি গোলককে বা কোনো বস্তুকে একটি সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দেওয়া আছে। এখন বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল তথা বস্তুর ওজন W খাড়া নিচের দিকে ক্রিয়া করছে। আবার সুতার টান T খাড়া উপরের দিকে ক্রিয়া করছে। এখানে বল দুইটি সমান ও বিপরীতমুখী হওয়ায় একে অপরের ক্রিয়াকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে সাম্যাবস্থার সৃষ্টি করেছে।

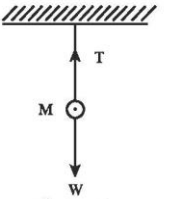

চিত্র : ৩.২

যদি উপরিউক্ত চিত্রে সুতা কেটে দেওয়া হয় তাহলে বস্তুর উপর কেবলমাত্র পৃথিবীর আকর্ষণ তথা অভিকর্ষ বল ক্রিয়া করবে। ফলে বস্তুটি অভিকর্ষ ত্বরণ সহকারে নিচের দিকে পড়তে থাকবে। এখানে অভিকর্ষ বল বা বস্তুর ওজন হচ্ছে অসাম্য বল।

যদি বস্তুটিকে একপাশে একটু টেনে নেওয়া হয় তাহলে সুতার টান T এবং বস্তুর ওজন W একই সরল রেখায় থাকবে না। ফলে সাম্যাবস্থার সৃষ্টি না হয়ে বস্তুটির উপর একটি লব্ধি বল কাজ করবে। এর ফলে বস্তুটি দুলতে থাকবে। এটা অসাম্য বলের একটি উদাহরণ।

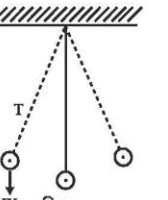

চিত্র : ৩.৩

সাম্য ও অসাম্য বলের অন্য উদাহরণ তোমরা রশি টানাটানি প্রতিযোগিতায় দেখে থাকতে পার। এই প্রতিযোগিতায় রশির মাঝখানে একটি রুমাল বাধা থাকে। প্রতিযোগিতার সময় সমান সংখ্যক প্রতিযোগী রশির দুই প্রান্ত ধরে তাদের দিকে রশিটিকে টেনে রুমালটিকে তাদের দিকে সরাতে চেষ্টা করে। রুমালটি যদি কোনো দিকে না সরে তা হলে বুঝা যায় দুই দলই সমান বল প্রয়োগ করেছে ফলে রশিটি তথা রুমালটি সাম্যাবস্থায় আছে। এখানে দুই দলের প্রদত্ত বল হলো সাম্য বল।

আর যদি কোনো একদল বেশি বল প্রয়োগ করতে পারে, তাহলে লব্ধি বল তাদের দিকে ক্রিয়া করে অসাম্য বলের সৃষ্টি করবে এবং রুমালটি তাদের দিকে সরে যাবে। ফলে প্রতিযোগিতায় তারা বিজয়ী ঘোষিত হবে।

চিত্র : ৩.৪

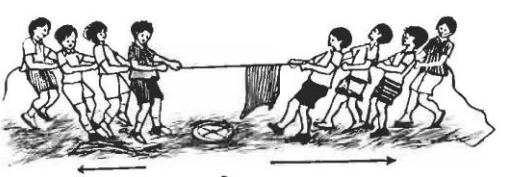
চিত্র : ৩.৫

৩.৪ ভরবেগ
Momentum

গতিশীল বস্তুর ভর ও বেগের সমন্বয়ে যে ভৌত রাশির উদ্ভব হয় তা হলো ঐ বস্তুর ভরবেগ। ভরবেগ বস্তুর ভর এবং বেগের উপর নির্ভরশীল। মালবাহী একটি ট্রাক এবং একটি প্রাইভেট গাড়ির কথা চিন্তা কর। মনে কর, দুইটি গাড়িই সমদ্রুতিতে একটি নির্দিষ্ট দিকে গতিশীল। গাড়ি দুইটিকে একই দূরত্বের মধ্যে থামাতে হবে। কোন গাড়িটিকে থামাতে শক্তিশালী ব্রেক প্রয়োগ করতে হবে? ট্রাককে। কারণ ট্রাক এবং গাড়ি একই দ্রুতিতে গতিশীল থাকা সত্ত্বেও ট্রাক যে ভৌত রাশি বেশি ধারণ করে তা হলো এর ভরবেগ।

কোনো গতিশীল বস্তুকে থামানো কত কষ্টসাধ্য বা কঠিন ভরবেগ হচ্ছে তার একটি পরিমাপ। ভরবেগ বলের সঙ্গে সম্পর্কিত। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে এ সম্পর্কটি পরিমাণগতভাবে পাওয়া যায়।

কোনো বস্তুর ভর ও বেগের গুণফলকে এর ভরবেগ বলে।

ধরি, একটি বস্তুর ভর = m

বেগ = v

$\therefore$ ভরবেগ $p = mv$ (3.1)

ভরবেগ একটি ভেক্টর রাশি। এর দিক বেগের দিকে।

সমীকরণ (3.1) থেকে দেখা যায়, কোনো বস্তুর ভর যত বেশি হবে এবং বস্তু যত দ্রুত চলবে তার ভরবেগও তত বেশি হবে।

একক: ভরবেগের একক হলো, ভরের একক $\times$ বেগের একক অর্থাৎ $\text{kg} \times \text{ms}^{-1}$ বা kg ms^{-1}।

1 kg ভরের কোনো বস্তু 1ms^{-1} বেগে চললে এর ভরবেগ হবে 1kg ms^{-1}

ভরবেগের মাত্রা : $[p] = MLT^{-1}$

৩.৫ বস্তুর গতির এবং আকারের উপর বলের প্রভাব
Effect of force on motion and shape of a body

প্রযুক্ত বল কোনো স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে পারে

যখন কোনো খেলোয়াড় স্থির ফুটবলকে কিক করেন তখন কী ঘটে? দেখা যায় যে, ফুটবলটি স্থির অবস্থা থেকে যে দিকে ফুটবলটিকে কিক করা হয়েছে সে দিকে গতিশীল হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ফুটবলটি স্থির অবস্থা থেকে ত্বরণ লাভ করে। এক্ষেত্রে সৃষ্ট ত্বরণের মান ধনাত্বক এবং ত্বরণের দিক হলো কিকের মাধ্যমে যে দিকে বল প্রয়োগ করা হয় সেই দিকে।

প্রযুক্ত বল গতিশীল বস্তুর বেগ বৃদ্ধি করতে পারে

নিজে করি: একটি গড়ানো মার্বেলকে মার্বেলটি যে দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে সে দিক বরাবর টোকা দাও। কী দেখতে পেলে?

মার্বেলটি আরও বেশি দ্রুত গড়াতে লাগল। এক্ষেত্রে মার্বেলটির গতি বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ মার্বেলটির ধনাত্মক ত্বরণ হয়েছে।

বল প্রয়োগের ফলে গতিশীল বস্তুর বেগ হ্রাস পায়

এবার ধরো, তোমার বন্ধু রিকশায় তোমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়ে তুমি রিকশা টেনে ধরলে। তা হলে রিকশার গতি মন্থর হবে অর্থাৎ বল প্রয়োগে গতিশীল রিকশার বেগ কমে গেল।

প্রযুক্ত বল কোনো গতিশীল বস্তুর বেগের দিক পরিবর্তন করতে পারে

ক্রিকেট খেলায় একজন খেলোয়াড় বিপরীত দিক থেকে আসত ক্রিকেট বলকে ব্যাট দ্বারা আঘাত করেন। ব্যাট দ্বারা আঘাতের ফলে বলটির বেগের মান ও দিক উভয়েই পরিবর্তিত হয়। যে দিক থেকে বলটি আসছিল ব্যাট দ্বারা আঘাতের ফলে এটি অন্য কোনো দিকে গতিশীল হয়। এক্ষেত্রেও ক্রিকেট বলটির ত্বরণ হয়েছে।

বস্তুর আকারের উপর বলের প্রভাব

আমাদের চারপাশে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে বলের ক্রিয়ায় বস্তুর আকারের পরিবর্তন হয়। একটি খালি প্লাস্টিকের পানির বোতল চেপে ধরলে বোতলের আকারের পরিবর্তন হয়। আবার যখন কোনো রাবার ব্যান্ডকে টেনে প্রসারিত করা হয়। তখন এটি লম্বা হয়ে যায় অর্থাৎ এর আকারের পরিবর্তন হয়।

চিত্র। ৩.৬

কখনো কখনো বলের ক্রিয়ায় বস্তুর এই আকার পরিবর্তন ক্ষণস্থায়ী হয়। আবার কখনো বল প্রয়োগের ফলে স্থায়ীভাবে বস্তুর আকারের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। উদাহরণ হিসেবে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ধাতব ক্যান অথবা দুর্ঘটনার পরে কোনো গাড়ির ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবর্তন ঘটে।

৩.৬ বল এবং ত্বরণের সম্পর্ক –নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র

Relation between force and acceleration- Newton's second law

নিউটনের প্রথম সূত্র বলের গুণগত ধারণা দেয়। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র বল পরিমাপের সমীকরণ প্রদান করে।

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল এবং এর ফলে সৃষ্ট ত্বরণের মধ্যে সম্পর্ক জানা যায়। সূত্রটি নিম্নরূপ :

বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে।

ধরা যাক, m ভরবিশিষ্ট একটি বস্তু u আদিবেগে চলছে। এখন F ধ্রুব বল বস্তুর উপর t সময় ধরে বেগের অভিমুখে ক্রিয়া করলো। ধরা যাক, বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর বেগ u হতে পরিবর্তিত হয়ে v হলো।

$\therefore$ বস্তুটির আদি ভরবেগ = mu

$\therefore$ বস্তুটির শেষ ভরবেগ = mv

t সময়ে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন = $mv - mu$

সুতরাং, বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার $= \frac{mv - mu}{t}$

$$= ma \qquad \because \text{ত্বরণ, } a = \frac{v-u}{t}$$

নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রানুসারে, বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক
অর্থাৎ, $ma \propto F$

$$= kF \tag{3.2}$$

এখানে k একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। এর মান বলের এককের উপর নির্ভর করে। এ সমীকরণ থেকে বলের এককের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। বলের এককে বলা হয় নিউটন (N)। এ এককের সংজ্ঞা এমনভাবে দেওয়া হয় যাতে k =1 হয়। যখন $m = 1\text{kg}, a = 1\text{ms}^{-2}$
তখন $F = 1\text{N}$ ধরা হয় ফলে উপরিউক্ত (3.2) সমীকরণে $1\times1 = k\times1$ বা $k=1$ হয়।
সুতরাং ভর m কে kg, ত্বরণ a কে ms^{-2} এবং বল F কে N -দ্বারা প্রকাশ করলে সমীকরণ (3.2) থেকে পাওয়া যায়–

$$ma = 1.F$$

$$\text{বা } F = ma \tag{3.3}$$

বা বল = ভর × ত্বরণ

বলের মাত্রা : $[F] = MLT^{-2}$।

গাণিতিক উদাহরণ ৩.১: 50 kg ভরের একটি বস্তুর উপর কত বল প্রয়োগ করা হলে এর ত্বরণ 4 ms^{-2} হবে ?

আমরা জানি
$F = ma$
$= 50\text{ kg} \times 4\text{ ms}^{-2}$
$= 200\text{ kg ms}^{-2}$
$= 200\text{ N}$
উত্তর : 200 N

এখানে,
বস্তুর ভর, $m = 50$ kg
ত্বরণ, $a = 4\text{ ms}^{-2}$
বল, $F = ?$

গাণিতিক উদাহরণ ৩.২: একটি বালক 50 N বল দ্বারা 20 kg ভরের একটি বস্তুকে ধাক্কা দেয়। বস্তুটির ত্বরণ কত হবে?

আমরা জানি
$F = ma$
$a = \frac{F}{m}$
$= \frac{50N}{20kg}$
$= 2.5\text{ ms}^{-2}$
উত্তর : 2.5 ms^{-2}

এখানে,
বস্তুর ভর, $m = 20$ kg
প্রযুক্ত বল, $F = 50$ N
বস্তুর ত্বরণ, $a = ?$

৩.৭ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল– নিউটনের তৃতীয় সূত্র
Action and reaction force- Newton's third law

বলের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রকৃতিতে বল জোড়ায় জোড়ায় ক্রিয়া করে। যখনই কোনো বস্তুর উপর একটি বল প্রযুক্ত হয়, তখনই একটি সমমানের এবং বিপরীতমুখী বল অন্য একটি বস্তুর উপর ক্রিয়া করে। এই বিষয়টিকে সাধারণত এভাবে বলা হয়–

প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

এটি নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র হিসেবে পরিচিত।

অর্থাৎ নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে ক্রিয়া বল ও প্রতিক্রিয়া বলের মান সমান কিন্তু এদের দিক বিপরীতমুখী। ৩.৭ চিত্রে P বস্তুটি যদি Q বস্তুটির উপর F_1 বল প্রয়োগ করে, তখন সূত্রানুসারে Q বস্তুটিও P বস্তুর উপর সমান ও বিপরীতমুখী বল F_2 প্রয়োগ করবে। এখানে P বস্তু কর্তৃক Q বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলকে ক্রিয়া বল এবং Q বস্তু কর্তৃক P বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলকে প্রতিক্রিয়া বল বলে।

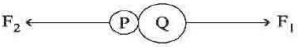

চিত্র : ৩.৭

সুতরাং, নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে, $F_2 = -F_1$

লক্ষণীয় যে, ক্রিয়াবল এবং প্রতিক্রিয়া বল সব সময়ই দুইটি ভিন্ন বস্তুর উপর ক্রিয়া করে। প্রতিক্রিয়া বলটি ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিয়াবলটি থাকবে।

উদাহরণ :

মাটির উপর হাঁটা

দৈনন্দিন জীবনে আমরা মাটির উপর দিয়ে হাঁটি বা দৌড়াই [চিত্র ৩.৮]। আমরা যখন মাটির উপর দিয়ে হাঁটি তখন পেছনের পা দ্বারা মাটির উপর পেছনের দিকে তির্যকভাবে একটি বল প্রয়োগ করি। এ বল হলো ক্রিয়া বল। তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী এই বলের বিপরীতে একটি প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি হয় এই প্রতিক্রিয়া বলের প্রভাবে আমরা রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটতে সক্ষম হই।

চিত্র : ৩.৮

৩.৮ ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র ও সংঘর্ষ :

Conservation law of momentum and collision

একাধিক বস্তুর মধ্যে শুধু ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্যকোনো বল কাজ না করলে কোনো নির্দিষ্ট দিকে তাদের মোট ভরবেগের কোনো পরিবর্তন হয় না। এটি হচ্ছে, ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র। ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র পদার্থবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এ নীতিকে কাজে লাগিয়ে আমরা অনেক ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারি।

তোমরা যারা মার্বেল খেলেছ তারা সম্ভবত দেখতে পেয়েছ কীভাবে একটি মার্বেল অন্য একটি মার্বেলকে আঘাত করে। এছাড়া সংবাদপত্র বা টেলিভিশনের মাধ্যমে তোমরা বিভিন্ন ধরনের সড়ক দুর্ঘটনার খবর জানতে পার। এ ধরনের ঘটনা হলো সংঘর্ষের বাস্তব উদাহরণ।

অর্থাৎ যখন একটি গতিশীল বস্তু অন্য একটি স্থির বা গতিশীল বস্তুকে ধাক্কা দেয়, তখন বস্তু দুইটির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে বলা হয়। সংঘর্ষের ফলে বস্তু দুইটির প্রত্যেকটির উপর একটি বল ক্রিয়া করে। প্রথম বস্তু কর্তৃক দ্বিতীয় বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলকে ক্রিয়া বল বলা হলে দ্বিতীয় বস্তু কর্তৃক প্রথম বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলকে প্রতিক্রিয়া বল বলা হয়। সংঘর্ষের সময় ক্রিয়াশীল এই দুইটি বলের মান সমান কিন্তু বিপরীতমুখী। সংঘর্ষের সময় দুইটি বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল ব্যতীত বাহ্যিক কোনো বল কাজ করে না। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা পাই

$$F = \frac{mv - mu}{t}$$

এ সমীরণটি থেকে আমরা ভরবেগের পরিবর্তনকে নিম্নরূপে প্রকাশ করতে পারি–

$$Ft = mv - mu \qquad (3.4)$$

অর্থাৎ বল × সময় = ভরবেগের পরিবর্তন।

কিন্তু বল ও সময়ের গুণফলকে বলা হয় বলের ঘাত।

∴ বলের ঘাত = ভরবেগের পরিবর্তন

ধরা যাক m_1 ও m_2 ভরবিশিষ্ট দুইটি বস্তু A ও B যথাক্রমে u_1 এবং u_2 বেগ নিয়ে একই সরল রেখা বরাবর চলছে। A এর বেগ B এর বেগের চেয়ে বেশি হলে কোনো এক সময় A বস্তুটি B বস্তুটিকে ধাক্কা দিবে [চিত্র ৩.৯]।

B বস্তুর উপর A বস্তুর এ প্রযুক্ত বল হলো ক্রিয়া F_1, B বস্তুটিও A বস্তুটিকে F_2 বল প্রয়োগ করবে এই F_2 বল হলো প্রতিক্রিয়া। নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রানুসারে $F_2 = -F_1$

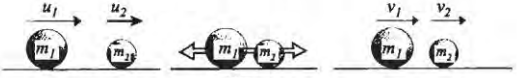

চিত্র : ৩.৯

সংঘর্ষের সময় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল একই সময়ব্যাপী কাজ করে। ধরা যাক, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সময়কাল t। সংঘর্ষের পর বস্তু দুইটি পরিবর্তিত বেগে একই সরলরেখায় চলতে থাকবে। ধরা যাক A ও B এর পরিবর্তিত বেগ যথাক্রমে v_1 ও v_2। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে A ও B বস্তু দুইটির ত্বরণ যথাক্রমে a_1 ও a_2 হলে,

$$F_1 = -F_2$$

বা, $m_1a_1 = -m_2a_2$

$$\text{বা,}\quad m_1\frac{v_1-u_1}{t}=-m_2\frac{v_2-u_2}{t}$$

$$\text{বা,}\quad m_1v_1-m_1u_1=-m_2v_2+m_2u_2$$

$$\text{বা,}\quad m_1u_1+m_2u_2=m_1v_1+m_2v_2$$

অতএব, A ও B বস্তু দুইটির সংঘর্ষের পূর্বের ও পরের ভরবেগের সমষ্টি সর্বদা সমান থাকে। এটিই ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র।

গাণিতিক উদাহরণ ৩.৩ : 20 kg ভরের একটি বস্তুর উপর 2000 N বল 0.1 s সময়ব্যাপী কাজ করে। বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন কত হবে?

আমরা জানি

ভরবেগের পরিবর্তন = বল × সময়

$mv-mu=Ft$

$= 2000\ \text{N}\times 0.1\ \text{s}$

$= 200\ \text{kg ms}^{-2}\ \text{s}$

$= 200\ \text{kg ms}^{-1}$

এখানে,

প্রযুক্ত বল, $F = 2000$ N

বলের ক্রিয়া কাল, $t = 0.1$ s

ভরবেগের পরিবর্তন, $mv - mu = ?$

উত্তর : ভরবেগের পরিবর্তন = 200 kg ms^{-1}

গাণিতিক উদাহরণ ৩.৪: একটি বন্দুক থেকে 500 ms^{-1} বেগে 10 g ভরের একটি গুলি ছোড়া হলো। বন্দুকের ভর 2 kg হলে বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ নির্ণয় কর।

ধরা যাক গুলির বেগের দিক অর্থাৎ সম্মুখ দিক ধনাত্মক ।

ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে আমরা জানি

$m_1u_1+m_2u_2=m_1v_1+m_2v_2$

বা $m_1\times 0\ \text{ms}^{-1}+m_2\ \text{kg}\times 0\ \text{ms}^{-1}=10^{-2}\ \text{kg}\times 500\ \text{ms}^{-1}+2\ \text{kg}\times v_2$

বা $\quad v_2=-\dfrac{5\ \text{kg ms}^{-1}}{2\text{kg}}$

$= -2.5\ \text{ms}^{-1}$

এখানে,

গুলির ভর, $m_1 = 10$ g

$= 10\times 10^{-3}$ kg

$= 10^{-2}$ kg

বন্দুকের ভর, $m_2 = 2$ kg

গুলির আদিবেগ, $u_1 = 0$ ms^{-1}

বন্দুকের আদিবেগ, $u_2 = 0$ ms^{-1}

গুলির শেষ বেগ, $v_1 = 500$ ms^{-1}

বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ, $v_2 = ?$

এখানে বন্দুকের বেগ ঋণাত্মক, অর্থাৎ বন্দুকটি পিছন দিকে গতিশীল হবে।

উত্তর : পশ্চাৎ বেগ = 2.5 ms^{-1}

৩.৯ নিরাপদ ভ্রমণ: গতি ও বল

Safe journey : force and motion

নিরাপদ ভ্রমণের জন্য গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য গাড়িতে ভ্রমণ করি। ভ্রমণের সময় আমরা বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহার করি। কখনো বাসে, কখনো ট্রেনে আবার কখনো বা ব্যক্তিগত যানবাহন ব্যবহার করি। এসব যানবাহনে ভ্রমণের সময় যানবাহনের গতি এবং বল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিরাপদ ভ্রমণের ক্ষেত্রে গাড়ির গতি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। গাড়ির গতি বা বেগ এমন হওয়া উচিত নয় যা

নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। দূরবর্তী গন্তব্যে ভ্রমণের জন্য প্রথমেই গন্তব্যস্থলে যাওয়ার রাস্তা এবং পরিবেশ সম্পর্কে আগে থেকে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

ভ্রমণ শুরু করার পূর্বেই গাড়ির চালককে তার গাড়ি ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ– গাড়ির টায়ার ও ব্রেক সঠিক আছে কিনা, গাড়ির ইঞ্জিন, ব্যবহৃত ব্যাটারি, সামনের এবং পেছনের বাতিসমূহ, গাড়ির ওয়াইপার এবং দুইপাশের সংকেত দেওয়ার বাতিগুলো সঠিক এবং ভালোভাবে কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া গাড়িতে ব্যবহৃত দর্পণগুলো সঠিকভাবে উপযোজন করে নিতে হবে।

গাড়ি চালনার সময় প্রথমেই ড্রাইভার এবং আরোহীদের সিট বেল্ট বেঁধে নেওয়া উচিত। দেখা যায় যে, অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনা খুব দ্রুত গাড়ি চালানোর জন্য ঘটে থাকে। তাই গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে চালককে সচেষ্ট থাকতে হবে। বেগ বৃদ্ধির ফলে ভরবেগ বেশি হয়। যেমন– গাড়ির বেগ দ্বিগুণ হলে এর ভরবেগ পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ হয়। বেগ তিনগুণ হলে এর ভরবেগ তিনগুণ হয়। ফলে গাড়ির বেগ কমানো বা নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়ে এবং ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে।

গাড়ির চালক এমন যানবাহন চালাবেন, যেটি চালানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। হঠাৎ করে নতুন কোনো যানবাহন চালানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। দেখা যায় যে, তরুণরা আবেগের বশে নতুন গাড়ি চালাবার চেষ্টা করে।এটি মোটেও উচিত নয়। গাড়ি চালানোর সময় যখনই বিপরীত দিক থেকে কোনো গাড়ি আসতে দেখা যাবে তখনই গাড়ির গতি কমিয়ে ফেলতে হবে। ট্রাফিক সাইন এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলা গাড়ি চালকের নাগরিক দায়িত্ব। গাড়ি চালনার সময় চালককে তাঁর গাড়ি চালনার দিকে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করতে হবে।

দলীয়কাজ : নিরাপদ যানবাহন চালনা কার্যক্রমের উপর একটি পোস্টার অংকন।

৩.১০ ঘর্ষণ ও ঘর্ষণ বল

Friction and force of friction

দৈনন্দিন জীবনে আমরা ঘর্ষণের সঙ্গে নানাভাবে পরিচিত। নিউটনের গতির প্রথম সূত্র থেকে আমরা জানি যে, কোনো বস্তুর উপর বল ক্রিয়া না করলে, হয় বস্তুটি স্থির থাকবে, না হয় বস্তুটি সমবেগে সরলপথে চলতে থাকবে। বাস্তবে এমনটি ঘটে কি? তুমি একটি মার্বেল নাও এবং একে মেঝেতে গড়িয়ে দাও। মার্বেলটিকে তুমি যখন গড়িয়ে দাও তখন এর উপর তুমি বল প্রয়োগ কর। যার ফলে মার্বেলটি মাটির উপর দিয়ে গতিশীল হয়। নিউটনের প্রথম সূত্রানুযায়ী মার্বেলটি সমবেগে গতিশীল থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, মার্বেলটি খানিকটা দূরত্ব অতিক্রম করার পর থেমে যায়। মেঝের ঘর্ষণের জন্যই এমনটি ঘটে। মার্বেলটি যখন মেঝের উপর গতিশীল থাকে, তখন মার্বেল ও মেঝের পারস্পরিক ঘর্ষণের ফলে একটি ঘর্ষণ বলের উৎপত্তি হয়। এ বল গতির বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে এবং গতিকে বাধাগ্রস্ত করে। যদি মেঝের ঘর্ষণ না থাকত তাহলে মার্বেলটি একই বেগ নিয়ে অবিরাম গতিতে চলতে থাকত।

একটি বস্তু যখন অন্য একটি বস্তুর সংস্পর্শে থেকে একের উপর দিয়ে অপরটি চলতে চেষ্টা করে বা চলতে থাকে তখন বস্তুদ্বয়ের স্পর্শতলে গতির বিরুদ্ধে একটি বাধার উৎপত্তি হয়, এ বাধাকে ঘর্ষণ বলে। আর এই বাধাদানকারী বলকে ঘর্ষণ বল বলা হয়।

ঘর্ষণ বল সর্বদা গতির বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে। ঘর্ষণ সবসময় গতিকে বাধা দেয়।

ঘর্ষণের উৎপত্তি

যখন একটি বস্তুর তল অপর বস্তুর তলের উপর দিয়ে গতিশীল হয়, তখন প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তুর উপর ঘর্ষণ বল প্রয়োগ করে। এখন প্রশ্ন আসে ঘর্ষণ কেন হয়? ঘর্ষণ হলো যেকোনো দুইটি তলের অনিয়মিত প্রকৃতির ফল। প্রত্যেক বস্তুরই তল আছে। আবার তল মসৃণ অথবা অমসৃণ দুই হতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে কোনো বস্তুর তলকে মসৃণ বলে মনে হলেও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে এর উপর অনেক উঁচু নিচু খাঁজ লক্ষ করা যায় [চিত্র ৩.১০]। যখন একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুর উপর দিয়ে গতিশীল হয়, তখন উভয় বস্তুর স্পর্শতলের এ খাঁজগুলো একটির ভিতর আরেকটি ঢুকে যায় অর্থাৎ খাঁজগুলো পরস্পর আটকে যায়। যার ফলে একটি তলের উপর দিয়ে অপর তলের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

কোনো তলের উঁচু নিচু খাঁজ যতবেশি এবং গভীর হবে অর্থাৎ তল যত বেশি অমসৃণ হবে, এক তলের উপর দিয়ে অন্য তলের গতি তত বেশি বাধাগ্রস্ত হবে। ফলে ঘর্ষণ বলের মানও বেড়ে যাবে। স্পর্শতলের এই বাধাকে অতিক্রম করতে পারলে তবেই বস্তুটি গতিশীল থাকে। ঘর্ষণের ফলে বস্তুর গতি হ্রাস পায় এবং অবশেষে থেমে যায়।

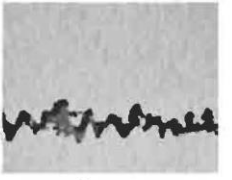

চিত্র : ৩.১০

ঘর্ষণের প্রকারভেদ :

ঘর্ষণ সাধারণত চার প্রকারের হয়–

১। স্থিতি ঘর্ষণ (Static friction)

২। পিছলানো ঘর্ষণ (Sliding friction)

৩। আবর্ত ঘর্ষণ (Rolling friction)

৪। প্রবাহী ঘর্ষণ (Fluid friction)

স্থিতি ঘর্ষণ

দুইটি তলের একটি অপরটির সাপেক্ষে গতিশীল না হলে এদের মধ্যে যে ঘর্ষণ সৃষ্টি হয় তা হলো স্থিতি ঘর্ষণ।

অর্থাৎ যখন একটি বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু এ বল বস্তুর গতি সৃষ্টি করতে পারে না তখন স্থিতি ঘর্ষণ কাজ করে। আবার মেঝের উপর অবস্থিত একটি ভারী বস্তুকে টানার পরও গতিশীল না হলে যে ঘর্ষণ বল উৎপন্ন হয় তা হলো স্থিতি ঘর্ষণ বল। অর্থাৎ প্রযুক্ত বলের বিপরীতে স্থিতি ঘর্ষণ বল উৎপন্ন হয় এবং গতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এ বল কাজ করে।

দুইটি স্থির বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থাকা অবস্থায় একটিকে অপরটির উপর দিয়ে গতিশীল করার চেষ্টা করা হলে এদের মধ্যে আপেক্ষিক গতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত যে ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করে তাকে স্থিতি ঘর্ষণ বলে।

পিছলানো ঘর্ষণ

যখন একটি কস্তু অন্য একটি কস্তুর তথা তলের উপর দিয়ে পিছলিয়ে (Slide) বা ঘেষে চলতে চেষ্টা করে বা চলে তখন যে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় তাকে পিছলানো ঘর্ষণ বলে।

পিচ্ছিল রাস্তায় চলার সময় অনেক সময় আমরা পড়ে যাই এবং পিছলিয়ে অনেকটা দূরত্ব অতিক্রম করি। দ্রুতবেগে গতিশীল কোনো গাড়িতে হার্ড ব্রেক কষলে গাড়িটি না থেমে পিছলিয়ে খানিকটা দূরত্ব অগ্রসর হয়। এগুলো পিছলানো ঘর্ষণের উদাহরণ।

আবর্ত ঘর্ষণ

যখন একটি কস্তু অপর একটি তলের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে তখন গতির বিরুদ্ধে যে ঘর্ষণ ক্রিয়া করে তাকে আবর্ত ঘর্ষণ বল বলে।

সাইকেলের চাকার গতি, মার্বেলের গতি হলো আবর্ত ঘর্ষণের উদাহরণ। ভ্রমণের সময় মালামাল পরিবহনের জন্য আমরা চাকা লাগানো লাগেজ ব্যবহার করি। যদি লাগেজে চাকা লাগানো না থাকত তখন এটিকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পিছলিয়ে টেনে নিতে বেশ কষ্ট হতো। কিন্তু চাকা লাগানোর ফলে লাগেজ টেনে নেওয়া বেশ সহজতর হয়। অর্থাৎ আবর্ত ঘর্ষণ বল পিছলানো ঘর্ষণের তুলনায় কম।

প্রবাহী ঘর্ষণ

যখন কোনো কস্তু যেকোনো প্রবাহী পদার্থ যেমন– তরল বা বায়বীয় পদার্থের মধ্যে গতিশীল থাকে তখন যে ঘর্ষণ ক্রিয়া করে তাকে প্রবাহী ঘর্ষণ বলে।

যখন পুকুরে সাঁতার কাটা হয় তখন পুকুরের পানির মধ্য দিয়ে একটি বাধাকে অতিক্রম করতে হয়। আর এ বাধাই হলো প্রবাহী ঘর্ষণ। প্যারাসুট বায়ুর বাধাকে কাজে লাগিয়ে কাজ করে। এখানে বায়ুর বাধা হলো এক ধরনের ঘর্ষণ বল যা পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের বিপরীতে ক্রিয়া করে। খোলা অবস্থায় প্যারাসুটের বাহিরের তলের ক্ষেত্রফল অনেক বেশি হওয়ায় বায়ুর বাধার পরিমাণও বেশি হয়, যার ফলে আরোহীর পতনের গতি অনেক হ্রাস পায়। ফলে আরোহী ধীরে ধীরে মাটিতে নিরাপদে নেমে আসে।

৩.১১ গতির উপর ঘর্ষণের প্রভাব
Effect of friction on motion

কোনো কস্তুর গতির উপর ঘর্ষণের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ঘর্ষণ হলো এক ধরনের বাধাদানকারী বল, যা কস্তুর গতিকে মন্থর করে। ঘর্ষণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক সমস্যা সৃষ্টি করলেও চলাচল ও যানবাহন চালনার জন্য ঘর্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ অনুচ্ছেদে টায়ারের পৃষ্ঠ, রাস্তার মসৃণতা এবং গতি নিয়ন্ত্রণে ঘর্ষণের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

চিত্র : ৩.১১

টায়ারের পৃষ্ঠ

গাড়ির টায়ার এবং রাস্তার মধ্যবর্তী ঘর্ষণ আছে বলেই গাড়ি চালনা সম্ভব হয়েছে। টায়ার এবং রাস্তার মধ্যবর্তী এ ঘর্ষণ বলের মান নির্ভর করে টায়ারের পৃষ্ঠ এবং রাস্তার তলের বাহ্যিক অবস্থার উপর। এটি গাড়ির ওজনের উপরও নির্ভর করে। গাড়ির টায়ারে রাবারের উপর বিভিন্ন নকশায় দাঁত বা খাঁজ

কাটা থাকে [চিত্র ৩.১১]। এ খাঁজগুলো থাকার ফলে টায়ারের পৃষ্ঠ উঁচু নিচু হয়। টায়ার যখন নতুন থাকে তখন এই উঁচু নিচু খাঁজগুলো সুস্পষ্ট থাকে বিধায় রাস্তা ও টায়ারের মধ্যবর্তী ঘর্ষণ বল সর্বোচ্চ হয়। অন্যদিকে টায়ার যখন পুরনো হয়ে যায় তখন এর খাঁজগুলো মিলিয়ে যায় এবং টায়ারের পৃষ্ঠ সমতল হয়ে পড়ে। এর ফলে রাস্তা ও টায়ারের ঘর্ষণ বল অনেকটা কমে যায়। এর ফলে কী অসুবিধা হতে পারে বল।

রাস্তার মসৃণতা

বস্তুর গতির উপর রাস্তার মসৃণতার প্রভাব অনেক বেশি। রাস্তা মসৃণ হলে রাস্তায় যানবাহন চলাচল সহজতর হয় এবং ভ্রমণ আরামদায়ক হয়। রাস্তা যত বেশি মসৃণ হবে বাধাদানকারী ঘর্ষণ বলের মানও তত কম হবে। গাড়ির টায়ার এবং রাস্তার মধ্যবর্তী ঘর্ষণ বলের মান টায়ারের এবং একই সাথে রাস্তার মসৃণতার উপর নির্ভর করে। ঘর্ষণ বলের পরিমাণ অনেক কমে গেলে নানা ধরনের সমস্যারও সৃষ্টি হয়। তাই রাস্তাকে খুব বেশি মসৃণ করাও ঠিক নয়। রাস্তা বেশি মসৃণ হলে ব্রেক প্রয়োগ করা সত্ত্বেও গাড়িকে সুনির্দিষ্ট স্থানে থামানো সম্ভব হয়ে উঠে না। গাড়ির গতির জন্য ঘর্ষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তা বেশি মসৃণ হলে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি হয় না। রাস্তা বেশি মসৃণ হলে ঘর্ষণ বলের মান অত্যধিক কমে যায়, ফলে গাড়ি সামনের দিকে অগ্রসর হয় না। তাই রাস্তার মসৃণতা এমন হবে যাতে করে রাস্তা প্রয়োজনীয় ঘর্ষণ বলের যোগান দেয়।

গতি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্রেকিং বল

যানবাহন চলাচলের সময় প্রয়োজন অনুযায়ী যানবাহনের গতিকে বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে হয়। অর্থাৎ যানবাহনের গতিকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন পড়ে।

ব্রেক হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা যা ঘর্ষণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে গাড়ির গতি তথা চাকার ঘূর্ণনকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করে। এর মাধ্যমে যানবাহনকে নির্দিষ্ট স্থানে থামানো সম্ভব হয়। যখন গাড়ির চালক ব্রেক প্রয়োগ করেন, তখন এসবেস্টসের তৈরি সু বা প্যাড চাকায় অবস্থিত ধাতব চাকতিকে ধাক্কা দেয়। প্যাড ও চাকতির মধ্যবর্তী ঘর্ষণ চাকার গতিকে কমিয়ে দেয়। ফলে গাড়ির বেগ হ্রাস পায়।

৩.১২ ঘর্ষণের হ্রাস বৃদ্ধি

Increase and decrease of friction

ঘর্ষণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। প্রয়োজনে ঘর্ষণকে বৃদ্ধি করা যায়, আবার প্রয়োজনে ঘর্ষণকে হ্রাসও করা যায়। এ অনুচ্ছেদে ঘর্ষণকে কীভাবে হ্রাস ও বৃদ্ধি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ঘর্ষণের হ্রাস :

তলকে মসৃণ করা

ঘর্ষণের ফলে একটি বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরাতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়। ধর তুমি একটি ভারী বক্সকে মেঝের উপর দিয়ে সরাতে চাও। যদি স্পর্শতলের ঘর্ষণের পরিমাণ খুব বেশি হয় তবে বক্সটিকে সরাতে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। তলকে মসৃণ করার মাধ্যমে এ ঘর্ষণকে কমানো যেতে পারে।

চাকার ব্যবহার

বাস, ট্রাকসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে চাকা লাগানো থাকে। চাকা হলো একটি সুকৌশল আবিষ্কার। চাকার বৃত্তাকার আকার ঘর্ষণ বলকে ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনে। চাকা না থাকলে এ সকল যন্ত্রপাতিকে চালানো সম্ভব হতো কি? সুটকেসে চাকা লাগানোর ফলে ঘর্ষণের মান কমে যায় এবং এটি টানা সহজতর হয়। চাকা লাগানোর ফলে আবর্ত ঘর্ষণের মান পিছলানো ঘর্ষণের তুলনায় অনেক কমে যায়।

পিচ্ছিলকারী পদার্থের ব্যবহার

তেল, মবিল এবং গ্রিজ জাতীয় পদার্থকে সংক্ষেপে লুব্রিকেন্ট বা পিচ্ছিলকারী পদার্থ বলে। দুইটি তলের মধ্যবর্তী স্থানে যখন এ ধরনের লুব্রিকেন্ট ব্যবহার করা হয় তখন ঘর্ষণের পরিমাণ অনেকাংশে কমে যায়। কোনো ইঞ্জিনের গতিশীল যন্ত্রাংশের মধ্যবর্তী স্থানে তাই লুব্রিকেন্ট ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বাড়িতে সেলাই মেশিনে, তালায় বা কব্জাতে আমরা তেল ব্যবহার করি।

বল-বেয়ারিং -এর ব্যবহার

চাকা আবিষ্কারের অনুরূপ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো বল-বেয়ারিং আবিষ্কার। বল-বেয়ারিং ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন তলের মধ্যবর্তী ঘর্ষণকে আরো কমানো সম্ভবপর হয়েছে। বল-বেয়ারিং হলো ক্ষুদ্র, মসৃণ ধাতব বল। এগুলো সাধারণত ইস্পাতের তৈরি। বল-বেয়ারিং কোনো যন্ত্রের গতিশীল অংশগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে বসানো থাকে। বল-বেয়ারিংগুলোর ঘূর্ণনের ফলে যন্ত্রের গতিশীল অংশগুলো পরস্পরের সঙ্গে সরাসরি ঘর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে না। অর্থাৎ তলগুলো একটি অপরটির উপর দিয়ে পিছলানোর পরিবর্তে গড়িয়ে যায় এবং ঘর্ষণ কমে যায়। গাড়ির চাকায়, সাইকেলে এবং বৈদ্যুতিক পাখায় বল-বেয়ারিং দেখতে পাওয়া যায় [চিত্র ৩.১২]।

চিত্র : ৩.১২

ঘর্ষণের বৃদ্ধি :

গাড়ি চালানো

রাস্তায় ঘর্ষণ না থাকলে গাড়ির টায়ার একস্থানে শুধু ঘুরপাক খেত। বৃষ্টির দিনে পিচ্ছিল অথবা কর্দমাক্ত রাস্তায় তোমরা হয়তো দেখেছো কেমন করে ট্রাক বা বাস একস্থানে আটকে থাকে। এর কারণ কী? এর কারণ হলো ঘর্ষণের পরিমাণ অনেক কমে যাওয়া। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী ঘর্ষণকে বাড়াতেও হয়। গাড়ির টায়ারকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন এটি চলার সময় রাস্তাকে ভালোভাবে আকড়ে ধরে রাখে এবং প্রয়োজনীয় ঘর্ষণ বল সৃষ্টি করে। এজন্য টায়ারের উপরের পৃষ্ঠে বিভিন্ন ধরনের দাঁত বা খাঁজ কাটা থাকে। বৃষ্টির দিনে বৃষ্টির পানি বা কাদা টায়ারের খাঁজের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং টায়ার পানি বা কাদাকে সজোরে বের করে দেয়। ফলে টায়ার রাস্তার তলকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরে। অর্থাৎ তলকে অমসৃণ করার মাধ্যমে ঘর্ষণকে বাড়ানো যেতে পারে।

জুতার নিচ খাঁজ কাটা

হাঁটার জন্য ঘর্ষণ খুবই প্রয়োজন। তোমরা দেখতে পাবে জুতার তলদেশ ঢেউ খেলানো বা খাঁজকাটা থাকে। জুতা পায়ে হাটার সময় জুতার খাঁজগুলো রাস্তাকে আকড়ে ধরে রাখে এবং প্রয়োজনীয় ঘর্ষণ বলের যোগান দেয়। জুতা ও রাস্তার মধ্যবর্তী ঘর্ষণ বৃদ্ধি করার জন্যই জুতার তলদেশ এরূপ হয়ে থাকে। জুতা পুরানো হয়ে গেলে খাঁজগুলো অনেকাংশে মিলিয়ে যায়। যার দরুন পিচ্ছিল বা ভেজা রাস্তায় জুতা পায়ে হাটা কষ্টকর হয়ে উঠে। লক্ষ করলে দেখবে আমাদের পায়ের তলাও সমতল নয়।

পাহাড়ে আরোহণ

যে সকল ব্যক্তি পাহাড়ে আরোহণ করেন তাদেরকে শিলাখন্ড বা পাহাড়ের তলকে ভালোভাবে পা এবং হাত দ্বারা আঁকড়ে ধরে রাখতে হয়। ধরে রাখার জন্য তারা চক পাউডার ব্যবহার করেন।

খেলোয়ারদের বুটের নিচে স্পাইক থাকে যাতে দৌড়ানোর সময় পড়ে না যায়।

৩.১৩ ঘর্ষণ : একটি প্রয়োজনীয় উপদ্রব
Friction: a necessary evil

ঘর্ষণের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ঘর্ষণকে একটি প্রয়োজনীয় উপদ্রব হিসেবে গণ্য করা হয়। এর কারণ কী? ঘর্ষণ ছাড়া আমরা কোনো কিছুই করতে পারিনা। যদি ঘর্ষণ না থাকত তা হলে বস্তুর কোনো গতিই আর শেষ হতো না, বিরামহীনভাবে চলতে থাকত। ঘর্ষণ আছে বলেই দেয়ালে একটি পেরেক স্থিরভাবে আটকে থাকে। ঘর্ষণের কারণেই পাকা দালান ও বাড়িঘর নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। ঘর্ষণের ফলে কাগজে পেনসিল বা কলম দিয়ে লিখতে পারছি। আমাদের জুতা এবং মাটির মধ্যে সৃষ্ট ঘর্ষণের কারণে আমরা হাঁটাচলা করতে পারি। ঘর্ষণের জন্য আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী গাড়ির গতির দিক পরিবর্তন করতে পারি। বাতাসের ঘর্ষণ আছে বলেই প্যারাসুট ব্যবহার করে বিমান থেকে নিরাপদে মাটিতে নামা সম্ভব হয়েছে। এতসব উপকারী দিক থাকা সত্ত্বেও ঘর্ষণের জন্য আমাদের কম ঝামেলা পোহাতে হয় না। অতিরিক্ত ঘর্ষণের কারণে যানবাহন সহজে চলতে পারে না। যন্ত্রপাতির গতিশীল অংশগুলোর মধ্যে ঘর্ষণের ফলে এরা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ছিঁড়ে যায়। যেকোনো ধরনের যানবাহন তা গাড়ি, নৌকা বা উড়োজাহাজ হোক না কেন, অতিরিক্ত ঘর্ষণকে অতিক্রম করতে অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ করতে হয়। যার দরুন ঘর্ষণের ফলে জ্বালানি শক্তির অপচয় হয়।

ঘর্ষণের ফলে শক্তির যে অপচয় হয় তা প্রধানত তাপশক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। ঘর্ষণের ফলে শুধু যে শক্তি তাপে পরিণত হয় তাই নয়, এর ফলে ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে উঠে। যার দরুন ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ঘর্ষণের ফলে জুতার সোল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ছিঁড়ে যায়। তাই আমাদের কাজকর্ম ও জীবন যাপন সহজ করার জন্য ঘর্ষণ যেমন প্রয়োজন, তেমনি অতিরিক্ত ঘর্ষণ অনেক ক্ষয়ক্ষতিরও কারণ। তাই প্রয়োজনীয় ঘর্ষণ সৃষ্টির জন্য ঘর্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কখনো আমরা ঘর্ষণকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমাতে চাই, আবার কখনো একে বাড়াতে চাই। অর্থাৎ ঘর্ষণকে যেমন পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায় না, তেমনিভাবে অনেক ক্ষেত্রে ঘর্ষণ আমাদের উপকারে আসে। এজন্য ঘর্ষণকে বলা হয় একটি প্রয়োজনীয় উপদ্রব।

প্রতিবেদন রচনা
আমাদের জীবনে ঘর্ষণের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে শিক্ষকের কাছে উপস্থাপন কর। শিক্ষক সবচেয়ে ভালো প্রতিবেদন নির্বাচন করে শ্রেণি কক্ষে উপস্থাপন করতে বলবেন।

অনুসন্ধান ৩.১ : কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল পরিমাপ

উদ্দেশ্য : সহজ পরীক্ষণের সাহায্যে বল পরিমাপ করা।

সূত্র : আমরা জানি, কোনো বস্তুর উপর F বল ক্রিয়া করলে এবং বল প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট ত্বরণ a হলে, $F = ma$ এখানে m বস্তুর ভর। অভিকর্ষ বলের ক্ষেত্রে বস্তুর ত্বরণ a কে g দ্বারা প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ অভিকর্ষ বল বা বস্তুর ওজন, $W = mg$ । এখানে বলের উদাহরণ হিসেবে আমরা বস্তুর ওজন পরিমাপ করব।

যন্ত্রপাতি ঃ স্প্রিং নিক্তি, বস্তু।

কাজের ধারা :

১. নিউটন এককে দাগাঙ্কিত একটি স্প্রিং নিক্তি দেয়ালে ঝুলিয়ে নাও।
২. এবার স্প্রিং –এর নিচের হুকে বস্তুটি ঝুলিয়ে দাও।
৩. স্প্রিং নিক্তির স্কেল থেকে বস্তুর ওজন তথা অভিকর্ষ বলের পাঠ রেকর্ড কর এবং হুকে বসাও।
৪. একইভাবে ৩ নং প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কয়েকবার বস্তুর ওজন নির্ণয় কর এবং হুকে স্থাপন কর।
৫. এবার বস্তুর উপর প্রযুক্ত গড় বল বা ওজন নির্ণয় কর।

ক্রমিক সংখ্যা	বস্তুর ওজন (নিউটন)	গড় ওজন নিউটন
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

এখন এই বস্তুর পরিবর্তে বিভিন্ন বস্তু নিয়ে কয়েকবার পরীক্ষণ সমাপ্ত কর এবং তাদের ওজন নির্ণয় কর।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

১। বস্তু যে অবস্থায় আছে চিরকাল সে অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা ধর্ম তাকে কী বলে?
(ক) বল (খ) ত্বরণ
(গ) জড়তা (ঘ) বেগ

২। বলের মাত্রা কোনটি?
(ক) MLT^{-2} (খ) MLT^{-1}
(গ) $ML^{-2}T^{-2}$ (ঘ) $M^{-1}LT^{-2}$

৩। ভরবেগের একক কোনটি?

(ক) kg m (খ) kg ms^{-1}

(গ) kg m^2s^{-1} (ঘ) kg ms^{-2}

৪। 5 kg ভরের একটি বস্তুর ওপর 50 N বল প্রয়োগ করা হলে, এর ত্বরণ হবে–

(ক) 12 ms^{-2} (খ) 8 ms^{-2}

(গ) 13 ms^{-2} (ঘ) 10 ms^{-2}

৫। 10 kg ভরের কোনো বস্তু 10 ms^{-1} বেগে গতিশীল হলে এর ভরবেগ হবে–

(ক) 10 kg ms^{-1} (খ) 120 kg ms^{-1}

(গ) 100 kg ms^{-1} (ঘ) 1 kg ms^{-1}

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ফারুক 4 kgভরের একটি বক্স একটি মেঝের উপর দিয়ে সমবলে টেনে নিল। বক্স ও মেঝের মধ্যকার ঘর্ষণ বলের মান হল 1.5 N। বক্সটিকে টেনে নেওয়ায় এর ত্বরণ হল 0.8 ms^{-2}। এরপর বক্সটিকে ঘর্ষণবিহীন মেঝেতে একই বল প্রয়োগ করে টানা হলো।

ক) সাম্য বল কাকে বলে?

খ) ঘর্ষণ বল কেন উৎপন্ন হয়?

গ) প্রথম ক্ষেত্রে বক্সটির উপর প্রযুক্ত বলের মান নির্ণয় কর।

ঘ) ঘর্ষণযুক্ত ও ঘর্ষণবিহীন মেঝেতে ত্বরণের কীরূপ পরিবর্তন হবে? গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

গ. সাধারণ প্রশ্ন

১। জড়তা কাকে বলে? জড়তা কত প্রকার?

২। বল কাকে বলে?

৩। কোনো স্থির বস্তুর জড়তা কী দ্বারা পরিমাপ করা হয়?

৪। সাম্য বল ও অসাম্য বল বলতে কী বুঝ ?

৫। কোনো বস্তুর ভরবেগ কাকে বলে?

৬। দেখাও যে, বল = ভর × ত্বরণ।

৭। ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি বলতে কী বুঝ?

৮। ঘর্ষণ কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার ঘর্ষণের নাম লিখ।

৯। ঘর্ষণ একটি প্রয়োজনীয় উপদ্রব– এর স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

WORK, POWER AND ENERGY

[আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কোনো কিছু করাকে কাজ বলা হলেও পদার্থবিজ্ঞানে কাজ দ্বারা একটি সুনির্দিষ্ট ধারণাকে বুঝায়। এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা সেই ধারণাকে উপস্থাপিত করব। বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শক্তি। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি শক্তি ছাড়া জগৎ অচল। বিভিন্নরূপে আমরা শক্তি পাই। গতিশীল বস্তুর জন্য গতিশক্তি, ভূপৃষ্ঠের খানিক উপরে বস্তুর অবস্থানের জন্য বিভব শক্তি, একটি সংকুচিত বা প্রসারিত স্প্রিং এর শক্তি, গরম বস্তুর তাপ শক্তি, আহিত বস্তুর তড়িৎ শক্তি ইত্যাদি। শক্তি ক্রমাগত একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হচ্ছে, যদিও মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তনীয় এবং সুনির্দিষ্ট। এই অধ্যায়ে আমরা শক্তির রূপান্তরের ঘটনা এবং বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলোর একটি শক্তির সংরক্ষণশীলতার নীতি নিয়ে আলোচনা করব।]

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১. কাজ ও শক্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।

২. কাজ, বল ও সরণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব।

৩. গতি শক্তি ও বিভব শক্তি ব্যাখ্যা করতে পারব এবং হিসাব করতে পারব।

৪. উৎসে শক্তির রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।

৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনায় শক্তির প্রধান উৎসসমূহের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারব।

৬. শক্তির রূপান্তর এবং শক্তির নিত্যতার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।

৭. শক্তির রূপান্তর ও এর ব্যবহার পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত করে ব্যাখ্যা করতে পারব।

৮. উন্নয়ন কার্যক্রমে শক্তির কার্যকর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।

৯. শক্তির কার্যকর ও নিরাপদ ব্যবহারে সচেতন হবো।

১০. ভর–শক্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।

১১. ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে পারব।

১২. কর্মদক্ষতা পরিমাপ করতে পারব।

৪.১ কাজ
Work

দৈনন্দিন জীবনে কোনো কিছু করাকে কাজ বললেও বিজ্ঞানে কিন্তু কোনো কিছু করা হলেই কাজ হয় না। বিজ্ঞানে কাজ একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। একজন দারোয়ান সারাক্ষণ বসে বসে একটি বাসা পাহারা দিলেন। তিনি বলবেন তিনি তার কাজ করেছেন। কোনো স্রোতের নদী বা খালে একটি নৌকা ভেসে যাচ্ছিল, করিম সাহেব সেটাকে টেনে ধরে রাখছেন। তিনি বলবেন তিনি কাজ করে নৌকাটিকে ঠেকিয়ে রেখেছেন নতুবা সেটি স্রোতের টানে কোথায় ভেসে যেত। দৈনন্দিন জীবনে এগুলোকে কাজের স্বীকৃতি দিলেও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কিন্তু এগুলো কাজ হয়নি। বরং দারোয়ান বসে বসে পাহারা না দিয়ে যদি হেঁটে হেঁটে পাহারা দিতেন কিংবা নৌকাটি যদি স্রোতের টানে ভেসে যেত তাহলে কিছু কাজ হতো। বিজ্ঞানে কাজের অর্থ দৈনন্দিন জীবনে কাজের অর্থের চেয়ে ভিন্নতর। আসলে বিজ্ঞানে কাজ হতে গেলে বল ও তার সাথে সরণ সংশ্লিষ্ট থাকতে হয়। কোনো বস্তুর উপর কোনো বল ক্রিয়া করে যদি বস্তুটির কিছু সরণ ঘটায় তাহলে কেবল কাজ হয়। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চারপাশে কাজের অনেক উদাহরণ দেখতে পাই। গরু মাঠে লাঙল টানছে, একজন শ্রমিক ঠেলা গাড়ি ঠেলছেন, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কেউ লৌহ গোলক নিক্ষেপ করছে ইত্যাদি।

নিচের উদাহরণগুলো বিবেচনা করা যাক :

(ক) রতন এক প্যাকেট বই হাত দিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

(খ) মিতা পদার্থবিজ্ঞান বইখানাকে ঠেলে টেবিলের উপর দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে।

(গ) নীরু একটি ভারী ব্যাগকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠাচ্ছে।

(ঘ) ছোট্ট রিমি জোরে দেয়ালকে ঠেলছে।

যেহেতু একটি বল দ্বারা কোনো বস্তু গতিশীল হলেই কেবল কাজ হয়, সুতরাং উল্লিখিত উদাহরণগুলোতে (খ) এবং (গ)–এর ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে; কিন্তু (ক) এবং (ঘ) এর ক্ষেত্রে কোনো কাজ হয়নি। আমরা কোনো বস্তুকে উপরে উঠাতে বা নিচে নামাতে বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিতে বল প্রয়োগ করতে পারি। আমরা বল প্রয়োগ করে কোনো বস্তুর আকার পরিবর্তন করতে পারি। এ সকল ক্ষেত্রে কাজ হয়।

যদি একজন নির্মাণ শ্রমিক দশখানা ইট নিয়ে কোনো ভবনের দোতলায় উঠেন, তবে তিনি একখানা ইট নিয়ে ঐ দোতলায় উঠলে যে কাজ করতেন তার চেয়ে বেশি কাজ করবেন, কেননা তাকে বেশি বল প্রয়োগ করতে হয়। তাকে আরো বেশি কাজ করতে হবে যদি তিনি ঐ দশখানা ইটই তিনতলায় উঠান। সুতরাং কাজের পরিমাণ নির্ভর করে প্রযুক্ত বলের উপর এবং দূরত্বের উপর। কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এবং বলের দিকে বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্বের গুণফল দ্বারা কাজ পরিমাপ করা হয়। সুতরাং,

কাজ = বল × বলের দিকে অতিক্রান্ত দূরত্ব

কোনো বস্তুর উপর F বল প্রয়োগে যদি বস্তুটি বলের দিকে s দূরত্ব অতিক্রম করে (চিত্র : ৪.১) তবে কৃত কাজ W হবে,

$$W = Fs \qquad (4.1)$$

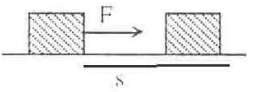

চিত্র : ৪.১

কাজের কোনো দিক নেই। কাজ একটি স্কেলার রাশি।

কাজের মাত্রা : কাজের মাত্রা হবে বল × সরণের মাত্রা

কাজ = বল × সরণ = ভর × ত্বরণ × সরণ

$$= \text{ভর} \times \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}^2} \times \text{সরণ}$$

$$= \text{ভর} \times \frac{\text{সরণ}^2}{\text{সময়}^2}$$

$$\therefore [W] = \frac{ML^2}{T^2} = ML^2T^{-2}$$

কাজের একক : বলের একককে দূরত্বের একক দিয়ে গুণ করলে কাজের একক পাওয়া যায়। যেহেতু বলের একক নিউটন (N) এবং দূরত্বের একক হলো মিটার (m), সুতরাং কাজের একক হবে নিউটন–মিটার (N m)। একে জুল বলা হয়। জুলকে J দিয়ে প্রকাশ করা হয়। কোনো বস্তুর উপর এক নিউটন বল প্রয়োগের ফলে যদি বস্তুটির বলের দিকে এক মিটার সরণ হয় তবে সম্পন্ন কাজের পরিমাণকে এক জুল বলে।

$1\ \text{J} = 1\ \text{N m}$

যদি বল প্রয়োগের ফলে বস্তু বলের দিকে সরে যায় তাহলে সেই কাজকে বলের দ্বারা কাজ বলে।

একটি ডাস্টার টেবিলের উপর থেকে মেঝেতে ফেলে দিলে ডাস্টারটি অভিকর্ষ বলের প্রভাবে নিচের দিকে পড়বে। এক্ষেত্রে অভিকর্ষ দ্বারা কাজ হয়েছে।

যদি বল প্রয়োগের ফলে বস্তু বলের বিপরীত দিকে সরে যায় তাহলে সেই কাজকে বলের বিরুদ্ধে কাজ বলে।

একটি ডাস্টার যদি মেঝে থেকে টেবিলের উপর উঠানো হয় তাহলে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে অভিকর্ষ বল যে দিকে ক্রিয়া করে সরণ তার বিপরীত দিকে হয়।

গাণিতিক উদাহরণ ৪.১ : 70 kg ভরের এক ব্যক্তি 200 m উঁচু পাহাড়ে আরোহণ করলে তিনি কত কাজ করবেন?

আমরা জানি,
$W = Fs$
$= 686\ \text{N} \times 200\ \text{m}$
$= 1.372 \times 10^5\ \text{J}$
উত্তর : $1.372 \times 10^5\ \text{J}$

এখানে,
ব্যক্তির ভর, $m = 70\ \text{kg}$
বল, $F =$ ব্যক্তির ওজন $= mg$
$= 70\ \text{kg} \times 9.8\ \text{m s}^{-2}$
$= 686\ \text{N}$
সরণ, $s = 200\ \text{m}$
কাজ, $W = ?$

৪.২ শক্তি
Energy

শক্তি ছাড়া কোনো কিছু চলতে বা কাজ করতে পারে না। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। প্রতিদিন আমরা যে কাজ করি তা নির্ভর করে আমাদের কতটুকু শক্তি আছে তার উপর। আমরা যে খাবার খাই তা থেকে এ শক্তি পাই। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য শক্তি লাগে। কোনো যন্ত্রের কাজ করার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো যন্ত্র বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আবার কোনোটা জ্বালানি পুড়িয়ে শক্তি পায়। জ্বালানির মধ্যে শক্তি সঞ্চিত থাকে।

শক্তি বলতে আমরা কী বুঝি? শক্তি বলতে কোনো বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকে বুঝে থাকি। যে বস্তু কাজ করতে সমর্থ তার মধ্যেই শক্তি থাকে, যে বস্তু কাজ করতে সমর্থ না তার মধ্যে কোনো শক্তি থাকে না।

আমরা যখন বলি কোনো বস্তুর মধ্যে শক্তি নিহিত আছে, তখন আমরা বুঝি বস্তুটি অন্য কিছুর উপর বল প্রয়োগ করতে পারে এবং তার উপর কাজ সম্পাদন করতে পারে। আবার আমরা যখন কোনো বস্তুর উপর কাজ করে থাকি, তখন আমরা তার উপর কাজের সমপরিমাণ শক্তি যোগ করে থাকি।

কোনো বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যই হচ্ছে শক্তি। কাজ করা মানে শক্তিকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করা। এর অর্থ হচ্ছে বস্তুটি সর্বমোট যে পরিমাণ কাজ করতে পারে তাই হচ্ছে শক্তি। যেহেতু কোনো বস্তুর শক্তির পরিমাপ করা হয় তার দ্বারা সম্পন্ন কাজের পরিমাণ থেকে, সুতরাং শক্তি ও কাজের পরিমাণ অভিন্ন।

অতএব, কৃত কাজ = ব্যয়িত শক্তি

শক্তির কোনো দিক নেই। কাজেই শক্তি স্কেলার রাশি।

শক্তির একক ও কাজের একক একই এবং তা হলো জুল (J)।

শক্তির বিভিন্ন রূপ : বিভিন্ন প্রকার কাজ করার জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের শক্তির প্রয়োজন হয়। যেমন পানি গরম করতে হলে তাপ শক্তির প্রয়োজন হয়। একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব থেকে আমরা আলো শক্তি পাই। আমরা যে সংগীত শুনি তার মধ্যে শব্দ শক্তি নিহিত আছে। কোনো বস্তুকে আমাদের সরাতে বা উপরে উঠাতে পেশি শক্তির প্রয়োজন হয়। কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রকে চালাতে হলে বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয়। তড়িৎ কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা রাসায়নিক শক্তি পাই। এক টুকরা কাগজ বায়ু শক্তির কারণে উড়ে যায়। যখন নিউক্লিয়াসসমূহ জোড়া লাগে বা ভাঙে তখন নিউক্লীয় শক্তি নির্গত হয়।

শক্তি আছে বলেই জগৎ গতিশীল। শক্তি না থাকলে জগৎ অচল হয়ে পড়বে। আলো শক্তি আছে বলেই আমরা দেখতে পাই, শব্দ শক্তি আছে বলেই আমরা শুনতে পাই। যান্ত্রিক শক্তির বদৌলতে আমরা চলাফেরা করতে পারি। বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে পাখা ঘুরছে, কলকারখানা চলছে। এ মহাবিশ্বে শক্তি নানারূপে বিরাজ করছে। মোটামুটিভাবে আমরা শক্তির নিম্নোক্ত রূপগুলো পর্যবেক্ষণ করি। যথা– যান্ত্রিক শক্তি, তাপ শক্তি, শব্দ শক্তি, আলোক শক্তি, চৌম্বক শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, রাসায়নিক শক্তি, নিউক্লীয় শক্তি এবং সৌর শক্তি।

শক্তির সবচেয়ে সাধারণরূপ হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি। কোনো বস্তুর অবস্থান বা গতির কারণে তার মধ্যে যে শক্তি নিহিত থাকে তাকে যান্ত্রিক শক্তি বলে। এই অনুচ্ছেদে আমরা যান্ত্রিক শক্তির দুইটি ভাগ– গতির কারণে যে শক্তি তা গতিশক্তি এবং অবস্থানের কারণে যে শক্তি তা বিভব শক্তি এগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

গতিশক্তি : আমরা ক্রিকেট খেলায় দেখতে পাই অনেক সময় ক্রিকেট বল স্টাম্পকে আঘাত করে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কোনো কাচের জানালায় শক্ত কিছু আঘাত করলে কাচ ভেঙে যায়। ঢিল ছুঁড়ে আম বা বরই পাড়া যায়। এ উদাহরণগুলো থেকে দেখা যায় যে, গতিশীল বস্তুর মধ্যে শক্তি থাকে। কোনো গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে তাকে গতিশক্তি বলে।

> **নিজে কর :** তোমার সামনের টেবিলের বা ডেস্কের উপর একটি কলম রাখ। কলমের সামনে একটি হালকা বস্তু রাখ। কলমটিকে ঐ বস্তুর দিকে হাত দিয়ে টোকা দাও।

বস্তুটি জায়গা থেকে সরে গেল কেন? টোকার ফলে কলমটি গতিশীল হলো। এতে তার মধ্যে কাজ করার সামর্থ্য তথা গতিশক্তি জন্মাল। সে জন্য বস্তুকে সরাতে পারল।

কোনো স্থির বস্তুতে বেগের সঞ্চার করা আর গতিশীল বস্তুর বেগ বৃদ্ধি করার অর্থ হচ্ছে বস্তুটিতে ত্বরণ সৃষ্টি করা। আর এ জন্য বল প্রয়োগ করতে হবে। ফলে বস্তুর উপর কাজ করা হবে। এতে বস্তুটি কাজ করার সামর্থ্য লাভ করবে এবং এ কাজ বস্তুতে গতিশক্তি হিসেবে জমা থাকবে। সে কারণে সকল সচল বস্তুই গতিশক্তির অধিকারী। বস্তু স্থিতিতে আসার পূর্বে এ পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারবে।

ধরা যাক, m ভরের একটি স্থির বস্তুর উপর F বল প্রয়োগ করায় বস্তুটি v বেগ প্রাপ্ত হলো। ধরা যাক, এ সময় বস্তুটি বলের দিকে s দূরত্ব অতিক্রম করে। বস্তুটিকে এই বেগ দিতে কৃত কাজই বস্তুর গতিশক্তি।

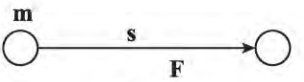

চিত্র ৪.২

∴ গতিশক্তি = কৃত কাজ

= বল × সরণ

$= F \times s$

বা, $E_k = mas \; [\because F = ma]$

কিন্তু, $v^2 = u^2 + 2as$

বা, $as = \frac{v^2}{2}$ [∵ আদি বেগ $u = 0$]

$\therefore E_k = \frac{1}{2}mv^2$ (4.2)

গতিশক্তি = $\frac{1}{2}\times$ ভর × (বেগ)^2

গতিশক্তি বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে। বস্তুর ভর যত বেশি হয় তার গতিশক্তিও তত বেশি হয়। একই বেগে তোমার দিকে একটি হালকা টেনিস বল আর একটি ভারী ক্রিকেট বল নিক্ষেপ করা হলে ক্রিকেট বল কর্তৃক আঘাত বেশি হবে।

গতিশক্তি বেগের উপরও নির্ভর করে। বস্তুর বেগ বেশি হলে তার গতিশক্তিও বেশি হবে। একটি ট্রাক কম বেগে কোনো দেয়ালকে আঘাত করলে যে ক্ষতি হবে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে ঐ ট্রাকটি যদি বেশি বেগে ঐ দেওয়ালকে আঘাত করে।

গাণিতিক উদাহরণ ৪.২ : 70 kg ভরের একজন দৌড়বিদের গতিশক্তি 1715 J হলে তার বেগ কত?

আমরা জানি

$E_k = \frac{1}{2}mv^2$

বা, $v^2 = \frac{2E_k}{m}$

$\therefore v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}}$

$= \sqrt{\frac{2\times 1715\ \text{J}}{70\ \text{kg}}}$

$= 7\ \text{m s}^{-1}$

উত্তর : $7\ \text{m s}^{-1}$

এখানে,
ভর, $m = 70$ kg
গতি শক্তি, $E_k = 1715$ J
বেগ, $v = ?$

বিভব শক্তি : ছাদের উপর থেকে এক খণ্ড পাথর বা ইঁট কোনো বস্তুর উপর পড়লে তাকে চ্যাপ্টা করে ফেলতে পারে বা ভেঙে ফেলতে পারে। পাথর বা ইঁট যখন ছাদের উপর স্থির ছিল তখন তার মধ্যে শক্তি জমা ছিল। পাথরটি যখন নিচে পড়ে তখন ঐ শক্তি কাজ করে। পাথরটির মধ্যে শক্তি নিহিত ছিল কেননা এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে ছিল।

একটি স্প্রিংকে টান টান করে এর দুই মাথা দুইটি বস্তুর সাথে আটকে ছেড়ে দিলে কী হবে? বস্তুদ্বয় ছুটে এসে পরস্পরের সাথে ধাক্কা খাবে। টান টান স্প্রিং যদিও স্থির অবস্থায় ছিল তথাপি তার মধ্যে শক্তি সঞ্চিত ছিল। স্প্রিংটি ছেড়ে দিলে এটি কাজ করতে পারে। টান টান স্প্রিংটে শক্তি নিহিত ছিল কেননা এটি বিকৃত অবস্থায় ছিল।

স্বাভাবিক অবস্থান থেকে পরিবর্তন করে কোনো বস্তুকে অন্য অবস্থানে বা স্বাভাবিক অবস্থা পরিবর্তন করে অন্য কোনো অবস্থায় আনলে বস্তু কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে তাকে বিভব শক্তি বলে।

সম্প্রসারিত কর্মকাণ্ড : একটি পুলি নিয়ে তার উপর একটি দড়ি পরিয়ে দাও। দড়ির এক প্রান্তে একটি ভারী বস্তু A এবং অপর প্রান্তে হালকা বস্তু B বাঁধ যেন A বস্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে এবং B বস্তু ভূপৃষ্ঠে থাকে (চিত্র : ৪.৩)। হাত ছেড়ে দাও।

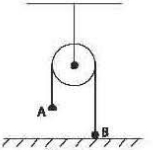

চিত্র : ৪.৩

কী দেখতে পেলে? A বস্তু নিচে নামছে আর B বস্তু উপরে উঠছে। A বস্তুটি তার স্বাভাবিক অবস্থান ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে থাকার কারণে তার ভেতর কাজ করার সামর্থ্য তথা বিভব শক্তি সঞ্চিত ছিল। এটি ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত ফিরে আসতে কাজ করতে পারে। অর্থাৎ B বস্তুকে উপরে উঠাতে পারে।

পরীক্ষণ : একটি স্প্রিং নিয়ে এর এক প্রান্ত একটি দৃঢ় অবলম্বনের সাথে আটকাও এবং অপর প্রান্তে একটি ব্লক সংযুক্ত কর। এগুলোকে একটি মসৃণ তলের উপর স্থাপন কর। এখন ব্লকটিতে বল প্রয়োগ করে স্প্রিংটিকে সংকুচিত কর এবং ব্লকটির সামনে অন্য একটি বস্তু রাখ (চিত্র : ৪.৪)। এখন হাত ছেড়ে দাও ।

বস্তুটি ছিটকে দূরে সরে গেল কেন? স্প্রিংটি তার আগের শিথিল অবস্থানে ফিরে আসার সময় কাজ করতে পারল – অন্য বস্তুকে সরাতে পারল। স্প্রিংটি এই যে তার স্বাভাবিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কাজ করার সামর্থ্য লাভ করল সেটি তার বিভব শক্তি। স্বাভাবিক অবস্থান বা অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে কোনো বস্তুকে অন্য কোনো অবস্থান বা অবস্থায় আনতে যদি কোনো বলের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করা হয় তখন বস্তুটি ঐ পরিমাণ কাজ করার সামর্থ্য লাভ করে অর্থাৎ শক্তি সঞ্চয় করে। এই কথাটি খাটে সংরক্ষণশীল বল যথা মহাকর্ষ বল, তড়িৎ বল, চৌম্বক বল, স্প্রিং বল ইত্যাদির প্রভাব বলয়ের মধ্যে। এই প্রভাব বলয়কে ঐ বলের বলক্ষেত্র বলা হয়। যেমন মহাকর্ষ ক্ষেত্র, তড়িৎ ক্ষেত্র ইত্যাদি। আমরা যখন ভূপৃষ্ঠ থেকে কোনো বস্তুকে উপরে তুলি তখন অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ করি। ফলে ঐ বস্তু কিছু বিভব শক্তি লাভ করে। বস্তুটি যদি ভূপৃষ্ঠে পড়ে তখন ঐ পরিমাণ কাজ করতে পারে।

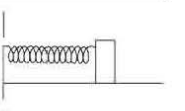
চিত্র : ৪.৪

m ভরের কোনো বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় (চিত্র : ৪.৫) উঠাতে কৃত কাজই হচ্ছে বস্তুতে সঞ্চিত বিভব শক্তির পরিমাণ। আর এ ক্ষেত্রে কৃত কাজ হচ্ছে বস্তুর উপর প্রযুক্ত অভিকর্ষ বল তথা বস্তুর ওজন এবং উচ্চতার গুণফলের সমান।

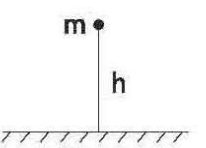

চিত্র : ৪.৫

$\therefore$ বিভব শক্তি = বস্তুর ওজন $\times$ উচ্চতা

$= mgh$

$$\therefore E_p = mgh \qquad (4.3)$$

অর্থাৎ বিভব শক্তি = বস্তুর ভর $\times$ অভিকর্ষজ ত্বরণ $\times$ উচ্চতা

বিভব শক্তির পরিমাণ ভূপৃষ্ঠ থেকে বস্তুর উচ্চতার উপর নির্ভর করে। উচ্চতা যত বেশি হবে, বিভব শক্তিও তত বেশি হবে। বিভব শক্তি বস্তুর ভরের উপরও নির্ভর করে। ভর যত বেশি হবে বিভব শক্তিও তত বেশি হবে।

কোনো বস্তুর মধ্যে বিভব শক্তি থাকলে এবং তাকে ব্যবহার করতে হলে এটিকে আগে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করে নিতে হবে। যেমন ছাদের উপর থাকা পাথর খন্ডটি ততক্ষণ বিপজ্জনক নয় যতক্ষণ না এর বিভব শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ এটি ছাদ থেকে পড়া শুরু করে।

গাণিতিক উদাহরণ ৪.৩ : একটি বস্তুর ভর 6 kg। একে ভূপৃষ্ঠ থেকে 20 m উচ্চতায় তুললে বিভব শক্তি কত হবে? $g = 9.8\ \text{ms}^{-2}$

আমরা জানি,

$E_p = mgh$

$= 6\ \text{kg} \times 9.8\ \text{m s}^{-2} \times 20\ \text{m}$

$= 1176\ \text{J}$

উত্তর : 1176 J

এখানে,

বস্তুর ভর, $m = 6\ \text{kg}$

উচ্চতা, $h = 20\ \text{m}$

$g = 9.8\ \text{m s}^{-2}$

বিভব শক্তি, $E_p = ?$

৪.৩ শক্তির প্রধান উৎস

Main sources of energy

যন্ত্রনির্ভর বর্তমান সভ্যতা শক্তি ছাড়া এক মুহূর্তও চলতে পারে না। শক্তির বিনিময়ে কাজ পাওয়া যায়। সকল জীবের বেঁচে থাকার জন্য শক্তির নিরবচ্ছিন্ন যোগান থাকতে হবে। জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের সাথে মানুষের শক্তির চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাড়তি শক্তির প্রয়োজনে মানুষকে নিত্যনতুন শক্তির উৎসের সন্ধান করতে হচ্ছে। সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার জন্য শক্তির যোগান অব্যাহত রাখতে হলে শক্তির উৎস সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। আমরা জানি সূর্যই প্রায় সকল শক্তির উৎস। এ ছাড়াও পরমাণুর অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াসের নিউক্লীয় শক্তি ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত গলিত উত্তপ্ত পদার্থ থেকে প্রাপ্ত শক্তিও শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পৃথিবীতে যত শক্তি আছে তার প্রায় সবটাই কোনো না কোনোভাবে সূর্য থেকে আসা বা সূর্য কিরণ ব্যবহৃত হয়েই তৈরি হয়েছে।

রাসায়নিক/জ্বালানি শক্তি

আদিমকালে মানুষ সকল কাজে পুরোপুরি নির্ভর করত তার পেশি শক্তির উপর। এরপর মানুষ পশুকে বশে আনল এবং পশু শক্তিকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে লাগল। পশু শক্তির সাহায্যে কৃষিকাজ, জিনিসপত্র বহন ইত্যাদি কাজ মানুষ করত। কাঠ ও গাছের পাতা পুড়িয়ে তাপ শক্তি সৃষ্টি, জলস্রোত ও বায়ুপ্রবাহ থেকে যন্ত্রশক্তি উৎপন্ন করা ছিল সভ্যতার প্রাথমিক স্তর। যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি শুরু হলো। শিল্প বিপ্লব ও বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার মানুষের ও পশুদের পেশি শক্তির উপর নির্ভরতা কমিয়ে দিল। বাষ্প শক্তির সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চালাতে থাকল। এ বাষ্প শক্তি উৎপন্ন করার জন্য জ্বালানি প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার জ্বালানিকেই তাই আমরা শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচনা করি।

শক্তির অতি পরিচিত উৎস হলো কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। ভূঅভ্যন্তরে কয়লা, তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় যা সরাসরি বা সামান্য পরিশোধিত করে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

কয়লা : শক্তির উৎসগুলোর মধ্যে কয়লার পরিচিতি সবচেয়ে বেশি। কয়লা একটি জৈব পদার্থ। পৃথিবীতে এক সময় অনেক গাছপালা ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও স্বাভাবিকভাবে গাছের পাতা বা কান্ড মাটির নিচে চাপা পড়ে এবং জমতে থাকে। গাছের পাতা ও কান্ড রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে কয়লায় রূপান্তরিত হয়। কয়লা পুড়িয়ে সরাসরি তাপ পাওয়া যায়। এটি একটি অতি পরিচিত জ্বালানি। তবে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও কয়লা থেকে বহু প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদিত হয়। এদের মধ্যে রয়েছে কোল গ্যাস, আলকাতরা, বেঞ্জিন, অ্যামোনিয়া, টলুয়িন প্রভৃতি। রান্না করতে ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালাতে কয়লা ব্যবহৃত হয়। আধুনিক কালে কয়লার প্রধান ব্যবহার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান উপাদান কয়লা।

কয়লা চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রধান সমস্যা হচ্ছে এটি সালফারের ধোঁয়া নির্গমণ করে। এই ধোঁয়া এসিড বৃষ্টির সৃষ্টি করে। এই এসিড যদিও খুব দুর্বল, কিন্তু তা পুকুর, হ্রদ ও খালে বিলে মাছ মেরে ফেলে, বন ধ্বংস করে এবং প্রাচীন পাথুরে খোদাই করা কাজ নষ্ট করে ফেলে।

খনিজ তেল : শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম। বর্তমান সভ্যতায় পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। গ্রামের কুঁড়েঘর থেকে শুরু করে আধুনিকতম পরিবহন ব্যবস্থা সর্বত্রই এর ব্যবহার রয়েছে। পেট্রোলিয়াম থেকে নিষ্কাশিত তেল পেট্রোল, পাকা রাস্তার উপর দেওয়া পিচ, কেরোসিন ও চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক সার পাওয়া যায়। পরিবহনের জ্বালানি হিসেবে পেট্রোলের জুড়ি নেই। পেট্রোলিয়াম থেকে আরো পাওয়া যায় নানান রকম কৃত্রিম বস্ত্র। এগুলো হলো টেরিলিন, পলিয়েস্টার, ক্যাশমিলন ইত্যাদি। এছাড়া পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি হয় নানা রকম প্রসাধনী। এতসব ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও এর মূল ব্যবহার জ্বালানি হিসেবে। পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রীর প্রধান ব্যবহার হলো তড়িৎ ও যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন। পেট্রোলিয়াম একটি ল্যাটিন শব্দ। এটি তৈরি হয়েছে পেট্রো ও অলিয়াম মিলে। ল্যাটিন ভাষায় পেট্রো শব্দের অর্থ পাথর এবং অলিয়াম শব্দের অর্থ তেল। সুতরাং পেট্রোলিয়াম হলো পাথরের তেল অর্থাৎ পাথরের মধ্যে সঞ্চিত তেল। টারশিয়ারি যুগে অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচ ছয় কোটি বছর আগে সমুদ্রের তলদেশে পাললিক শিলার স্তরে স্তরে গাছপালা ও সামুদ্রিক প্রাণী চাপা পড়ে যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে এরা রূপান্তরিত হয় খনিজ তেলে। আজকের স্থলভাগের অনেকাংশ প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমুদ্রের তলদেশে ছিল।

প্রাকৃতিক গ্যাস : প্রাকৃতিক গ্যাস শক্তির একটি পরিচিত উৎস। বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ব্যাপক। উন্নত দেশগুলোতেও প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার খুব বেশি। বিভিন্ন শিল্প কারখানায় এর ব্যবহার রয়েছে। এর ব্যবহার প্রধানত জ্বালানি হিসেবে। বাংলাদেশে রান্নার কাজে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। এছাড়াও ব্যবহার রয়েছে অনেক সার কারখানায়। গ্যাসের সাহায্যে তাপশক্তি উৎপাদিত হয় এবং তা থেকে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত হয় বিদ্যুৎ।

প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় ভূগর্ভ থেকে। সুগভীর কূপ খনন করে ভূগর্ভ থেকে এ গ্যাস উত্তোলন করা হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রচন্ড তাপ ও চাপ এ ধরনের গ্যাস সৃষ্টির মূল কারণ। পেট্রোলিয়াম কূপ থেকেও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন গ্যাস। এই সকল শক্তিকে জীবাশ্ম শক্তিও বলা হয়।

উপরে শক্তির যে তিনটি উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো মানুষের শক্তির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এগুলো খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। পৃথিবীর বর্তমান ভৌত অবস্থা যা তাতে করে এ সকল উৎস যেমন কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস আর নতুন করে সৃষ্টি হওয়ার নয় এদেরকে অনবায়নযোগ্য শক্তি বলা হয়। ফলে শক্তির বিকল্প উৎসের দিকে ঝুঁকছে মানুষ। এ সকল শক্তির বিপরীতে বিকল্প যে সকল উৎস ব্যবহারের দিকে মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে তার মধ্যে সৌরশক্তি, পানি প্রবাহ থেকে প্রাপ্ত শক্তি, জোয়ার-ভাটা শক্তি, ভূ-তাপীয় শক্তি, বায়ু শক্তি, বায়োমাস ইত্যাদি উৎসগুলো প্রধান। এ উৎসগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূর্যের উপর নির্ভরশীল। যতদিন পৃথিবী সূর্যের আলো পেতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ সকল উৎস থেকে শক্তির সরবরাহ পাওয়া সম্ভব হবে। তাই এই সকল উৎসকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলা হয়।

সৌরশক্তি : সূর্য থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকে বলে সৌরশক্তি। আমরা জানি সূর্য সকল শক্তির উৎস। পৃথিবীতে যত শক্তি আছে তার প্রায় সবই কোনোনা কোনোভাবে সূর্য থেকে আসা বা সূর্য কিরণ ব্যবহৃত হয়েই তৈরি হয়েছে। যেমন আধুনিক সভ্যতার ধারক জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস) আসলে বহুদিনের সঞ্চিত সৌরশক্তি।

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ সূর্য কিরণকে সরাসরি ব্যবহার করছে কোনো কিছু শুকানোর কাজে। বর্তমানে সূর্যের শক্তিকে সবসময় ব্যবহারের জন্য মানুষ নানান রকম উপায় অবলম্বন করছে। লেন্স বা দর্পণের সাহায্যে সূর্য রশ্মিকে অভিসারী করে আগুন জ্বালানো যায়। সূর্য কিরণকে ধাতব প্রতিফলকের সাহায্যে প্রতিফলিত করে তৈরি হয় সৌরচুল্লি। এ চুল্লিতে রান্না করা যায়।

> **করে দেখ :** 15 cm বা 20 cm ফোকাস দূরত্বের একটি অবতল দর্পণ ও এক টুকরা কাগজ নাও। দর্পণটিকে সূর্যের দিকে মুখ করে ধর। কাগজের টুকরাটি হাতে নিয়ে দর্পণের সাহায্যে কাগজের উপর সূর্যালোক কেন্দ্রীভূত কর। এভাবে কাগজের টুকরাটিতে আগুন না জ্বলা পর্যন্ত ধরে থাক।

সৌরশক্তিকে শীতের দেশে ঘরবাড়ি গরম করার কাজে ব্যবহার করা হয়। শস্য, মাছ, সবজি শুকানোর কাজে সৌরশক্তি ব্যবহৃত হয়। মাছ শুকিয়ে শুঁটকি তৈরি করে তা বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়। সৌরশক্তির আরো উদাহরণ হচ্ছে – সোলার ওয়াটার হিটার, সোলার কুকার ইত্যাদি।

আধুনিক কৌশল ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে সৌরকোষ। সৌরকোষের বৈশিষ্ট্য হলো এর উপর সূর্যের আলো পড়লে এ থেকে সরাসরি তড়িৎ পাওয়া যায়। সৌরকোষের নানা রকম ব্যবহার রয়েছে।

১। কৃত্রিম উপগ্রহে তড়িৎ শক্তি সরবরাহের জন্য এ কোষ ব্যবহৃত হয়। এ জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ বহুদিন ধরে তার কক্ষপথে ঘুরতে পারে।

২। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যেমন পকেট ক্যালকুলেটর, পকেট রেডিও, ইলেকট্রনিক ঘড়ি সৌরশক্তির সাহায্যে চালানো হচ্ছে।

৩। বর্তমানে আমাদের দেশেও সৌরশক্তির সাহায্যে অনেক গ্রামে, বাসা–বাড়ি বা অফিসে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো হচ্ছে।

সৌরশক্তি ব্যবহারের সুবিধা হলো এ শক্তি ব্যবহারে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা কম। এ শক্তি ব্যবহারে বিপদের আশঙ্কা নেই বললেই চলে। সৌরশক্তির সহসা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ শক্তির তাই প্রচলিত শক্তি উৎস জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা খুব বেশি।

জলবিদ্যুৎ (যান্ত্রিক শক্তির রূপান্তর)

পানি নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম উৎস। পানির স্রোত ও জোয়ার–ভাটাকে ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করা যায়। প্রবাহিত পানির স্রোতে বিভিন্ন ধরনের শক্তি আছে যেমন গতিশক্তি ও বিভব শক্তি। পানির প্রবাহ বা স্রোতকে কাজে লাগিয়ে যে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে বলা হয় জলবিদ্যুৎ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিভব শক্তি ব্যবহার করা হয়। প্রবাহিত পানির স্রোতকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি সহজ। পানির স্রোতের সাহায্যে একটি টার্বাইন ঘোরানো হয়। এই টার্বাইনের ঘূর্ণন থেকেই এখানে যান্ত্রিক শক্তি ও চৌম্বকশক্তির সমন্বয় ঘটানো হয়।

প্রবাহিত পানির স্রোত থেকে যান্ত্রিক শক্তি সংগ্রহ করে চৌম্বক শক্তির সমন্বয়ে তড়িৎ উৎপাদন করা হয় বলে এ

মডেল তৈরি : পড়ন্ত পানির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে টার্বাইন ঘুরিয়ে একটি ডায়নামো চালিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের একটি মডেল তৈরি কর।
চিত্র : (৪.৬)।

চিত্র : ৪.৬

ধরনের তড়িতের নাম জলবিদ্যুৎ। আমাদের দেশে কাপ্তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে পানির বিভব শক্তিকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

নদী বা সমুদ্রের পানির জোয়ার–ভাটার শক্তিকে ব্যবহারের প্রচেষ্টা মানুষ বহুদিন থেকে চালিয়ে যাচ্ছে। জোয়ার–ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন যন্ত্র চালনার ব্যাপারটি অনেকদিন আগেই উদ্ভাবিত হয়েছে।

ফ্রান্সে জোয়ার–ভাটার শক্তির সাহায্যে তড়িৎ শক্তি প্রকল্প সফলতার সাথে কাজ করছে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জোয়ার–ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তড়িৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

বায়ু শক্তি : পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে বায়ু প্রবাহিত হয়। বায়ু প্রবাহজনিত গতিশক্তিকে আমরা যান্ত্রিক বা তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি। শক্তি রূপান্তরের এরূপ যন্ত্রকে বায়ুকল বলে। বায়ু প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে প্রাচীনকালের মানুষেরা কুয়া থেকে পানি তোলা, জাহাজ চালানো ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করতো। নৌকায় পাল তুলে আজও বায়ু শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহার করে বায়ুকল কাজে লাগিয়ে তড়িৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

ভূ–তাপীয় শক্তি : ভূ–অভ্যন্তরের তাপকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ভূ–অভ্যন্তরের গভীরে তাপের পরিমাণ এত বেশি যে তা শীলাখন্ডকে গলিয়ে ফেলতে পারে। এ গলিত শীলাকে ম্যাগমা বলে। ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে কখনো কখনো এই ম্যাগমা উপরের দিকে উঠে আসে যা ভূপৃষ্ঠের খানিক নিচে জমা হয়। এ সকল জায়গা হট স্পট (Hot spot) নামে পরিচিত। ভূ–গর্ভস্থ পানি এ হট স্পটের সংস্পর্শে এসে বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্প ভূ–গর্ভে আটকা পড়ে যায়। হট স্পটের উপর গর্ত করে পাইপ ঢুকিয়ে উচ্চ চাপে এই বাষ্পকে বের করে আনা যায় যা দিয়ে টার্বাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। নিউজিল্যান্ডে এ রকম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে।

বায়োমাস শক্তি : সৌর শক্তির একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ যা সবুজ গাছপালা দ্বারা সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বায়োমাসরূপে গাছপালার বিভিন্ন অংশে মজুদ থাকে। বায়োমাস বলতে সেই সব জৈব পদার্থকে বুঝায় যাদেরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। মানুষসহ অনেক প্রাণী খাদ্য হিসেবে বায়োমাস গ্রহণ করে তাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে জীবনের কর্মকান্ড সচল রাখে। বায়োমাসকে শক্তির একটি বহুমুখী উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যায়। জৈব পদার্থসমূহ যাদেরকে বায়োমাস শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায় সেগুলো হচ্ছে গাছ–গাছালী, জ্বালানি কাঠ, কাঠের বর্জ্য, শস্য, ধানের তুষ ও কুড়া, লতা–পাতা, পশু পাখির মল, পৌর বর্জ্য ইত্যাদি। বায়োমাস প্রধানত কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত। নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম উৎস বায়োমাস।

বায়োমাস থেকে সহজে উৎপাদন করা যায় বায়োগ্যাস। এ গ্যাস আমরা প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসেবে রান্নার কাজে এমনকি বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজেও ব্যবহার করতে পারি। এর উৎপাদন পদ্ধতিও বেশ সহজ। একটি আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে গোবর ও পানির মিশ্রণ ১ ঃ ২ অনুপাতে রেখে পচানো হলে বায়োগ্যাস উৎপন্ন হয়। যা নলের সাহায্যে বেরিয়ে

আসে। এ গ্যাস রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায়। ৪/৫ জনের একটি পরিবারের রান্না ও বাতি জ্বালানোর গ্যাসের জন্য ২/৩ টি গরুর গোবরই যথেষ্ট।

নিউক্লীয় শক্তি : নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। যে নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় প্রাপ্ত শক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় সেই বিক্রিয়াকে বলা হয় নিউক্লীয় ফিশন। এতে ইউরেনিয়ামের সাথে নির্দিষ্ট শক্তির নিউট্রনের বিক্রিয়া ঘটনো হয়। নিউক্লীয় চুল্লীতে এই বিক্রিয়া ঘটানো হয়।

ভর–শক্তির সম্পর্ক : নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় সাধারণত পদার্থ তথা ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অবশ্য নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় মোট ভরের কেবল একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হলে যদি E পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়, তাহলে

$$E = mc^2$$

এখানে m হচ্ছে শক্তিতে রূপান্তরিত ভর এবং c হচ্ছে আলোর বেগ যা $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ এর সমান।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে একটি ফিশন বিক্রিয়ায় অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট শক্তির নিউট্রন যদি একটি ইউরেনিয়াম

নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে তাহলে প্রায়

$200 \text{ MeV} = 200 \times 10^6 \text{ eV} = 200 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 3.2 \times 10^{-11} \text{ J}$ শক্তি নির্গত

হয়। যেহেতু ফিশন বিক্রিয়া একটি শৃঙ্খল বিক্রিয়া, মুহূর্তের মধ্যে কোটি কোটি বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়।

হিসাব কর : 1 kg বস্তুকে যদি সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হতো, তাহলে কত কিলোওয়াট ঘন্টা শক্তি উৎপন্ন হতো? 1 কিলোওয়াট ঘন্টা (1kWh) = 3.6×10^6 J

এই বিক্রিয়ায় প্রাপ্ত শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে উচ্চ চাপের কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি হিসেবে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাম্প করে অন্য পাত্রে নেওয়া হয়। এই উত্তপ্ত গ্যাস একটি বিশেষ বাষ্প বয়লারের চারপার্শ্বে ঘুরে বয়লারের ভিতরের বাষ্পকে উত্তপ্ত করে যা টার্বাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় এক টন ইউরেনিয়াম থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তা দশ লক্ষ টন কয়লা পুড়িয়ে পাওয়া শক্তির সমান।

পরিবেশের উপর শক্তির রূপান্তরের প্রভাব : নিউক্লীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন সাশ্রয়ী হলেও নিউক্লীয় জ্বালানির বর্জ্য অতিমাত্রায় তেজস্ক্রিয় এবং এই বর্জ্যকে নিরাপদ পরিণত করতে হাজার হাজার বছর ধরে সংরক্ষণ করতে হয়। এছাড়া নিউক্লীয় চুল্লীতে উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপ তৈরি হয়। তাই একে এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি করতে হবে যেন তা সহ্য করতে পারে। কোনো দুর্ঘটনা যে কত মারাত্মক তা আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের (বর্তমানে ইউক্রেনের) চেরনোবিল এবং জাপানের ফুকুশিমা এর অভিজ্ঞতা থেকে জানি। তবে নিউক্লীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিবেশে গ্রিন হাউস গ্যাস কম উৎপন্ন হয়।

নবায়নযোগ্য শক্তির সামাজিক প্রভাব ও সুবিধা : আমাদের সামাজিক জীবনে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে। আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় প্রাকৃতিক শক্তি যেমন কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ অতি নগণ্য। তাই আমাদের শক্তির প্রয়োজন মেটাতে অমূল্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে খনিজ তেল, কয়লা আমদানি করতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে যে সকল নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস রয়েছে সেগুলো বিশেষ করে বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহারে পল্লী অঞ্চলের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে সহজেই আমাদের পল্লী অঞ্চলের চেহারা বদলে দেওয়া সম্ভব হবে।

বায়ুকল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকেও আমরা নজর দিতে পারি। গবেষণার মাধ্যমে সৌরশক্তির ব্যবহার সুলভ করতে পারলে আমাদের শক্তির যাবতীয় প্রয়োজন অফুরন্ত এ উৎস থেকে মেটানো সম্ভব হবে।

নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের প্রধান সুবিধাই হচ্ছে–এ উৎস শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। তাছাড়া পরিবেশ দূষণের হাত থেকে দেশকে বাঁচানো সম্ভব হবে।

৪.৪ শক্তির রূপান্তর
Transformation of energy

শক্তি অহরহ একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হচ্ছে। এ মহাবিশ্বে নানা ঘটনা প্রবাহ চলছে শক্তির রূপান্তর আছে বলে। শক্তি একরূপ থেকে একাধিকরূপে রূপান্তরিত হলেও মহাবিশ্বের মোট শক্তি ভান্ডারের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

মানুষ, কম্পিউটার কিংবা কোনো যন্ত্রকে কোনো কাজ করতে হলে কিংবা কোনো প্রক্রিয়া বা পরিবর্তন সাধন করতে হলে শক্তির রূপান্তরের প্রয়োজন হয়। একরূপের শক্তিকে অন্যরূপের শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, একরূপের শক্তি সারাক্ষণই অন্যান্যরূপের শক্তিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। এটিই শক্তির রূপান্তর হিসেবে পরিচিত। যখন কেউ গিটার বাজায় তখন কী হয়? শিল্পীর হাতের আঙুলের পেশি শক্তি কম্পমান তারে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যা সুমধুর মিউজিকরূপে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কানে প্রবেশ করে। যখন কাঠ বা খড়ি পোড়ানো হয় তখন রাসায়নিক শক্তি মুক্ত হয় এবং তা তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। একটি তড়িৎ কোষের অভ্যন্তরে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং এই সকল বিক্রিয়ার রাসায়নিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যা নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়।

একরূপের নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি অন্যরূপে রূপান্তরিত করলে কতটুকু শক্তি পাওয়া যাবে? শক্তির নিত্যতা বা সংরক্ষণশীলতা নীতি থেকে তা জানা যায়। শক্তি যখন একরূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত হয় তখন শক্তির কোনো ক্ষয় হয় না। এক বস্তু যে পরিমাণ শক্তি হারায় অপর বস্তু ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা নতুন কোনো শক্তি সৃষ্টি করতে পারি না বা শক্তি ধ্বংসও করতে পারি না। অর্থাৎ বিশ্বের সামগ্রিক শক্তি ভান্ডারের কোনো তারতম্য ঘটে না। এ বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে যে পরিমাণ শক্তি ছিল আজও মহাবিশ্বে সেই পরিমাণ শক্তি বর্তমান। এটাই শক্তির অবিনশ্বরতা বা নিত্যতা বা সংরক্ষণশীলতা।

শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি : শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, শক্তি কেবল একরূপ থেকে অপর এক বা একাধিকরূপে পরিবর্তিত হতে পারে। মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।

শক্তির রূপান্তর : আমরা আগেই বিভিন্ন প্রকার শক্তির কথা বলেছি সেগুলো সকলেই পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ কোনো একটা থেকে অন্যটাতে পরিবর্তন সম্ভব। এ পরিবর্তনকে শক্তির রূপান্তর বলে। আসলে প্রায় প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনাকেই শক্তির রূপান্তর হিসেবে ধরা যেতে পারে। নিচে শক্তির রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

১. যান্ত্রিক শক্তির রূপান্তর : হাতে হাত ঘষলে তাপ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কলমের খালি মুখে ফুঁ দিলে যান্ত্রিক শক্তি শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পানি যখন পাহাড় পর্বতের উপরে থাকে তখন তাতে বিভব শক্তি সঞ্চিত থাকে। এই পানি যখন ঝরনা বা নদীরূপে উপর থেকে নিচে নেমে আসে তখন বিভব শক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হয়। এই পানি প্রবাহের সাহায্যে চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এভাবে যান্ত্রিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

২. তাপ শক্তির রূপান্তর : বাষ্পীয় ইঞ্জিনে তাপের সাহায্যে বাষ্প উৎপন্ন করে রেলগাড়ি ইত্যাদি চালানো হয়। এখানে তাপ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাল্বের ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে তাপ শক্তি আলোক

শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। দুইটি ভিন্ন ধাতব পদার্থের সংযোগস্থলে তাপ প্রয়োগ করলে তাপ তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৩. আলোক শক্তির রূপান্তর : হারিকেনের চিমনিতে হাত দিলে গরম অনুভূত হয়। এখানে আলোক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ফটো–ভোলটেইক কোষের উপর আলোর ক্রিয়ায় আলোক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফটোগ্রাফিক কাগজের উপর আলোর ক্রিয়ায় ফলে আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৪. রাসায়নিক শক্তির রূপান্তর : খাদ্য এবং জ্বালানি যেমন তেল, গ্যাস, কয়লা ও কাঠ হচ্ছে রাসায়নিক শক্তির আধার। রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যের শক্তি আমাদের দেহে মুক্ত হয় এবং অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার সময় আমরা দরকারী কাজ করতে পারি। ইঞ্জিনে বা বয়লারে যখন জ্বালানি পোড়ানো হয় তখন শক্তির রূপান্তর ঘটায়। তড়িৎ কোষ ও ব্যাটারিতে রাসায়নিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তড়িৎ শক্তি আবার বাতির ফিলামেন্টে আলোক শক্তি ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৫. তড়িৎ শক্তির রূপান্তর : বৈদ্যুতিক মোটরে তড়িৎ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, হিটার ইত্যাদিতে তড়িৎ শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক বাল্বে তড়িৎ শক্তি তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। টেলিফোন ও রেডিওর গ্রাহক যন্ত্রে তড়িৎ শক্তি শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সঞ্চয়ক কোষে তড়িৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাড়িতচুম্বকে তড়িৎ শক্তি চৌম্বক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৬. নিউক্লীয় শক্তির রূপান্তর : নিউক্লীয় সাবমেরিনে নিউক্লীয় শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। নিউক্লীয় চুল্লীতে নিউক্লীয় শক্তি অন্যান্য শক্তি বিশেষ করে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আজকাল শক্তির চাহিদা অনেকাংশেই পূরণ করে থাকে।

বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টেশন থেকে বুঝা যায় শক্তি কীভাবে একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তর হয়ে আমাদের বাড়ি ঘরে আলো ও তাপ শক্তি দেয়। পাওয়ার স্টেশনে কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে রাসায়নিক শক্তি থেকে তাপ শক্তি পাওয়া যায়। টার্বাইনের সাহায্যে তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় যা বৈদ্যুতিক জেনারেটরের কুণ্ডলীকে ঘুরায়। এতে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। বাড়ি ঘরে, কল কারখানায় বৈদ্যুতিক বাতি ও হিটার তড়িৎ শক্তিকে আলো ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

আবার আমরা যখন হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে কোনো পেরেককে কাঠের মধ্যে প্রবেশ করাই তখন কোন কোন শক্তি কোন কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়? আমাদের শরীরের রাসায়নিক শক্তি হাতুড়িকে উপরে উঠাতে কৃত কাজে ব্যয় হয় যা হাতুড়ির উচ্চ অবস্থানে বিভব শক্তিরূপে জমা থাকে। যখন হাতুড়ি নিচে নামে তখন এই বিভব শক্তি গতিশীল হাতুড়ির গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই গতিশক্তি পেরেকটিকে কাঠের মধ্যে প্রবেশ করাতে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হয় এবং সাথে সাথে শব্দ শক্তি উৎপন্ন হয় এবং পেরেক, কাঠ ও হাতুড়িতে তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়।

শক্তি রূপান্তরিত হওয়ার সময় শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস না হলেও শক্তির অবনতি ঘটতে পারে। যেমন আলো বা তড়িৎ শক্তির মতো তাপ শক্তির সবটাই আমরা কাজে লাগাতে পারি না।

প্রতিবেদন তৈরি: কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

৪.৫ ক্ষমতা
Power

ক্ষমতা শব্দটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। দৈনন্দিন জীবনে ক্ষমতা সাধারণত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। বিজ্ঞানে ক্ষমতা শব্দটি মোটর, পাম্প, ইঞ্জিন ইত্যাদি যন্ত্র তথা কাজ সম্পাদনকারী কোনো কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট। অনেক সময় আমরা কোনো কাজ দ্রুত সমাধা করতে চাই। ধরা যাক, আমরা কোনো বহুতল ভবনের নিচতলার রিজার্ভার বা পুকুর থেকে পানি নিয়ে ছাদের ট্যাংক পানি পূর্ণ করতে চাই। আমরা যদি বালতি দিয়ে পানি বহন করে এ কাজটি করতে যাই তাহলে অনেক সময় লাগবে। আর যদি একটি মোটর বা পাম্পের সাহায্যে সরাসরি ট্যাংকটি পানি পূর্ণ করা হয় তাহলে সময় অনেক কম লাগবে।

কোনো কাজ কখনো দ্রুত করা হয় কখনো ধীরে করা হয়। কত দ্রুত বা কত ধীরে কাজ করা হয় তার পরিমাপ হলো ক্ষমতা। মনে কর রনি ও অনি দুই বন্ধু একটি ভবনের পাঁচতলায় বাস করে। তাদের দুজনের ভর সমান। তারা নিচতলায় লিফটের দরজার সামনে এসে দেখল লিফট নষ্ট। তাদের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হলো। রনির পাঁচ তলায় উঠতে সময় লাগল 40 সেকেন্ড আর অনির লাগল 80 সেকেন্ড। আমরা বলি রনি অনির চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান যদিও তারা দুইজনেই একই উচ্চতা উঠার জন্য একই পরিমাণ কাজ করেছে। রনির ক্ষমতা বেশি কারণ সে একই কাজ দ্রুত করেছে। ক্ষমতা হচ্ছে কাজ করার বা শক্তি রূপান্তরের হার। কোনো বস্তু বা ব্যক্তি একক সময়ে কতটুকু কাজ করল তা দ্বারা ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়।

$$\text{ক্ষমতা} = \frac{\text{কাজ}}{\text{সময়}}$$

কোনো ব্যক্তি বা যন্ত্র দ্বারা t সময়ে W পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হলে বা শক্তি রূপান্তরিত হলে ক্ষমতা P হবে

$$P = \frac{W}{t} \qquad (4.4$$

ক্ষমতার দিক নেই। কাজেই ক্ষমতা একটি স্কেলার রাশি।

মাত্রা : ক্ষমতার মাত্রা $\frac{\text{কাজ}}{\text{সময়}}$ –এর মাত্রা।

$$\text{ক্ষমতা} = \frac{\text{কাজ}}{\text{সময়}} = \frac{\text{বল} \times \text{সরণ}}{\text{সময়}} = \frac{\text{ভর} \times \text{ত্বরণ} \times \text{সরণ}}{\text{সময়}}$$

$$= \frac{\text{ভর} \times \text{সরণ} \times \text{সরণ}}{\text{সময়}^2 \times \text{সময়}} = \frac{\text{ভর} \times \text{সরণ}^2}{\text{সময়}^3}$$

$$\therefore [P] = \frac{ML^2}{T^3} = ML^2T^{-3}$$

একক : কাজের এককে সময়ের একক দিয়ে ভাগ করে ক্ষমতার একক পাওয়া যায়। যেহেতু কাজের একক জুল (J) এবং সময়ের একক হলো সেকেন্ড (s), সুতরাং ক্ষমতার একক হবে জুল/সেকেন্ড (Joule / second)। একে ওয়াট বলা হয়। ওয়াটকে W দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

এক সেকেন্ডে এক জুল কাজ করা বা শক্তি রূপান্তরের হারকে এক ওয়াট বলে।

$$1\,\text{W} = \frac{1\text{J}}{1\,\text{s}} = 1\,\text{Js}^{-1}$$

প্রবাহিত পানির স্রোত থেকে যান্ত্রিক শক্তি সংগ্রহ করে চৌম্বক শক্তির সমন্বয়ে তড়িৎ উৎপাদন করা হয় বলে এ

মডেল তৈরি : পড়ন্ত পানির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে টার্বাইন ঘুরিয়ে একটি ডায়নামো চালিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের একটি মডেল তৈরি কর।
চিত্র : (৪.৬)।

চিত্র : ৪.৬

ধরনের তড়িতের নাম জলবিদ্যুৎ। আমাদের দেশে কাপ্তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে পানির বিভব শক্তিকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

নদী বা সমুদ্রের পানির জোয়ার–ভাটার শক্তিকে ব্যবহারের প্রচেষ্টা মানুষ বহুদিন থেকে চালিয়ে যাচ্ছে। জোয়ার–ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন যন্ত্র চালনার ব্যাপারটি অনেকদিন আগেই উদ্ভাবিত হয়েছে।

ফ্রান্সে জোয়ার–ভাটার শক্তির সাহায্যে তড়িৎ শক্তি প্রকল্প সফলতার সাথে কাজ করছে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জোয়ার–ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তড়িৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

বায়ু শক্তি : পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে বায়ু প্রবাহিত হয়। বায়ু প্রবাহজনিত গতিশক্তিকে আমরা যান্ত্রিক বা তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি। শক্তি রূপান্তরের এরূপ যন্ত্রকে বায়ুকল বলে। বায়ু প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে প্রাচীনকালের মানুষেরা কুয়া থেকে পানি তোলা, জাহাজ চালানো ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করতো। নৌকায় পাল তুলে আজও বায়ু শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহার করে বায়ুকল কাজে লাগিয়ে তড়িৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

ভূ–তাপীয় শক্তি : ভূ–অভ্যন্তরের তাপকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ভূ–অভ্যন্তরের গভীরে তাপের পরিমাণ এত বেশি যে তা শীলাখন্ডকে গলিয়ে ফেলতে পারে। এ গলিত শীলাকে ম্যাগমা বলে। ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে কখনো কখনো এই ম্যাগমা উপরের দিকে উঠে আসে যা ভূপৃষ্ঠের খানিক নিচে জমা হয়। এ সকল জায়গা হট স্পট (Hot spot) নামে পরিচিত। ভূ–গর্ভস্থ পানি এ হট স্পটের সংস্পর্শে এসে বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্প ভূ–গর্ভে আটকা পড়ে যায়। হট স্পটের উপর গর্ত করে পাইপ ঢুকিয়ে উচ্চ চাপে এই বাষ্পকে বের করে আনা যায় যা দিয়ে টার্বাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। নিউজিল্যান্ডে এ রকম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে।

বায়োমাস শক্তি : সৌর শক্তির একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ যা সবুজ গাছপালা দ্বারা সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বায়োমাসরূপে গাছপালার বিভিন্ন অংশে মজুদ থাকে। বায়োমাস বলতে সেই সব জৈব পদার্থকে বুঝায় যাদেরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। মানুষসহ অনেক প্রাণী খাদ্য হিসেবে বায়োমাস গ্রহণ করে তাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে জীবনের কর্মকান্ড সচল রাখে। বায়োমাসকে শক্তির একটি বহুমুখী উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যায়। জৈব পদার্থসমূহ যাদেরকে বায়োমাস শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায় সেগুলো হচ্ছে গাছ–গাছালী, জ্বালানি কাঠ, কাঠের বর্জ্য, শস্য, ধানের তুষ ও কুড়া, লতা–পাতা, পশু পাখির মল, পৌর বর্জ্য ইত্যাদি। বায়োমাস প্রধানত কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত। নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম উৎস বায়োমাস।

বায়োমাস থেকে সহজে উৎপাদন করা যায় বায়োগ্যাস। এ গ্যাস আমরা প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসেবে রান্নার কাজে এমনকি বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজেও ব্যবহার করতে পারি। এর উৎপাদন পদ্ধতিও বেশ সহজ। একটি আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে গোবর ও পানির মিশ্রণ ১ ঃ ২ অনুপাতে রেখে পচানো হলে বায়োগ্যাস উৎপন্ন হয়। যা নলের সাহায্যে বেরিয়ে

৪.৬ কর্মদক্ষতা

Efficiency

শক্তি রূপান্তরের সহায়তায় আমরা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাই। যেমন পেট্রোলে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে আমরা ইঞ্জিন চালাতে পারি। শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুসারে কোনো ইঞ্জিন থেকে সেই পরিমাণ শক্তি আমাদের পাওয়া উচিত যে পরিমাণ শক্তি ইঞ্জিনে প্রদত্ত হয়। কিন্তু এটা দেখা যায়, যে পরিমাণ শক্তি ইঞ্জিনে প্রদত্ত হয় সর্বদাই তার চেয়ে কম পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। এটি প্রধানত হয় এই কারণে যে, ইঞ্জিনে ঘর্ষণ বলের বিরুদ্ধে যে কাজ করতে হয় তা তাপ শক্তিরূপে অপচয় হয়। ইঞ্জিন থেকে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় তাকে লভ্য কার্যকর শক্তি বলে। এক্ষেত্রে শক্তির সমীকরণ দাঁড়ায় :

প্রদত্ত শক্তি = লভ্য কার্যকর শক্তি + অন্যভাবে ব্যয়িত শক্তি।

কোনো যন্ত্রের কর্মদক্ষতা বলতে বুঝায়, যন্ত্রে যে পরিমাণ শক্তি প্রদান করা হয় তার কত অংশ কার্যকর শক্তি হিসেবে পাওয়া যায়। সুতরাং, কর্মদক্ষতা বলতে মোট যে কার্যকর শক্তি পাওয়া যায় এবং মোট যে শক্তি দেওয়া হয়েছে তার অনুপাতকে বুঝায়। একে সাধারণত শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

$$\text{কর্মদক্ষতা, } \eta = \frac{\text{লভ্য কার্যকর শক্তি}}{\text{মোট প্রদত্ত শক্তি}} \times 100\ \% \qquad (4.5$$

একটি সাধারণ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে, অনেক ধাপে শক্তির রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তর কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস বা ইউরেনিয়াম থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। দেখা গেছে শক্তির এই রূপান্তরসমূহের ক্ষেত্রে প্রদত্ত শক্তির প্রায় 70 % পর্যন্ত অপচয় হয় এবং তাপ শক্তিরূপে হারিয়ে যায়।

প্রদত্ত শক্তির কেবল 30 % শেষ পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে উৎপাদন কেন্দ্রের কর্মদক্ষতা মাত্র 30 % ।

গাণিতিক উদাহরণ ৪.৫ : একটি 10 N ওজনের বস্তুকে 5 m উচ্চতায় উঠানোর জন্য একটি বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহার কর হলো। এটি 65 J তড়িৎ শক্তি ব্যবহার করে।

(ক) মোটর কর্তৃক অপচয়কৃত শক্তির পরিমাণ কত?

(খ) মোটরের কর্মদক্ষতা কত?

(ক) এখানে ব্যয়িত শক্তি = কৃত কাজ = বল × সরণ = ওজন × উচ্চতা

$= 10\ \text{N} \times 5\ \text{m}$

$= 50\ \text{J}$

সুতরাং অপচয়কৃত শক্তি = সরবরাহকৃত শক্তি –ব্যয়িত শক্তি

$= 65\ \text{J} - 50\ \text{J}$

$= 15\ \text{J}$

(খ) কর্মদক্ষতা, $\eta = \frac{\text{লভ্য কার্যকর শক্তি}}{\text{মোট প্রদত্ত শক্তি}} \times 100\ \%$

$= \frac{50\text{J}}{65\text{J}} \times 100\%$

$= 76.92\%$

অনুসন্ধান– ৪.১

সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা নির্ণয়।

উদ্দেশ্য : ক্ষমতা নির্ণয় এবং নিজের বিভিন্ন সময়ে প্রয়োগকৃত ক্ষমতার তুলনা এবং অপরের ক্ষমতার সাথে তুলনা।

যন্ত্রপাতি : থামা ঘড়ি।

কাজের ধারা :

১. একটি দালান ঠিক কর (তিনতলা থেকে ছয়তলার মধ্যে হলে ভালো হয়)। সেটি তোমার স্কুল, বাসা বা যেকোনো ভবন হতে পারে।

২. এই দালানের ছাদে উঠার সিঁড়ির সংখ্যা গণনা কর।

৩. একটি সিঁড়ির উচ্চতা স্কেলের সাহায্যে নির্ণয় করে তাকে সিঁড়ির সংখ্যা দিয়ে গুণ করে ছাদের মোট উচ্চতা নির্ণয় কর।

৪. একটি ওয়েট মেশিনের (ওজন মাপার যন্ত্র) সাহায্যে তোমার ভর নির্ণয় কর।

৫. তুমি যত জোরে পারো দৌড়ে ছাদের উপর উঠ।

৬. থামা ঘড়ির সাহায্যে ছাদে উঠার সময় নির্ণয় কর।

৭. এরপর তুমি আস্তে দৌড়ে, জোরে হেঁটে, স্বাভাবিকভাবে হেঁটে এবং আস্তে আস্তে হেঁটে একইভাবে ছাদে উঠার সময় নির্ণয় কর।

৮. নিম্নোক্ত ছক অনুসারে প্রতিক্ষেত্রে তোমার ক্ষমতা বের কর।

অনুসন্ধানের ছক

তোমার ভর, $m =$ kg

ছাদের উচ্চতা, $h =$ m

অভিকর্ষজ ত্বরণ, $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$

পাঠ	দৌড়ের প্রকৃতি	ছাদে উঠার সময়, t (s)	ক্ষমতা $= \frac{mgh}{t}$ (W)
1	জোরে দৌড়ে		
2	আস্তে দৌড়ে		
3	জোরে হেটে		
4	স্বাভাবিক ভাবে হেটে		
5	আস্তে হেটে		

৯. বিভিন্ন সময় তোমার ক্ষমতা বিভিন্ন হলো কেন, তা আলোচনা কর।

১০. একইভাবে প্রাপ্ত তোমার বন্ধুদের ক্ষমতার সাথে তোমার ক্ষমতার তুলনা কর।

১১. তোমার ক্লাশের সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে ক্ষমতা প্রয়োগকারী পাঁচজন শিক্ষার্থীর নাম লিখ।

অনুসন্ধান – ৪.২

বায়োমাস থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদন।

উদ্দেশ্য : নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার প্রদর্শন।

যন্ত্রপাতি/উপকরণ : গোবর, চাউলের তুষ,কাঠের গুঁড়ো, প্লাস্টিক বা কাচের বড় বোতল (বা ল্যাবরেটরিতে থাকলে কনিক্যাল ফ্লাস্ক), কর্ক, নল ইত্যাদি ।

কাজের ধারা :

১. বোতলের মধ্যে গোবর, তুষ,কাঠের গুঁড়োর মিশ্রণ এবং পানি ১ ঃ ২ অনুপাতে নাও।
২. এবার নল লাগানো কর্ক দিয়ে বোতলের বা ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ করে দাও।
৩. নলের মুখটিও কর্ক দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে দাও।
৪. বোতল বা ফ্লাস্কটিকে ঘরের এক কোণে রেখে দাও।
৫. দুই এক দিন পর নলের মুখের কর্ক সরিয়ে দেখ গ্যাস বের হচ্ছে কিনা ।
৬. গ্যাস বের হলে নলের মুখে জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি ধর।।
৭. গ্যাসে আগুন জ্বলবে ।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দাও

১। কাজের একক কোনটি ?

(ক) জুল (খ) নিউটন

(গ) কেলভিন (ঘ) ওয়াট

২। একটি বস্তুকে টান টান করলে এর মধ্যে কোন শক্তি জমা থাকে ?

(ক) গতিশক্তি (খ) বিভব শক্তি

(গ) তাপ শক্তি (ঘ) রাসায়নিক শক্তি

৩। m ভরের একটি বস্তুকে 20 m, 30 m, 40 m ও 50 m উপরে রাখা হলো। কোন অবস্থানে তার বিভব শক্তি সবচেয়ে বেশি?

(ক) 20 m (খ) 30 m

(গ) 40 m (ঘ) 50 m

নিচের লেখ চিত্র অনুসারে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ।

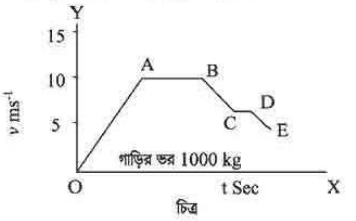

চিত্র

৪। লেখ চিত্রের কোন অংশে বেগ সময়ের সমানুপাতে বৃদ্ধি পায় –

(ক) OA অংশে (খ) AB অংশে

(গ) CD অংশে (ঘ) DE অংশে

৫। সর্বোচ্চ গতিশক্তি কত ?

(ক) 1.25×10^5 J (খ) 5×10^4 J

(গ) 1.25×10^4 J (ঘ) 6.2×10^3 J

৬। শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি থেকে পাওয়া যায় –

(i) শক্তির সৃষ্টি ও বিনাশ নাই, মহাবিশ্বের মোট শক্তি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।

(ii) অনবায়নযোগ্য শক্তি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাই নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করতে হবে।

(iii) শক্তিকে রক্ষা করতে এর কার্যকর ব্যবহার এবং সিস্টেম লস কমানো জরুরি ।

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i, iiও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। 40 kg ভরের একটি বালক এবং 60 kg ভরের একজন যুবক একটি ভবনের নিচতলা থেকে এক সাথে দৌড় শুরু করে দৌড়ে একই সময়ে ছাদের একই জায়গায় পৌঁছালেন। দৌড়ের সময় উভয়ের বেগ ছিল 30 m/min ।

(ক) ক্ষমতা কি ?

(খ) 50 J কাজ বলতে কী বুঝায় ?

(গ) যুবকের গতিশক্তি নির্ণয় কর

(ঘ) ছাদে উঠার ক্ষেত্রে দুইজনের ক্ষমতা সমান ছিল কিনা পাণিতিক যুক্তিসহ বাচাই কর।

গ. সাধারণ প্রশ্ন

১। একটি দেয়াশলাইয়ের কাঠি দেয়াশলাই বক্সে 5 N বলে ঘষা হলো। কাঠিটিকে 5 cm টানা হলো।

(ক) কাঠি ঘষাতে কত শক্তি ব্যয় হলো ?

(খ) কাঠি টানতে যদি 0.5 s সময় লাগে তাহলে কত ক্ষমতা লাগল ?

২। একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের রিজার্ভার সমুদ্র সমতল থেকে 800 m উঁচুতে এবং পাওয়ার স্টেশনটি 250 m উঁচুতে অবস্থিত। রিজার্ভারের পানি পাইপের মাধ্যমে এসে পাওয়ার স্টেশনের টার্বাইন ঘুরায়। রিজার্ভারে 2×10^8 লিটার পানি আছে। যদি 1 লিটার পানির ভর 1 kg হয়, তবে রিজার্ভারের পানিতে কত বিভব শক্তি সঞ্চিত আছে।

৩। 40 kg ভরের এক বালক সিড়ি দিয়ে 12 s –এ ছাদে উঠে। সিড়িতে ধাপের সংখ্যা 20 টি এবং প্রতিটি ধাপের উচ্চতা 20 cm।

(ক) ঐ বালকের ওজন কত ?

(খ) বালকটি মোট কত উচ্চতায় আরোহণ করেছিল ?

(গ) ছাদে উঠতে সে কত কাজ করল ?

(ঘ) সিড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠতে সে কত ক্ষমতা কাজে লাগাল ?

৪। যে সকল পাওয়ার স্টেশন জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে তাদের চেয়ে নিউক্লীয় শক্তি উৎপাদনের একটি মস্তবড় সুবিধা হচ্ছে যে, এতে গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপন্ন হয় না।

(ক) নিউক্লীয় শক্তি ব্যবহারে অন্যান্য সুবিধাগুলো কী কী ?

(খ) নিউক্লীয় শক্তি ব্যবহারে অসুবিধাগুলো কী কী ?

পঞ্চম অধ্যায়

পদার্থের অবস্থা ও চাপ

PRESSURE AND STATES OF MATTER

[আমরা পদার্থের তিনটি অবস্থার কথা জানি–কঠিন, তরল ও বায়বীয়। পদার্থের আরও একটি অবস্থা আছে যার নাম প্লাজমা। তরল ও বায়বীয় পদার্থ সহজে প্রবাহিত হতে পারে বলে এদেরকে প্রবাহী বলে। প্রবাহী চাপ প্রদান করে। প্রবাহীর চাপকে কাজে লাগিয়ে অনেক কাজ সহজে করা যায়। পদার্থের একটি বিশেষ ধর্ম হলো স্থিতিস্থাপকতা। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।]

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১. বল ও ক্ষেত্রফলের পরিবর্তনের সাথে চাপের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারব।
২. স্থির তরলের মধ্যে কোনো বিন্দুতে চাপের রাশিমালা পরিমাপ করতে পারব।
৩. তরলে নিমজ্জিত বস্তুর ঊর্ধ্বমুখী চাপের অনুভূতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
৪. প্যাসকেলের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
৫. প্যাসকেলের সূত্রের ব্যবহারিক ক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারব।
৬. আর্কেমিডিসের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
৭. ঘনত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
৮. দৈনন্দিন জীবনে ঘনত্বের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
৯. বস্তু কেন পানিতে ভাসে তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
১০. বাংলাদেশে নৌ পথে দুর্ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারব।
১১. বায়ুমণ্ডলের চাপ ব্যাখ্যা করতে পারব।
১২. তরল স্তম্ভের উচ্চতা ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপ করতে পারব।
১৩. উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারব।
১৪. আবহাওয়ার উপর বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারব।
১৫. পীড়ন ও বিকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
১৬. হুকের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
১৭. পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
১৮. পদার্থের প্লাজমা অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারব।

৫.১ চাপ ও ক্ষেত্রফল
Pressure and Area

হাইহিল জুতা পরে কেউ নরম মাটির উপর দিয়ে হাটলে জুতা মাটির মধ্যে ঢুকে যায়। আবার যদি কেউ চ্যাপ্টা তলাওয়ালা জুতা পরেন তবে তা মাটিতে ঢুকে না। চাপের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যে এটা হয় তা আমরা দেখব।

চিত্র: ৫.১

কোনো বস্তুর প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে প্রযুক্ত বলকে চাপ বলে। ধরা যাক A ক্ষেত্রফলের উপর ক্রিয়ারত লম্বভাবে প্রযুক্ত বল F

তাহলে চাপ, $p = \frac{F}{A}$ অর্থাৎ, চাপ $= \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$ (5.1)

লক্ষণীয় যে, একই বলের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল A যত কম হয়, চাপ p তত বেশি হয় এবং একই ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে বল F যত বেশি হয়, চাপ p তত বেশি হয়।

উদাহরণ

১. একটি পেরেকের সূচালো মুখের ক্ষেত্রফল খুব কম। তাই কাঠ জাতীয় কোনো তলের উপর সূচালো মুখটি রেখে পেরেকের চওড়া মাথায় আঘাত করলে সূচালো মাথার কারণে কাঠের তলের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি চাপ পড়ে, ফলে পেরেকটি সহজেই বস্তুটির মধ্যে ঢুকে যায়।

২. ছুরির ধারালো প্রান্তের ক্ষেত্রফল খুব কম। তাই কোনো বস্তুর উপর ধারালো প্রান্তটিকে ধরে বল প্রয়োগ করলে ছুরির প্রান্ত ক্ষুদ্র বস্তুর উপর বেশি চাপ পড়ে। ফলে বস্তুটি সহজেই কাটা যায়।

> **নিজে কর :** একটি তীক্ষ্ণ ধারালো আলপিন এবং একটি ভোতা আলপিন নিয়ে কাগজ ছিদ্র কর। কোনটি দিয়ে ছিদ্র করা সহজ? ব্যাখ্যা কর।

তীক্ষ্ণ ধারালো আলপিনের চওড়া মাথায় বল দিলে সরু মাথার দ্বারা বেশি চাপ প্রয়োগ করা যায়।

ভোঁতা আলপিনের চওড়া মাথায় বল দিয়ে ভোঁতা মাথার দ্বারা তত বেশি চাপ প্রয়োগ করা যায় না। ফলে ধারালো আলপিন দিয়ে কাগজ ছিদ্র করা সহজ।

> **যাচাই কর :** সমান ইটের রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটা আর ইটের খোয়ার উপর দিয়ে হাঁটা। কোনটি কষ্টসাধ্য। ব্যাখ্যা কর?

চাপের একক

বলের এককে ক্ষেত্রফলের একক দিয়ে ভাগ করলে চাপের একক পাওয়া যায়। অতএব চাপের একক $N\,m^{-2}$। একে প্যাসকেল (Pa) বলে।

$\therefore 1\ Pa = 1\ N\ m^{-2}$.

প্রতি $1m^2$ ক্ষেত্রফলের উপর 1N বল লম্বভাবে ক্রিয়া করলে যে চাপ হয় তাকে 1Pa বলে।

গাণিতিক উদাহরণ ৫.১ : জুতা পায়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মহিলার ভর 50 kg। তার জুতার তলার ক্ষেত্রফল $200\ cm^2$ হলে মাটিতে জুতার চাপ বের কর।

আমরা জানি

$$\text{চাপ, } p = \frac{F}{A} = \frac{W}{A}$$

$$= \frac{490\ N}{200 \times 10^{-4}\ m^2} = 2.45 \times 10^4\ Pa$$

দেওয়া আছে, ভর, $m = 50$ kg

বল, $F = W = mg = 50\ kg \times 9.8\ ms^{-2}$

$= 490$ N

জুতার তলার ক্ষেত্রফল, $A = 200\ cm^2$

$= 200 \times 10^{-4}\ m^2$

৫.২ স্থির তরলের মধ্যে কোনো বিন্দুতে চাপ

Pressure at a point in a liquid at equlibrium

তরল পদার্থের ভিতরে কোনো বিন্দুতে চাপ বলতে ঠিক ঐ বিন্দুর চারদিকে প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে অনুভূত বলকে বুঝায়। ৫.২ নং চিত্রে একটি পাত্রে কিছু পরিমাণ তরল পদার্থ আছে।

তরলের অভ্যন্তরে h গভীরতায় B বিন্দুতে চাপ নির্ণয় করতে হবে। B বিন্দুতে তরলের চাপ নির্ণয়ের জন্য B বিন্দুকে ভূমির উপর একটি বিন্দু ধরে h উচ্চতার একটি তরলভর্তি সিলিন্ডার কল্পনা করা যাক।

ধরা যাক, সিলিন্ডারের ভূমি তথা তরলের ক্ষেত্রফল = A

তরলের ঘনত্ব = ρ

তরলের মুক্ততল থেকে B বিন্দুর গভীরতা = h

অভিকর্ষজ ত্বরণ = g

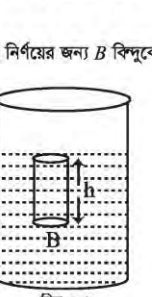

চিত্র ৫.২

আমরা জানি, চাপ = $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$

এখানে A ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত বল = তরলের ওজন

= তরলের ভর $\times g$

= তরলের আয়তন $\times$ ঘনত্ব $\times g$

= তরলের ক্ষেত্রফল $\times$ তরলের গভীরতা $\times$ঘনত্ব $\times g$

$= Ah\rho g$

$$\therefore \text{চাপ, } p = \frac{Ah\rho g}{A}$$

বা চাপ, $p = h\rho g$ (5.2)

আবার যেহেতু g ধ্রুবক তাই, $p \propto h\rho$

অর্থাৎ স্থির তরলের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে চাপ ঐ বিন্দুর গভীরতা ও ঘনত্বের সমানুপাতিক। সুতরাং তরলের গভীরতা বাড়লে চাপ বাড়ে এবং ঘনত্ব বাড়লেও চাপ বাড়ে। গভীরতা বাড়লে চাপ বাড়ে বিধায় চিত্রে বেশি গভীরতার ছিদ্র থেকে নির্গত তরলের বেগ বেশি (চিত্র ৫.৩)।

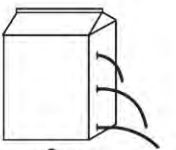
চিত্র ৫.৩

গাণিতিক উদাহরণ ৫.২ : একটি পাত্রে কেরোসিন আছে। কেরোসিনের উপরিতল থেকে 75 cm গভীরে কোনো বিন্দুতে চাপের মান নির্ণয় কর। কেরোসিনের ঘনত্ব 800 kg m^{-3}।

আমরা জানি,

$p = h\rho g$

$= 0.75\ m \times 800\ kg\ m^{-3} \times 9.8\ ms^{-2} = 5880\ Pa$

উ: 5880 Pa

দেওয়া আছে'
তরলের গভীরতা,
$h = 75\ cm = 0.75\ m$
তরলের ঘনত্ব, $\rho = 800\ kg\ m^{-3}$
চাপ $p = ?$

৫.৩ প্লবতা

Buoyancy

যে পদার্থ প্রবাহিত হয় বা হতে পারে তাকে প্রবাহী (fluid) বলে। তরল ও বায়বীয় এ দুই শ্রেণির পদার্থ প্রবাহীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রবাহীর চাপ: কোনো তলে স্থির অবস্থায় থেকে প্রবাহী তার প্রতি একক ক্ষেত্রফলে লম্বভাবে যে বল প্রয়োগ করে তার মানকে প্রবাহীর চাপ বলে। যদি একটি তলের ক্ষেত্রফল A এবং প্রবাহী কর্তৃক লম্বভাবে প্রযুক্ত বল F হয় তাহলে চাপ,

$$p = \frac{F}{A}$$

প্লবতা : পানিপূর্ণ একটি কলসিকে পানির মধ্যে সরানো যত সহজ, পানিতে না রেখে সরানো তত সহজ নয়। পানির মধ্যে ডুবন্ত অবস্থায় কলসিটি বেশ হালকা মনে হয় কারণ কলসির উপর একটি উর্ধ্বমুখী বল কাজ করে।

তরল বা বায়বীয় পদার্থে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত কোনো বস্তুর উপর তরল বা বায়বীয় পদার্থ লম্বভাবে যে উর্ধ্বমুখী লব্ধি বল প্রয়োগ করে তাকে প্লবতা বলে। প্লবতার মান বস্তুর নিমজ্জিত অংশ কর্তৃক অপসারিত তরল বা বায়বীয় পদার্থের ওজনের সমান হয়।

প্লবতার মান

তরলের মধ্যে কোনো কঠিন বস্তুকে নিমজ্জিত করলে বস্তুর প্রতি বিন্দুতে সর্বমুখী চাপ অনুভূত হবে। ধরা যাক A প্রস্থচ্ছেদের এবং h উচ্চতার একটি সিলিন্ডার $PQRS$। এটা ρ ঘনত্বের প্রবাহীতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত আছে (চিত্র : ৫.৪)। তরলের মুক্ত তল থেকে সিলিন্ডারের উপরের এবং নিচের পৃষ্ঠের গভীরতা যথাক্রমে h_1 ও h_2

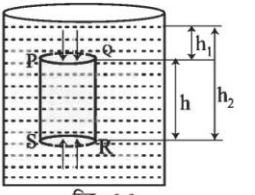

চিত্র : ৫.৪

সুতরাং $h = h_2 - h_1$

সিলিন্ডারের উপরি পৃষ্ঠ PQ–এ তরল কর্তৃক নিম্নমুখী বল, $F_1 = Ah_1\rho g$

সিলিন্ডারটির নিম্ন পৃষ্ঠ SR– এ তরল কর্তৃক উর্ধ্বমুখী বল, $F_2 = Ah_2\rho g$

সিলিন্ডারের বক্রপৃষ্ঠে তরল কর্তৃক প্রযুক্ত পার্শ্বচাপজনিত বল পরস্পর সমান ও বিপরীতমুখী বিধায় নাকচ হয়ে যায়।

সুতরাং উর্ধ্বমুখী লব্ধি বল বা প্লবতা –

$= F_2 - F_1$

$= Ah_2\rho g - Ah_1\rho g$

$= A(h_2 - h_1)\rho g$

$= Ah\rho g$

$= (hA)\rho g$

$= V\rho g$, [$V = hA$ = সিলিন্ডারের আয়তন]

= বস্তু কর্তৃক অপসারিত প্রবাহীর ওজন।

সুতরাং নিমজ্জিত বস্তুর উপর ক্রিয়ারত উর্ধ্বমুখী বল বা প্লবতা বস্তু কর্তৃক অপসারিত প্রবাহীর ওজনের সমান। এই উর্ধ্বমুখী বলের জন্যই তরলে নিমজ্জিত বস্তু ওজন হারায় বলে মনে হয়।

৫.৪ প্যাসকেলের সূত্র
Pascal's Law

কোনো আবদ্ধ তরল বা বায়বীয় পদার্থের কোনো অংশে চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ সবদিকে সঞ্চালিত হয়। প্যাসকেল চাপের এ সঞ্চালন সম্পর্কে নিম্নোক্ত সূত্র প্রদান করেন–

আবদ্ধ পাত্রে তরল বা বায়বীয় পদার্থের কোনো অংশের উপর বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ কিছু মাত্র না কমে তরল বা বায়বীয় পদার্থের সবদিকে সমানভাবে সঞ্চালিত হয় এবং তরল বা বায়বীয় পদার্থের সংলগ্ন পাত্রের গায়ে লম্বভাবে ক্রিয়াকরে।

প্যাসকেলের সূত্রের ব্যবহারিক ক্রিয়া : বলবৃদ্ধিকরণ

আবদ্ধ তরল পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের উপর পিস্টন দ্বারা কোনো বল প্রয়োগ করলে এর বৃহত্তম পিস্টনে সেই বলের বহুগুণ বেশি বল প্রযুক্ত হতে পারে। একে বল বৃদ্ধিকরণ নীতি বলে।

ধরা যাক, C_1 ও C_2 দুইটি সিলিন্ডার (চিত্র ৫.৫)। এদের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে A_1 ও A_2। সিলিন্ডার দুইটি একটি নল দ্বারা সংযুক্ত এবং প্রত্যেক সিলিন্ডারে একটি করে পিস্টন নিচ্ছিদ্রভাবে লাগানো আছে। এখন সিলিন্ডার দুইটি যেকোনো তরল পদার্থে পূর্ণ করে যদি ছোট পিস্টনে F_1 বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে ঐ পিস্টনে অনুভূত চাপের মান $\frac{F_1}{A_1}$। প্যাসকেলের

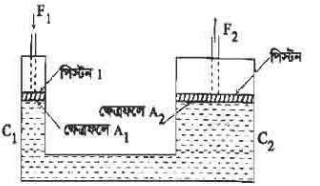

চিত্র: ৫.৫

সূত্রানুসারে এ চাপ তরল পদার্থ দ্বারা সবদিকে সঞ্চালিত হবে। সুতরাং বড় পিস্টনে প্রযুক্ত ঊর্ধ্বচাপ $\frac{F_1}{A_1}$ হবে। এ চাপের জন্য বড় পিস্টনে অনুভূত ঊর্ধ্বমুখী বল হবে, চাপ × ক্ষেত্রফল বা $\frac{F_1}{A_1} \times A_2$ এর সমান। সুতরাং বড় পিস্টনে অনুভূত ঊর্ধ্বমুখী বল F_2 হলে,

$$F_2 = \frac{F_1}{A_1} \times A_2$$

$$\therefore \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1} \qquad (5.3)$$

কাজেই বড় পিস্টনের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে বলও তত বেশি অনুভূত হবে। ছোট পিস্টনের চেয়ে বড় পিস্টন যদি 100 গুণ বড় হয় তাহলে ছোট পিস্টনে 1 নিউটন বল প্রয়োগ করলে বড় পিস্টনে 100 নিউটন ঊর্ধ্বমুখী বল অনুভূত হবে।

৫.৫ আর্কিমিডিসের সূত্র
Archemedes' Law

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই, যেকোনো কঠিন বস্তুকে পানিতে ডুবালে হাল্কা বলে মনে হয়। এর কারণ ডুবন্ত বস্তুর উপর একটা ঊর্ধ্বমুখী বল বা প্লবতা কাজ করে। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক আর্কিমিডিস আবিষ্কার করেন যে, কোনো বস্তুকে স্থির তরল অথবা বায়বীয় পদার্থে আংশিক বা সম্পূর্ণ ডুবালে বস্তুটি কিছু ওজন হারায় বলে মনে হয়। এই হারানো ওজন বস্তুটির দ্বারা অপসারিত তরল বা বায়বীয় পদার্থের ওজনের সমান।

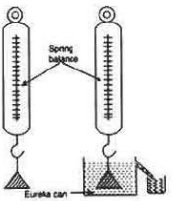

চিত্র : ৫.৬

পরীক্ষণ : একটি বস্তু নাও যার ওজন জানা। এবার বস্তুটিকে একটি হালকা সুতোয় বেঁধে কানায় কানায় পানি ভর্তি বড় বিকারের মধ্যে ডুবাও। এর ফলে কিছু পানি উপচে পড়বে। পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় বস্তুটির ওজন নাও। জানা ওজন থেকে এই ওজন বিয়োগ করে আপাত ওজন হ্রাস বের কর। এবার উপচে পড়া পানির ওজন বের কর। দেখা যাবে বস্তুর ওজনের আপাত হ্রাসের পরিমাণ অপসারিত তরলের ওজনের সমান। এভাবে আমরা আর্কিমিডিসের নীতির একটা সহজ প্রমাণ পেতে পারি।

হিসাব কর : একটি আয়তাকার ব্লকের তলদেশের ক্ষেত্রফল 25 cm^2, একে পানির মধ্যে ডুবানো হলো। পানির ঘনত্ব 1000 kg m^{-3}। পানির উপরিতল থেকে ব্লকের উপরের পৃষ্ঠের গভীরতা = 5 cm, ব্লকের উচ্চতা 2 cm. হলে

১। ব্লকের উপরিতলে পানির চাপ P_1 বের কর

২। ব্লকের তলদেশে পানির চাপ P_2 বের কর

৩। ব্লকের উপরিতলে পানি কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করবে?

৪। ব্লকের নিম্নতলে পানি কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করবে? ফলাফলে তোমার মন্তব্য লিখ।

৫.৬ ঘনত্ব
Density

কোনো বস্তু যে জায়গা জুড়ে থাকে তাকে এর আয়তন বলে। সমান আয়তনের এক টুকরা কর্ক আর এক টুকরা লোহা কি সমান ভারী? আসলে আয়তন সমান হলেও যার ঘনত্ব বেশি সেটি ভারী আর যার ঘনত্ব কম সেটি হালকা। কোনো বস্তুর একক আয়তনের ভরকে তার উপাদানের ঘনত্ব বলে। ঘনত্ব পদার্থের একটি সাধারণ ধর্ম। ঘনত্ব বস্তুর উপাদান ও তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

ঘনত্বকে ρ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। m ভরের কোনো বস্তুর আয়তন V হলে, ঘনত্ব ρ হবে

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{\text{বস্তুর ভর}}{\text{বস্তুর আয়তন}} \qquad (5.4)$$

ঘনত্বের একক kg m^{-3}

কাজ : দুটি বোতল নাও যাদের আয়তন সমান। একটি বোতল পানি দ্বারা ভর এবং একটি মধু দ্বারা পূর্ণ কর। হাত দিয়ে উঠাও। কোনটি ভারী মনে হচ্ছে?

মধু ভর্তি বোতলটি বেশি ভারী মনে হবে কারণ মধুর ঘনত্ব বেশি।

কয়েকটি পদার্থ ও তাদের ঘনত্ব :

পদার্থ	ঘনত্ব (kg m^{-3})	পদার্থ	ঘনত্ব (kg m^{-3})
বায়ু	1.29	পানি (4 ^{0} Cএ)	1000
কর্ক	250	লোহা	7800
পারদ	13600	রুপা	10500
বরফ	920	সোনা	19300

দৈনন্দিন জীবনে ঘনত্বের ব্যবহার:

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উদ্বোধনীতে বেলুন উড়ানো হয়। এই বেলুনের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস থাকে। হাইড্রোজেন গ্যাসের ঘনত্ব বায়ুর ঘনত্বের চেয়ে বেশ কম। তাই এই গ্যাসভর্তি হালকা বেলুন সহজে উপরের দিকে উঠে যায়। বিদ্যুৎ চলে গেলে আমরা অনেকেই আই.পি.এস ব্যবহার করে থাকি। এতে বড় ব্যাটারি থাকে। গাড়িতে বা মাইকেও অনুরূপ ব্যাটারি থাকে যাদেরকে সঞ্চয়ী কোষ বলে। এই সকল কোষে ব্যবহৃত সালফিউরিক এসিডের ঘনত্ব 1.5×10^3 kg m^{-3} থেকে 1.3×10^3 kg m^{-3}। হাইড্রোমিটার দিয়ে মাঝে মাঝে ঘনত্ব মেপে দেখতে হয়। ঘনত্ব বেশি হলে কোষটা নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য মাঝে মধ্যে প্রয়োজনীয় পানি দিয়ে ঘনত্ব ঠিক রাখতে হয়।

ভালো ডিম পানিতে ডুবে যায় কিন্তু পচা ডিম পানিতে ভাসে। পচা ডিমের ঘনত্ব পানির চেয়ে কম বলে তা ভাসে।

গাণিতিক উদাহরণ ৫.৬: $2\ m^3$ আয়তনের তরলের ভর 2000 kg হলে তরলের ঘনত্ব কত?

আমরা জানি,

$$\text{ঘনত্ব, } \rho = \frac{\text{ভর}}{\text{আয়তন}} = \frac{m}{V}$$

$$= \frac{2000\ \text{kg}}{2\ \text{m}^3} = 1000\ \text{kg m}^{-3}$$

দেওয়া আছে
ভর, $m = 2000$ kg
আয়তন, $V = 2\ m^3$
ঘনত্ব, $\rho = ?$

৫.৭ বস্তুর ভাসন ও নিমজ্জন

Floatation and immersion of a body

স্থির তরলে কোনো বস্তুকে ছেড়ে দিলে বস্তুটির উপর একই সঙ্গে দুইটি বল ক্রিয়া করে–

১. বস্তুর ওজন W_1 খাড়া নিচের দিকে ক্রিয়া করে

২. নিমজ্জিত বস্তুর উপর তরলের প্লবতা W_2 উলম্বভাবে উপরের দিকে ক্রিয়া করে।

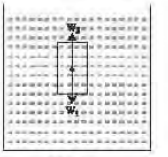

চিত্র ৫.৭

বস্তুর ভাসন ও নিমজ্জনের ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

ক) যদি $W_1 > W_2$ হয়, অর্থাৎ বস্তুর ওজন যদি বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরলের ওজন অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে বস্তু তরলে ডুবে যাবে। বস্তুটি নিরেট হলে এক্ষেত্রে বস্তুর ঘনত্ব তরলের ঘনত্বের চেয়ে বেশি হয়।

খ) যদি $W_1 = W_2$ হয়, অর্থাৎ বস্তুর ওজন যদি বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরলের ওজনের সমান হয় তাহলে বস্তুটি তরলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে। বস্তুটি নিরেট হলে এক্ষেত্রে বস্তুর ঘনত্ব তরলের ঘনত্বের সমান।

গ) যদি $W_1 < W_2$ হয়, অর্থাৎ বস্তুর ওজন যদি বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরলের ওজনের চেয়ে কম হয় তাহলে বস্তুটি তরলে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসে। বস্তুটি নিরেট হলে এক্ষেত্রে বস্তুর ঘনত্ব তরলের ঘনত্বের চেয়ে কম।

চিত্র ৫.৮

তোমরা নিশ্চয়ই মৃত সাগরের (Dead Sea) নাম শুনেছো। এটা জর্ডানে অবস্থিত। লবণ ও অন্যান্য অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকার জন্য এই সাগরের পানির ঘনত্ব এত বেশি যে মানুষ সেখানে ডুবে না।

৫.৮ বাংলাদেশে নৌপথে দুর্ঘটনার কারণ

আমাদের দেশে প্রায়ই নৌ–দুর্ঘটনা ঘটে। একটা নৌযান যখন তৈরি করা হয় তখন তার আকৃতি ও আকার এমন হয় যে পানিতে ভাসালে ডুবন্ত অংশটুকু কর্তৃক অপসারিত পানির ওজন নৌযানের ওজনের সমান। এখন যত যাত্রী উঠবে তত নৌযানটি ভারী হবে এবং পানির মধ্যে ডুবতে থাকবে। ধারণ ক্ষমতার বেশি যাত্রী উঠলে সেটা ডুবে যাবে। যেহেতু নদীতে স্রোত থাকে, ঢেউ থাকে তাই ধারণক্ষমতার চেয়ে কমে কিছু কম যাত্রী নিয়ে বা আবহাওয়ার সতর্ক সংকেত অনুসরণ করে সতর্কতার সাথে নৌযান চালানো উচিত। নৌযানের ত্রুটিপূর্ণ নজার জন্যও অনেকসময় ভরকেন্দ্র পরিবর্তিত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। কখনো অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে নৌযানে উঠা ঠিক নয়।

৫.৯ বায়ুমণ্ডলের চাপ

Atmospheric pressure

এই পৃথিবী বায়ুমণ্ডল দ্বারা পরিব্যপ্ত। বায়ুমণ্ডলের ওজন আছে। তাই বায়ুমণ্ডলের চাপ আছে। পৃথিবী পৃষ্ঠে এই চাপ প্রতি বর্গমিটারে প্রায় 10^5 N। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহের ক্ষেত্রফল 1.5 m^2 ধরলে বায়ুমণ্ডল তার দেহের উপর 1.5×10^5 N বল প্রয়োগ করে। তবে মানুষের শরীরের ভিতরে রক্তের চাপ বাইরের এই চাপ অপেক্ষা সামান্য বেশি বলে মানুষ সাধারণত বায়ুর এই চাপ অনুভব করে না।

বায়ুমণ্ডল তার ওজনের জন্য ভূপৃষ্ঠে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে লম্বভাবে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করে তাকে ঐ স্থানের বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলে।

টরিসেলির পরীক্ষা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিমাপ

চিত্র ৫.৯

প্রায় এক মিটার লম্বা, একমুখ খোলা এবং সুষম ব্যাসযুক্ত পুরু কাচের নল নাও। নলটি বিশুদ্ধ পারদ দ্বারা পূর্ণ করে কাচনলের খোলামুখ আঙুল দিয়ে আটকিয়ে নলটিকে উল্টা করে একটি পারদপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ডুবাও (চিত্র ৫.৯)। এবার আঙুল সরিয়ে নলকে খাড়া করে রাখার ব্যবস্থা করলে দেখা যাবে পারদ কিছুদূর নেমে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে নলের ভিতরের পারদস্তম্ভ আপনা–আপনি দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বায়ুমণ্ডলীয় চাপের দরুন এরূপ হচ্ছে। পাত্রের পারদের উপর বায়ুমণ্ডল সর্বদা চাপ দিচ্ছে। এই চাপ পারদের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে নলের ভিতরে ঊর্ধ্বমুখে ক্রিয়া করে। এই চাপই নলের ভিতরে পারদস্তম্ভকে ধরে রাখে। এই চাপ না থাকলে অভিকর্ষের জন্য নলের ভিতরের পারদ নিচে নেমে আসত। সুতরাং বায়ুমণ্ডলীয় চাপ = নলের পারদস্তম্ভের চাপ। সাধারণ ক্ষেত্রে নলের ভিতর যে পারদস্তম্ভ থাকবে তার উচ্চতা প্রায় 76 cm অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের চাপ 76 cm উঁচু পারদস্তম্ভকে ধরে রাখতে সক্ষম। এভাবে তরল স্তম্ভের উচ্চতা ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিমাপ করা যায়।

কাচনলে যে পারদস্তম্ভ দাঁড়িয়ে থাকে তার উপর নলের বন্ধ প্রান্ত পর্যন্ত স্থান শূন্য। এই শূন্য স্থানকে টরিসেলির শূন্যস্থান বলে। এখানে সামান্য পারদ বাষ্প থাকে। বায়ুর চাপ পরিমাপ করার যন্ত্রকে ব্যারোমিটার বলে।

৫.১০ উচ্চতা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপ
Altitude and atmospheric pressure

বায়ুমণ্ডলীয় চাপ নির্ভর করে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা এবং বায়ুর ঘনত্বের উপর। ভূপৃষ্ঠে অর্থাৎ সমুদ্র সমতলে বায়ুর সাধারণ চাপ হলো 76 cm পারদস্তম্ভের চাপের সমান। ভূপৃষ্ঠের সমুদ্র সমতল থেকে যত উপরে উঠা যায় তত বায়ুস্তম্ভের ওজন এবং ঘনত্ব উভয়ই হ্রাস পায়। এজন্য উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুমন্ডলীয় চাপ কম হয়। এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গের উপরে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সমুদ্র সমতলের চাপের প্রায় 30%। সেজন্য বেশি উচ্চতায় উঠলে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়। আবার বেশি উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলীয় চাপের চেয়ে মানুষের রক্তচাপ বেশি থাকে বলে নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। আজকাল বিমান যখন বেশি উচ্চতায় নিম্নচাপ অঞ্চল দিয়ে উড়ে যায় তখন এর অভ্যন্তরে যাত্রীদের সুবিধার্থে স্বাভাবিক চাপ বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

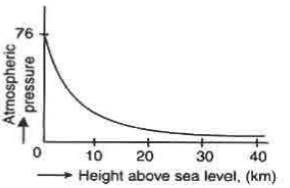

চিত্র ৫.১০

ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় তত বায়ুমণ্ডলীতে চাপ কম। উচ্চতার সাথে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিবর্তন লেখচিত্রে দেখানো হলো (চিত্র ৫.১০)।

৫.১১ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিবর্তন ও আবহাওয়া
Change in atmospheric pressure and weather

কোনো স্থানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিবর্তন ঘটে। এর কারণে বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি তথা বায়ুর ঘনত্বের পরিবর্তন হয়। আমরা বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিবর্তন বুঝতে পারি ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের উচ্চতার পরিবর্তন দেখে।

১. ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের উচ্চতা ধীরে ধীরে কমতে থাকলে বোঝা যাবে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ছে। কারণ জলীয় বাষ্প বায়ুর চেয়ে হালকা। এক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।

২. হঠাৎ যদি পারদস্তম্ভের উচ্চতা খুব কমে যায় তবে বুঝতে হবে চারদিকে বায়ুমণ্ডলের চাপ সহসা কমে গেছে এবং ঐ স্থানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। পার্শ্ববর্তী উচ্চচাপের স্থান থেকে প্রবল বেগে বায়ু ঐ নিম্নচাপের অঞ্চলে ছুটে আসবে। সুতরাং ঝড়ের সম্ভাবনা আছে।

৩. ব্যারোমিটারে পারদস্তম্ভের উচ্চতা ধীরে ধীরে বাড়লে বুঝতে হবে বায়ুমণ্ডল থেকে জলীয় বাষ্প অপসারিত হচ্ছে এবং শুষ্ক বাতাস সেই স্থান অধিকার করছে। সুতরাং আবহাওয়া শুষ্ক ও পরিষ্কার থাকবে। এভাবে বায়ুর চাপের পরিবর্তন ব্যারোমিটার দ্বারা নির্ণয় করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া যায়।

৫.১২ স্থিতিস্থাপকতা: পীড়ন ও বিকৃতি
Elasticity : stress and strain

সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি একটা রবারের ফিতা টানলে তা দৈর্ঘ্যে বেড়ে যায়। আবার টান ছেড়ে দিলে পুনরায় পূর্বের দৈর্ঘ্য ফিরে পায় বা ফিরে পেতে চেষ্টা করে। এখানে টানা অর্থ বল প্রয়োগ করা আর দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়া অর্থ বিকৃত হওয়া। মূলত যখনই কস্তু বিকৃত হয় তখনই কস্তুর ভিতরে একটা বাধাদানকারী বলের সৃষ্টি হয় যার জন্য পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে সচেষ্ট হয়।

বাহ্যিক বল প্রয়োগ করে কোনো বস্তুর আকার বা আয়তন বা উভয়ের পরিবর্তনের চেষ্টা করলে, যে ধর্মের জন্য বস্তুটি এই প্রচেষ্টাকে বাধা দেয় এবং বল অপসারিত হলে বস্তু তার পূর্বের আকার বা আয়তন ফিরে পায় সেই ধর্মকে স্থিতিস্থাপকতা বলে। যে সব পদার্থের এই ধর্ম আছে তাদেরকে স্থিতিস্থাপক পদার্থ বলে। তবে বলের একটি সীমা আছে, যার বেশি বল প্রয়োগ করলে বস্তু আর পূর্বের আকার ফিরে পায় না। এই সীমাকে স্থিতিস্থাপক সীমা বলে।

যখন স্থিতিস্থাপক বস্তুর উপর বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা হয় তখন বস্তুর অণুগুলো পরস্পর থেকে সরে যায়। তার ফলে বস্তুর দৈর্ঘ্য, আয়তন বা আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। একক দৈর্ঘ্যের বা একক আয়তনের এই পরিবর্তনকে বিকৃতি বলে। বাহ্যিক বলের প্রভাবে কোনো বস্তুর মধ্যে বিকৃতির সৃষ্টি হলে স্থিতিস্থাপকতার জন্য বস্তুর ভিতরে একটি প্রতিরোধ বলের উদ্ভব হয়। এই প্রতিরোধ বল বাহ্যিক বলকে বাধাদানের চেষ্টা করে। বস্তুর ভিতর একক ক্ষেত্রফলে লম্বভাবে উদ্ভূত এ প্রতিরোধকারী বলকে পীড়ন বলে। উল্লেখ্য যে বিকৃতির কোনো একক নেই। পীড়নের একক $N\ m^{-2}$।

হুকের সূত্র (Hooke's law) : বিজ্ঞানী রবার্ট হুক স্থিতিস্থাপকতার মূলসূত্রটি আবিষ্কার করেন। এই সূত্রানুসারে–

স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন বিকৃতির সমানুপাতিক।

গাণিতিকভাবে

$$\text{পীড়ন} \propto \text{বিকৃতি}$$

$$\therefore \quad \text{পীড়ন} = \text{ধ্রুবক} \times \text{বিকৃতি}$$

$$\text{বা,} \quad \frac{\text{পীড়ন}}{\text{বিকৃতি}} = \text{ধ্রুবক}$$

এই ধ্রুবকটিকে বস্তুর উপাদানের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক বলে। স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের এককও $N\ m^{-2}$।

৫.১৩ পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্ব

Molecular kinetic theory of matter

পদার্থের অণুগুলো গতিশীল অবস্থায় আছে, এই ধারণা ধরে নেওয়াই পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্বের মূল বিষয়। নিম্নবর্ণিত স্বীকার্যগুলোর উপর পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত:

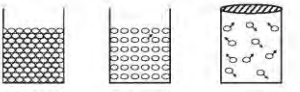

চিত্র ৫.১১

১. যেকোনো পদার্থ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত। এই কণাগুলোকে পদার্থের অণু বলে।

২. অণুগুলো এতো ক্ষুদ্র যে তাদেরকে কিদুবৎ বিবেচনা করা হয়।

৩. পদার্থের অণুগুলো সর্বদা গতিশীল।

৪. গ্যাসের ক্ষেত্রে অণুগুলো বেশ দূরে দূরে থাকে, এ জন্য তাদের মধ্যে কোনো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ করে না বললেই চলে। তরলের ক্ষেত্রে অণুগুলো কিছুটা দূরে দূরে থাকলেও তাদের মধ্যে আকর্ষণ বল কাজ করে এবং তরলকে পাত্রের আকারে ধারণ করতে বাধ্য করে। কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে অণুগুলো খুব কাছাকাছি থাকে এবং তাদের মাঝে তীব্র আকর্ষণ বল কাজ করে বিধায় কঠিন পদার্থের নিজস্ব আকার ও আয়তন থাকে।

৫. গ্যাস ও তরলের ক্ষেত্রে অণুগুলো এলোমেলো ছুটাছুটি করে এজন্য এরা পরস্পরের সাথে এবং পাত্রের দেয়ালের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

৫.১৪ পদার্থের প্লাজমা অবস্থা
Plasma state of matter

পদার্থের চতুর্থ অবস্থার নাম প্লাজমা। এই প্লাজমা হলো অতি উচ্চ তাপমাত্রায় আয়নিত গ্যাস। প্লাজমার বড় উৎস হচ্ছে সূর্য। তাছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রগুলোও প্লাজমার উৎস। প্রায় কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্লাজমা অবস্থার উৎপত্তি হয়। গ্যাসের ন্যায় প্লাজমার কোনো নির্দিষ্ট আকার বা আয়তন নেই। প্লাজমা কণাগুলো তড়িৎ আধান বহন করে তাই প্লাজমা তড়িৎ পরিবাহী হিসেবে কাজ করে। শিল্প কারখানার প্লাজমা টর্চ দিয়ে ধাতব পদার্থ কাটা হয়।

অনুসন্ধান ৫.১

কঠিন বস্তুর ঘনত্ব নির্ণয়

উদ্দেশ্য : যেকোনো আকারের কঠিন বস্তুর ঘনত্ব নির্ণয় করা।

যন্ত্রপাতি : মাপচোঙ, নিক্তি, যেকোনো আকারের কঠিন বস্তু

তত্ত্ব : কোনো কঠিন বস্তু যতটুকু স্থান দখল করে থাকে তাকে ঐ বস্তুর আয়তন বলে। আর বস্তুর একক আয়তনের ভরকে তার ঘনত্ব বলে।

কোনো কঠিন বস্তুকে তরল পদার্থে সম্পূর্ণ ডুবালে তার নিজের আয়তনের সমান তরল স্থানচ্যুত করে। কঠিন বস্তুকে পানিতে ডুবানোর পূর্বে ও পরে মাপচোঙের পানির উপরিভাগের পাঠ যথাক্রমে V_1 এবং V_2 হলে কঠিন বস্তুর আয়তন,

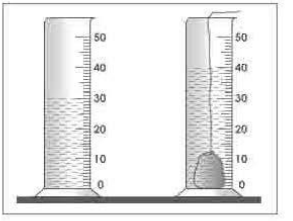

$V = (V_2 - V_1)$ ..... (1)

এখন বস্তুর ভর M হলে, এর ঘনত্ব,

$$d = \frac{M}{V} \quad \text{..... (2)}$$

কাজের ধারা :

১. একটি নিক্তির সাহায্যে পরীক্ষণীয় কঠিন বস্তুটির ভর নির্ণয় কর।

২. মাপচোঙের অর্ধেক পানি দ্বারা পূর্ণ করে পানির উপরিভাগের পাঠ নাও।

৩. কঠিন বস্তুটিকে সুতা দিয়ে বেধে সাবধানে চোঙের পানিতে ডুবাও যেন তা চোঙের তলায় অবস্থান করে। এই অবস্থায় পানি স্থির হলে এর উপরিভাগের পাঠ নাও।

৪. মাপচোঙে বিভিন্ন পরিমাণ পানি নিয়ে ২ ও ৩ নং প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করে পাঠ ছকে উপস্থাপন কর।

৫. প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে কঠিন বস্তুর আয়তন নির্ণয় করে 2 নং সমীকরণের সাহায্যে ঘনত্ব নির্ণয় কর।

বস্তুর ভর ও আয়তন নির্ণয়ের ছক:

পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	কঠিন বস্তুর ভর M gm	পানির উপরিভাগের পাঠ, বস্তুকে ডুবানোর পূর্বে V_1 cm^3	পানির উপরিভাগের পাঠ, বস্তুকে ডুবানোর পরে V_2 cm^3	কঠিন বস্তুর আয়তন $V = (V_2 - V_1)$ cm^3	গড় আয়তন V cm^3
১					
২					
৩					

হিসাব:

কঠিন বস্তুর আয়তন $V = (V_2 - V_1)\ \text{cm}^3 = \ldots\ldots \times 10^{-6}\ \text{m}^3$

কঠিন বস্তুর ঘনত্ব $d = \frac{M}{V} \times 10^3\ \text{kg m}^{-3}$

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

১। বায়ুচাপ পরিমাপের যন্ত্রের নাম কী ?

ক) থার্মোমিটার খ) ব্যারোমিটার

গ) ম্যানোমিটার ঘ) সিসমোমিটার

২। তরলের চাপের পরিমাণ কী হবে ?

ক) গভীরতার সমানুপাতিক খ) ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক

গ) ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক ঘ) অতিকর্ষীয় ত্বরণের সমান

৩। পদার্থের চতুর্থ অবস্থার নাম কী?

ক) গ্যাস খ) প্লাজমা

গ) কঠিন ঘ) তরল

চিত্র থেকে নিচের ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

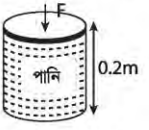

৪। পাত্রের নিম্নতলে কী পরিমাণ চাপ অনুভূত হবে ?

ক) 98 Pa খ) 980 Pa

গ) 196 Pa ঘ) 1960 Pa

৫। যদি পাত্রের মুখে F বল প্রয়োগ করা হয় তবে এ বল–

i. শুধুমাত্র পাত্রের তলায় চাপ প্রয়োগ করবে

ii. শুধুমাত্র পাত্রের বক্র তলে চাপ প্রয়োগ করবে

iii. পাত্রের সকল দিকে চাপ প্রয়োগ করবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

চিত্র দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

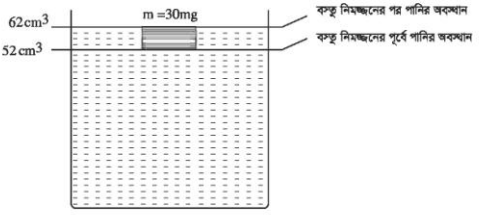

ক) ঘনত্ব কালে বলে ?

খ) চিত্রে বস্তুটির এভাবে ভেসে থাকার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ) বস্তুটির ঘনত্ব নির্ণয় কর।

ঘ) তরলের তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

গ. সাধারণ প্রশ্ন :

১। বল, চাপ ও ক্ষেত্রফলের সম্পর্ক কী?

২। ঘনত্ব কাকে বলে? এর একক কী?

৩। বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কাকে বলে?

৪। টরিসেলির শূন্যস্থান কি প্রকৃত পক্ষে শূন্য? ব্যাখ্যা কর।

৫। তরলের চাপ ও উচ্চতার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বস্তুর উপর তাপের প্রভাব

EFFECT OF HEAT ON SUBSTANCES

[তাপ এক প্রকার শক্তি যা পদার্থের অণুর গতির সাথে সম্পর্কিত। তাপমাত্রা হচ্ছে তাপশক্তি কোন দিকে প্রবাহিত হবে তার একটি নির্দেশক। তাপ প্রয়োগে বা অপসারণে কঠিন পদার্থের আকারের পরিবর্তন ঘটে, তরল পদার্থের আয়তন পরিবর্তিত হয় এবং বায়বীয় পদার্থের আয়তন ও চাপের পরিবর্তন ঘটে। তাপ প্রয়োগে বা অপসারণে পদার্থ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। বস্তুর উপর তাপের এ সকল প্রভাব এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।]

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১. তাপ ও তাপমাত্রা ব্যাখ্যা করতে পারব।
২. পদার্থের তাপমাত্রিক ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
৩. ফারেনহাইট, সেলসিয়াস এবং কেলভিন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
৪. বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধির সাপেক্ষে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করতে পারব।
৫. পদার্থের তাপীয় প্রসারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
৬. কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল এবং আয়তন প্রসারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
৭. তরলের আপাত এবং প্রকৃত প্রসারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
৮. আপেক্ষিক তাপ ও তাপধারণ ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
৯. তাপ পরিমাপের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
১০. পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনে তাপের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
১১. গলন, বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন ব্যাখ্যা করতে পারব।
১২. গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
১৩. গলনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
১৪. স্ফুটন ও বাষ্পায়ন ব্যাখ্যা করতে পারব।
১৫. গলনের এবং বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ ব্যাখ্যা করতে পারব।
১৬. বাষ্পায়ন শীতলীকরণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
১৭. বাষ্পায়নের উপর নিয়ামকের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।

৬.১ তাপ ও তাপমাত্রা
Heat and temperature

তাপ

তাপ হলো এক প্রকার শক্তি যা ঠান্ডা ও গরমের অনুভূতি জাগায়। তাপ উষ্ণতর বস্তু থেকে শীতলতর বস্তুর দিকে প্রবাহিত হয়। সুতরাং উষ্ণতার পার্থক্যের জন্য যে শক্তি এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে প্রবাহিত হয় তাকে তাপ বলে।

পদার্থের অণুগুলো সব সময় গতিশীল অবস্থায় থাকে। তাই এদের গতিশক্তি আছে। কোনো পদার্থের মোট তাপের পরিমাণ এর মধ্যস্থিত অণুগুলোর মোট গতিশক্তির সমানুপাতিক। কোনো বস্তুতে তাপ প্রদান করা হলে অণুগুলোর গতি বেড়ে যায় ফলে গতিশক্তিও বেড়ে যায়।

তাপের একক : SI পদ্ধতিতে তাপের একক হলো জুল (J)। পূর্বে তাপের একক হিসাবে ক্যালরি (Cal) ব্যবহৃত হতো। ক্যালরি এবং জুলের মধ্যে সম্পর্ক হলো $1\ \text{cal} = 4.2\ \text{J}$।

কাজ : টেবিলে রক্ষিত তিনটি পাত্রে A, B, C দেখো দাও। পাত্রগুলোর A তে কক্ষ তাপমাত্রার পানি এবং C তে বেশ গরম পানি (তবে তোমার হাতে সহনীয়) নাও। B তে খানিকটা গরম ও কক্ষ তাপমাত্রার পানি মেশাও। এবার A পাত্রে তোমার ডান হাত এবং C পাত্রে বাম হাত ডুবাও। এক মিনিট পর হাত দুইটি উঠাও এবং একসাথে দুই হাত B পাত্রে ডুবাও। এবার তোমার দুই হাতের অনুভূতি কী ?

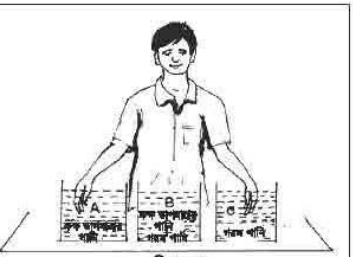

চিত্র: ৬.১

যদিও C পাত্রে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পানি আছে তবুও ডান হাতে গরম এবং বাম হাতে ঠান্ডা অনুভূত হবে। কারণ ডান হাত আগে যে পানির মধ্যে ডুবানো ছিল তার চেয়ে B পাত্রের পানির তাপমাত্রা বেশি। অনুরূপভাবে বাম হাতে ঠান্ডা অনুভূত হবে কারণ বাম হাত আগে যে পানির মধ্যে ডুবানো ছিল তার চেয়ে B পাত্রের পানির তাপমাত্রা কম।

তাপমাত্রা

তাপমাত্রা হচ্ছে কোনো বস্তুর এমন এক তাপীয় অবস্থা যা নির্ধারণ করে ঐ বস্তুটি অন্য বস্তুর তাপীয় সংস্পর্শে এলে বস্তুটি তাপ হারাবে না গ্রহণ করবে।

তাপমাত্রাকে তরলের মুক্ত তলের উচ্চতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আমরা জানি উচ্চতর তল থেকে তরল সর্বদা নিম্নতর তলের দিকে প্রবাহিত হয়। চিত্রে A পাত্রের তরলের উচ্চতা B পাত্রের তরলের উচ্চতার চেয়ে বেশি। কিন্তু A পাত্রে তরলের পরিমাণ কম এবং B পাত্রে তরলের পরিমাণ বেশি। স্টপ কর্ক S খুলে দিলে A পাত্র থেকে B পাত্রে তরল প্রবাহিত হতে থাকবে যতক্ষণ না উভয় পাশে তরলের উচ্চতা সমান হয়। তেমনিভাবে তাপীয় সংযোগ স্থাপন করলে উষ্ণতর বস্তু থেকে শীতলতর বস্তুতে তাপ প্রবাহিত হয় যতক্ষণ না উভয়ের তাপমাত্রা সমান হয়।

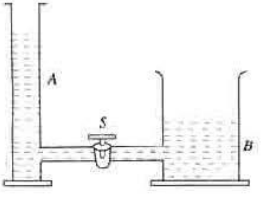

চিত্র: ৬.২

যে বস্তুর তাপমাত্রা বেশি সে তাপ হারায় আর যে বস্তুর তাপমাত্রা কম সে তাপ গ্রহণ করে। তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্রের নাম থার্মোমিটার।

তাপমাত্রার একক: আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে তাপমাত্রার একক কেলভিন (K)।

কেলভিন : যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে পানি তিন অবস্থাতেই অর্থাৎ বরফ, পানি এবং জলীয় বাষ্পরূপে অবস্থান করে তাকে পানির ত্রৈধবিন্দু (Triple Point) বলে। এই ত্রৈধবিন্দুর তাপমাত্রা 273 K ধরা হয়। পানির ত্রৈধবিন্দুর তাপমাত্রার $\frac{1}{273.16}$ ভাগ কে এক কেলভিন (1 K) বলে।

৬.২ পদার্থের তাপমাত্রিক ধর্ম
Thermometric properties of matter

তাপমাত্রা পরিমাপের ক্ষেত্রে পদার্থের বিশেষ বিশেষ ধর্মকে কাজে লাগানো হয়। তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য পদার্থের যে ধর্ম নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয় এবং এই পরিবর্তন লক্ষ করে সহজ ও সূক্ষ্মভাবে তাপমাত্রা নিরূপন করা যায় সেই ধর্মকেই পদার্থের তাপমাত্রিক ধর্ম বলে। ঐ পদার্থকে তাপমাত্রিক পদার্থ বলে। থার্মোমিটারের মধ্যে তাপমাত্রিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

তাপমাত্রিক ধর্মগুলো হচ্ছে পদার্থের আয়তন, রোধ, চাপ ইত্যাদি। পারদ থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে কাচের কৈশিক নলের ভিতরে রক্ষিত পারদকে তাপমাত্রিক পদার্থ এবং পারদ দৈর্ঘ্যকে তাপমাত্রিক ধর্ম বলা হয়। একইভাবে গ্যাস থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে ধ্রুব আয়তনে পাত্রে রক্ষিত গ্যাসকে তাপমাত্রিক পদার্থ এবং গ্যাসের চাপকে তাপমাত্রিক ধর্ম বলা হয়।

৬.৩ সেলসিয়াস, ফারেনহাইট ও কেলভিন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক
Relation among Celsius, Farenheit and Kelvin scale

কোনো বস্তুর তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্দেশ করার জন্য তাপমাত্রার একটি স্কেল প্রয়োজন। তাপমাত্রার স্কেল তৈরির জন্য দুইটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে স্থির ধরে নেওয়া হয়।এই তাপমাত্রা দুইটিকে স্থিরাঙ্ক বলে। স্থিরাঙ্ক দুইটি– নিম্নস্থিরাঙ্ক ও উর্ধ্বস্থিরাঙ্ক। প্রমাণ চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ বরফ গলে পানি হয় অথবা বিশুদ্ধ পানি জমে বরফ হয় তাকে নিম্নস্থিরাঙ্ক বলে। একে হিমাঙ্ক বা বরফ বিন্দুও বলে। আবার প্রমাণ চাপে ফুটন্ত বিশুদ্ধ পানি যে তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় তাকে উর্ধ্বস্থিরাঙ্ক বলে। উর্ধ্বস্থিরাঙ্ককে স্ফুটনাঙ্ক বা বাষ্পবিন্দুও বলে। স্থিরাঙ্ক দুইটির মধ্যবর্তী তাপমাত্রার ব্যবধানকে মৌলিক ব্যবধান বলে। মৌলিক ব্যবধানকে নানাভাবে ভাগ করে তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেল তৈরি করা হয়েছে।তাপমাত্রার প্রচলিত স্কেল তিনটি : সেলসিয়াস, ফারেনহাইট ও কেলভিন।

সেলসিয়াস, ফারেনহাইট ও কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রার একক যথাক্রমে ^{0}C, ^{0}F এবং K। সেলসিয়াস স্কেলে নিম্নস্থিরাঙ্ক 0^0 C, ফারেনহাইট স্কেলে 32^0 F এবং কেলভিন স্কেলে 273 K। উর্ধ্বস্থিরাঙ্ক সেলসিয়াস স্কেলে 100^0 C, ফারেনহাইট স্কেলে 212^0 F এবং কেলভিন স্কেলে 373 K ।

তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন :
নিম্নস্থিরাঙ্ক *A* এবং উর্ধ্বস্থিরাঙ্ক *B* চিহ্নিত একটি থার্মোমিটার নেওয়া হলো (চিত্র ৬.৩)। তারপর সেলসিয়াস, ফারেনহাইট ও কেলভিন স্কেলে দাগাঙ্কিত আরো তিনটি থার্মোমিটার পাশাপাশি রাখা হলো। *AB* থার্মোমিটারের *P* অবস্থানের পাঠ অপর তিনটি স্কেলে যথাক্রমে C, F এবং K।

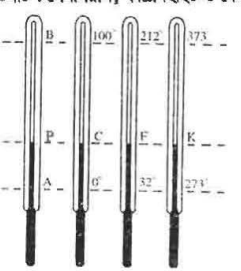

চিত্র ৬.৩

সুতরাং এই তিন স্কেলে PA দূরত্ব যথাক্রমে C-0, F-32 এবং K-273। আবার $\frac{PA}{BA}$ ধ্রুবক হওয়ায় লেখা যায়,

$$\frac{PA}{BA}=\frac{C-0}{100-0}=\frac{F-32}{212-32}=\frac{K-273}{373-273}$$

বা, $\frac{C}{100}=\frac{F-32}{180}=\frac{K-273}{100}$

বা, $\frac{C}{5}=\frac{F-32}{9}=\frac{K-273}{5}$ (6.1)

সমীকরণ (6.1) সেলসিয়াস,ফারেনহাইট ও কেলভিন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে।

তবে সেলসিয়াস ও কেলভিন স্কেলের সহজ সম্পর্ক হলো– সেলসিয়াস স্কেলের পাঠের সাথে 273 যোগ করলে কেলভিন স্কেলে পাঠ পাওয়া যায়। যেমন 1^0C তাপমাত্রা = (1+273) K = 274 K তাপমাত্রা।

তবে তাপমাত্রার পার্থক্য 1^0C হলে সেটা 1K এর সমান হবে।

গাণিতিক উদাহরণ ৬.১ : সুস্থ মানুষের দেহের তাপমাত্রা 98.4^0 F। সেলসিয়াস স্কেলে এই তাপমাত্রা কত হবে?

দেওয়া আছে,
ফারেনহাইট স্কেলে তাপমাত্রা,
$F=98.4^0$ F
সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা, $C=?$

আমরা জানি

$$\frac{C}{5}=\frac{F-32}{9}$$

বা $\frac{C}{5}=\frac{98.4-32}{9}$

বা $C=36.89^0$ C

উত্তর : 36.89^0 C

কাজ: শ্রেণি কক্ষের তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেলে পরিমাপ করে ফারেনহাইট ও কেলভিন স্কেলে প্রকাশ কর।

৬.৪ বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ শক্তি

Rise of temperature and internal energy of a body

পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা জানি যে, পদার্থের অণুগুলো সর্বদা গতিশীল। কঠিন পদার্থের অণুগুলো একস্থানে থেকে এদিক-ওদিক স্পন্দিত হয়। তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলো এলোমেলোভাবে ছুটাছুটি করে। অণুগুলোর এই গতির জন্য গতিশক্তির সঞ্চার হয়। আবার কঠিন পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ বল আছে বলে বিভবশক্তি আছে। গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ বল নেই বলে বিভবশক্তি নেই। পদার্থের অণুগুলোর গতিশক্তি ও বিভবশক্তির সমষ্টিকে অভ্যন্তরীণ শক্তি বলে। স্পষ্টত অভ্যন্তরীণ শক্তির এক অংশ গতিশক্তি অপর অংশ বিভবশক্তি। কোনো বস্তুতে তাপীয় শক্তি প্রদান করলে তার অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়ে। তবে অভ্যন্তরীণ শক্তির গতিশক্তি অংশটুকু শুধুমাত্র তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটায়।

৬.৫ পদার্থের তাপীয় প্রসারণ

Thermal expansion of a substance

প্রায় সকল পদার্থই তাপ প্রয়োগে প্রসারিত হয় আর তাপ অপসারণে সংকুচিত হয়। যখন কোনো কস্তু উত্তপ্ত হয়, তখন কস্তুটির প্রত্যেক অণুর তাপশক্তি তথা গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। কঠিন পদার্থের বেলায় আন্তঃআণবিক বলের বিপরীতে অণুগুলো আরো বর্ধিত শক্তিতে স্পন্দিত হতে থাকে ফলে সাম্যাবস্থা থেকে অণুগুলোর সরণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কোনো অণু এর সাম্যাবস্থা থেকে সরে যাবার সময় টান অনুভব করে। অর্থাৎ, অণুটি যখন পার্শ্ববর্তী অণুর কাছাকাছি যেতে চায় তখন বিকর্ষণ অনুভব করে। আবার আন্তঃআণবিক দূরত্ব যখন বৃদ্ধি পায় তখন আকর্ষণ অনুভব করে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে কঠিন কস্তুর অণুগুলো স্পন্দিত হতে থাকে তবে তা সরল ছন্দিত স্পন্দন নয়। এর কারণ, দুই অণুর মধ্যে দূরত্ব সাম্যাবস্থার তুলনায় যদি কমে যায় তাহলে বিকর্ষণ বল দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এদের মধ্যে দূরত্ব সাম্যাবস্থার তুলনায় বৃদ্ধি পেলে আকর্ষণ বল তত দ্রুত বৃদ্ধি পায় না।ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবার ফলে কঠিন কস্তুর মধ্যে অণুগুলো যখন কাঁপতে থাকে তখন একই শক্তি নিয়ে ভিতর দিকে যতটা সরে আসতে পারে, বাইরের দিকে তার চেয়ে বেশি সরে যেতে পারে। এর ফলে প্রত্যেক অণুর গড় সাম্যাবস্থান বাইরের দিকে সরে যায় এবং কস্তুটি প্রসারণ লাভ করে।তরল পদার্থের বেলায় আন্তঃআণবিক বলের প্রভাব কম বলে তাপের কারণে এর প্রসারণ বেশি হয়। বায়বীয় পদার্থের বেলায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে অণুগুলোর ছুটাছুটি বৃদ্ধি পায়। তাপীয় প্রসারণ গ্যাসীয় পদার্থে সবচেয়ে বেশি, তরলে তার চেয়ে কম এবং কঠিন পদার্থে সবচেয়ে কম।

৬.৬ কঠিন পদার্থের প্রসারণ

Expansion of solids

তাপ প্রয়োগ করলে কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল এবং আয়তন বৃদ্ধি পায়।

কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ ও দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ

কঠিন কস্তুতে তাপ প্রয়োগ করলে নির্দিষ্ট দিকে দৈর্ঘ্য বরাবর যে প্রসারণ হয় তাকে কস্তুটির দৈর্ঘ্য প্রসারণ বলে।

ধরা যাক, θ_1 তাপমাত্রায় কোনো দন্ডের দৈর্ঘ্য l_1, তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে θ_2 হলে শেষ দৈর্ঘ্য l_2,

দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি = $l_2 - l_1$

এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি = $\theta_2 - \theta_1$

দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ α দ্বারা প্রকাশ করা হয় যার রাশিমালা

$$\alpha = \frac{l_2 - l_1}{l_1(\theta_2 - \theta_1)} \qquad (6.2)$$

$$= \frac{\text{দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি}}{\text{আদি দৈর্ঘ্য} \times \text{তাপমাত্রার বৃদ্ধি}}$$

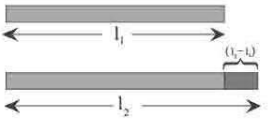

চিত্র ৬.৪

6.2 নং সমীকরণে যদি আদি দৈর্ঘ্য $l_1 = 1$m এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি

$\theta_2 - \theta_1 = 1$ K হয় তবে,

$\alpha = l_2 - l_1 =$ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি

সুতরাং 1 m দৈর্ঘ্যের কোনো কঠিন পদার্থের দন্ডের তাপমাত্রা 1 K বৃদ্ধির ফলে যতটুকু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় তাকে ঐ দন্ডের উপাদানের দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ বলে। এর একক K^{-1}। তামার দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ $16.7 \times 10^{-6}\ K^{-1}$ বলতে বুঝায় যে 1 m দৈর্ঘ্যের তামার দন্ডের তাপমাত্রা 1 K বৃদ্ধি করলে এর দৈর্ঘ্য 16.7×10^{-6} m বৃদ্ধি পায়।

গাণিতিক উদাহরণ ৬.২ : 20^0C তাপমাত্রায় একটি ইস্পাতের দণ্ডের দৈর্ঘ্য 100 m। 50^0 C তাপমাত্রায় এর দৈর্ঘ্য 100.033 m হলে ইস্পাতের দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ নির্ণয় কর।

আমরা জানি, দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ, $\alpha = \frac{l_2 - l_1}{l_1(\theta_2 - \theta_1)}$

$= \frac{0.033 \text{ m}}{100 \text{ m} \times 30\text{K}}$

$= 11 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

দেওয়া আছে,

আদি দৈর্ঘ্য, $l_1 = 100$ m

শেষ দৈর্ঘ্য, $l_2 = 100.033$ m

আদি তাপমাত্রা, $\theta_1 = 20°C$

শেষ তাপমাত্রা, $\theta_2 = 50°C$

তাপমাত্রা বৃদ্ধি, $\theta_2 - \theta_1 = 30K$

দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, $l_2 - l_1 = 0.033$m

দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ, α = ?

পর্যবেক্ষণ: রেল লাইনে যেখানে দুইটি লোহার বার মিলিত হয় সেখানে ফাঁক থাকে কেন?

রৌদ্রের তাপে ও চাকার ঘর্ষণে লোহা উত্তপ্ত হয়ে প্রসারিত হয়। এই প্রসারণের সুবিধার জন্য ফাঁক রাখা হয়। ফাঁক না থাকলে প্রসারণের জন্য রেল লাইন বেঁকে যাবে।

চিত্র: ৬.৫

ক্ষেত্র প্রসারণ ও ক্ষেত্র প্রসারণ সহগ

একটি কঠিন বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে এর ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায়। একে ক্ষেত্র প্রসারণ বলে। ধরা যাক θ_1 তাপমাত্রায় কোনো কঠিন পদার্থের পৃষ্ঠের আদি ক্ষেত্রফল A_1 তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে θ_2 করলে শেষ ক্ষেত্রফল A_2

সুতরাং তাপমাত্রা বৃদ্ধি= $\theta_2 - \theta_1$

ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি= $A_2 - A_1$

ক্ষেত্র প্রসারণ সহগকে β দ্বারা প্রকাশ করা হয় যার রাশিমালা

$$\beta = \frac{A_2 - A_1}{A_1(\theta_2 - \theta_1)} \qquad (6.3)$$

$$= \frac{\text{ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি}}{\text{আদি ক্ষেত্রফল} \times \text{তাপমাত্রার বৃদ্ধি}}$$

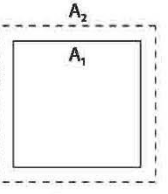

চিত্র: ৬.৬

6.3 নং সমীকরণে যদি আদি ক্ষেত্রফল A_1= 1 m^2 এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি $(\theta_2 - \theta_1)$ = 1 K হয় তবে

$\beta = A_2 - A_1$= ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি।

সুতরাং 1 m^2 ক্ষেত্রফলের কোনো কঠিন পদার্থের তাপমাত্রা 1 K বৃদ্ধির ফলে যতটুকু ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায় তাকে ঐ বস্তুর উপাদানের ক্ষেত্র প্রসারণ সহগ বলে। এর একক K^{-1}।

তামার ক্ষেত্র প্রসারণ সহগ 33.4 × 10^{-6} K^{-1} বলতে বুঝায় যে 1 m^2 ক্ষেত্রফলের কোনো তামা খণ্ডের তাপমাত্রা 1 K বৃদ্ধি করলে তার ক্ষেত্রফল 33.4 × 10^{-6} m^2 বৃদ্ধি পায়।

আয়তন প্রসারণ ও আয়তন প্রসারণ সহগ

কোনো কঠিন পদার্থের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে এর আয়তন বৃদ্ধি পায়। একে আয়তন প্রসারণ বলে।

ধরা যাক, কোনো কঠিন পদার্থের আদি আয়তন V_1 এবং আদি তাপমাত্রা θ_1। এর তাপমাত্রা বাড়িয়ে যখন θ_2 করা হলো তখন আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে V_2 হলো। সুতরাং আয়তন বৃদ্ধি = $V_2 - V_1$। তাপমাত্রা বৃদ্ধি= $\theta_2 - \theta_1$। আয়তন প্রসারণ সহগকে γ দ্বারা প্রকাশ করা হয় যার রাশিমালা নিম্নরূপ,

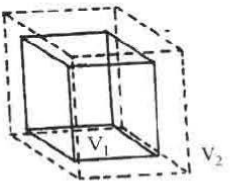

চিত্র: ৬.৭

$$\gamma = \frac{V_2 - V_1}{V_1(\theta_2 - \theta_1)} \qquad (6.4)$$

$$= \frac{\text{আয়তন বৃদ্ধি}}{\text{আদি আয়তন} \times \text{তাপমাত্রার বৃদ্ধি}}$$

6.4 নং সমীকরণে যদি আদি আয়তন $V_1 = 1\ m^3$ এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি $\theta_2 - \theta_1 = 1\ K$ হয় তবে

$\gamma = V_2 - V_1 =$ আয়তন বৃদ্ধি।

সুতরাং $1\ m^3$ আয়তনের কোনো কঠিন পদার্থের তাপমাত্রা 1 K বৃদ্ধির ফলে যতটুকু আয়তন বৃদ্ধি পায় তাকে ঐ বস্তুর উপাদানের আয়তন প্রসারণ সহগ বলে।

তামার আয়তন প্রসারণ সহগ $50.1 \times 10^{-6}\ K^{-1}$ বলতে বুঝায় $1\ m^3$ আয়তনের তামার তাপমাত্রা 1 K বৃদ্ধি করলে আয়তন $50.1 \times 10^{-6}\ m^3$ বৃদ্ধি পাবে।

এদের মধ্যে সম্পর্ক :

$\gamma = 3\alpha$ এবং $\beta = 2\alpha$

৬.৭ তরল পদার্থের প্রসারণ
Expansion of liquid

তরল পদার্থের নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য বা ক্ষেত্রফল নেই। তবে নির্দিষ্ট আয়তন আছে। তরলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে এর আয়তন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তরলের প্রসারণ বলতে তরলের আয়তন প্রসারণকেই বোঝায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে সকল তরল সমান হারে বৃদ্ধি পায় না। একই তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য সমআয়তনের বিভিন্ন তরল পদার্থের প্রসারণ বিভিন্ন হয়।

পরীক্ষা

লম্বা নলযুক্ত সমআয়তনের ও সমআকারের কয়েকটি কাচের বাল্ব নেওয়া হলো। এতে সমআয়তন পানি, অ্যালকোহল, কেরোসিন,ইথার প্রভৃতি কয়েকটি তরল নেওয়া হলো (চিত্র : ৬.৮)। এবার একটি অপেক্ষাকৃত বড় পাত্রে কক্ষ তাপমাত্রার পানি নিয়ে তার মধ্যে এই বাল্বগুলোকে উলম্বভাবে স্থাপন করা হলো। সব কটি বাল্বের মধ্যে তরলের উপরিতল একই থাকবে। এখন পাত্রে কিছু গরম পানি ঢালা হলো। কিছুক্ষণ পর যখন বাল্বগুলো উচ্চ তাপমাত্রা প্রাপ্ত হবে তখন দেখা যাবে বাল্বের নলে তরলের উপরিতল একই উচ্চতায় নেই, বিভিন্ন নলে তরলের উচ্চতা বিভিন্ন। এ থেকে বোঝা যায় যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সমআয়তনের বিভিন্ন তরলের আয়তন প্রসারণ বিভিন্ন হয়।

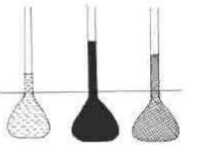
চিত্র: ৬.৮

৬.৮ তরলের প্রকৃত ও আপাত প্রসারণ
Real and apparent expansion of liquid

তরলকে সর্বদা কোনো পাত্রে রেখে উত্তপ্ত করতে হয়। তাপ প্রয়োগ করলে তরল ও পাত্র উভয়েরই প্রসারণ ঘটে। এই কারণে তরলের যে প্রসারণ আমরা লক্ষ করি তা তার প্রকৃত প্রসারণ নয় – আপাত প্রসারণ। সুতরাং তরলের প্রসারণ দুই প্রকার : ক) প্রকৃত প্রসারণ ও খ) আপাত প্রসারণ

প্রকৃত প্রসারণ : তরলকে কোনো পাত্রে না রেখে (যদি সম্ভব হয়) তাপ দিলে তার যে আয়তন প্রসারণ হতো তাকে তরলের প্রকৃত প্রসারণ বলে। তবে তা সম্ভব নয় ফলে পাত্রের প্রসারণ বিবেচনা করে প্রকৃতই তরলের যেটুকু প্রসারণ ঘটে তাই প্রকৃত প্রসারণ। একে V_r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

আপাত প্রসারণ : কোনো পাত্রে তরল রেখে তাপ দিলে তরলের যে আয়তন প্রসারণ দেখতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ পাত্রের প্রসারণ বিবেচনায় না এনে তরলের যে প্রসারণ পাওয়া যায় তাকে তরলের আপাত প্রসারণ বলে। একে V_a দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

প্রকৃত প্রসারণ ও আপাত প্রসারণের মধ্যে সম্পর্ক

একটা দাগ কাটা সরু নলবিশিষ্ট কাচের বাল্ব নিয়ে তার A দাগ পর্যন্ত কোনো তরল দ্বারা পূর্ণ করা হলো। এখন তরল স্তম্ভের দিকে লক্ষ রেখে বাল্বটিকে গরম করলে দেখা যাবে যে, তরলের উপরিতল A থেকে B দাগ পর্যন্ত নেমে আসে। তারপর আবার B দাগ থেকে শুরু করে A দাগ অতিক্রম করে C দাগ পর্যন্ত উঠে। এর কারণ তাপ প্রয়োগে প্রথমে বাল্বটির আয়তন বৃদ্ধি পায়। যার জন্য তরল A থেকে B তে নেমে যায়। পরে তরল যেই গরম হয় সেই তার আয়তন বৃদ্ধি শুরু হয় এবং B থেকে C পর্যন্ত উঠে। কঠিন পদার্থের চেয়ে তরলের প্রসারণ বেশি বিধায় এরূপ ঘটে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে তরল প্রথমে A দাগ পর্যন্ত ছিল এবং সবশেষে C দাগে উঠেছে। তাই CA হলো আপাত প্রসারণ। CB হলো প্রকৃত প্রসারণ এবং AB হলো পাত্রের প্রসারণ। একে V_g দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

চিত্র থেকে দেখা যায় যে,

$CB = CA + AB$

বা প্রকৃত প্রসারণ = আপাত প্রসারণ + পাত্রের প্রসারণ

$$V_r = V_a + V_g \qquad (6.5)$$

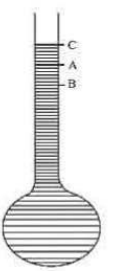

চিত্র ৬.৯

৬.৯ তাপধারণ ক্ষমতা ও আপেক্ষিক তাপ
Thermal capacity and specific heat

তাপধারণ ক্ষমতা

কোনো বস্তুর অন্তর্নিহিত তাপের পরিমাণ বস্তুটির ভর, উপাদান ও তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে।

কোনো বস্তুর তাপমাত্রা এক একক বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে ঐ বস্তুর তাপধারণ ক্ষমতা বলে। তাপধারণ ক্ষমতা বস্তুর উপাদান এবং ভরের উপর নির্ভরশীল।

ধরা যাক, কোনো বস্তুর তাপমাত্রা $\Delta\theta$ বাড়াতে Q পরিমাণ তাপ লাগে। সুতরাং এক একক তাপমাত্রা বাড়াতে তাপ লাগে $\frac{Q}{\Delta\theta}$।

সুতরাং তাপধারণ ক্ষমতা, $C = \frac{Q}{\Delta\theta}$ (6.6)

তাপধারণ ক্ষমতার একক JK^{-1}।

আপেক্ষিক তাপ

একক ভরের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা এক একক বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে ঐ বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ বলে।

m ভরের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা $\Delta\theta$ বাড়াতে যদি Q তাপের প্রয়োজন হয় তবে একক ভরের ঐ বস্তুর তাপমাত্রা এক একক বাড়াতে $\frac{Q}{m\Delta\theta}$ তাপের প্রয়োজন হয় সুতরাং, আপেক্ষিক তাপ $S = \frac{Q}{m\Delta\theta}$ (6.7)

আপেক্ষিক তাপের একক $J\ kg^{-1}\ K^{-1}$

পদার্থ	আপেক্ষিক তাপ ($J\ kg^{-1}\ K^{-1}$)
পানি	4200
বরফ	2100
জলীয় বাষ্প	2000
সীসা	130
তামা	400
রুপা	230

6.7 সমীকরণ থেকে দেখা যায়,

$Q = ms\Delta\theta$ (6.8)

অর্থাৎ গৃহিত তাপ বা বর্জিত তাপ = ভর × আপেক্ষিক তাপ × তাপমাত্রার পার্থক্য

আপেক্ষিক তাপ ও তাপধারণ ক্ষমতার সম্পর্ক

যেহেতু $\frac{Q}{\Delta\theta}$ হচ্ছে তাপধারণ ক্ষমতা C, (6.7) সমীকরণ থেকে দেখা যায় আপেক্ষিক তাপ

$S = \frac{Q}{m\Delta\theta} = \frac{C}{m}$

অর্থাৎ, আপেক্ষিক তাপ= $\frac{\text{তাপধারণ ক্ষমতা}}{\text{ভর}}$

সুতরাং বস্তুর একক ভরের তাপধারণ ক্ষমতাকে তার উপাদানের আপেক্ষিক তাপ বলে।

৬.১০ তাপ পরিমাপের মূলনীতি

Fundamental principle of measurement of heat

ভিন্ন তাপমাত্রার দুইটি বস্তুকে তাপীয় সংস্পর্শে আনা হলে তাদের মধ্যে তাপের আদানপ্রদান হয়। যে বস্তুর তাপমাত্রা বেশি সে তাপ বর্জন করবে আর যে বস্তুর তাপমাত্রা কম সে তাপ গ্রহণ করবে। তাপের এই গ্রহণ ও বর্জন চলতে থাকবে যতক্ষণ না সকল বস্তুর তাপমাত্রা সমান হয়।

যদি গ্রহণ ও বর্জনের সময় কোনো তাপ নষ্ট না হয়, তবে বেশি তাপমাত্রার বস্তুগুলো যে পরিমাণ তাপ বর্জন করবে কম তাপমাত্রার বস্তুগুলো সেই পরিমাণ তাপ গ্রহণ করবে।

অর্থাৎ মোট বর্জিত তাপ = মোট গৃহিত তাপ (6.9)

এটাই তাপ পরিমাপের মূলনীতি।

৬.১১ পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনে তাপের প্রভাব
Effect of heat on change of state

পদার্থ তিনটি অবস্থায় থাকতে পারে। যেমন– কঠিন, তরল ও বায়বীয়। পানির তিনটি অবস্থা আমরা সকলেই জানি– বরফ, পানি ও জলীয়বাষ্প। এ তিনটি অবস্থাকে যথাক্রমে কঠিন, তরল ও বায়বীয় বলা হয়। পানির এই অবস্থাগুলো নির্ভর করে বায়ুচাপ ও তাপমাত্রার উপর।

কোনো কঠিন পদার্থকে তাপ প্রয়োগ করে তরলে পরিণত করা যায়, একে গলন বলে। প্রথমে তাপ দিলে বস্তুর তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে তাপ প্রয়োগ করলেও বস্তুর তাপমাত্রা বাড়ে না। এ সময়ে যে তাপ বস্তু শোষণ করে তা দ্বারা কঠিন পদার্থটি তরলে পরিণত হয়। 0^0C তাপমাত্রার নিচের বরফকে তাপ দিতে থাকলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে $0°C$ –এ আসবে। এরপর তাপ দিলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে না কিন্তু বরফ গলে 0^0C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত হতে থাকবে। কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তরের সময় পদার্থ যে তাপ শোষণ করে তা তার আন্তঃআণবিক বন্ধন ভাঙতে কাজ করে।

0^0C তাপমাত্রার উক্ত পানিকে আরও তাপ প্রয়োগ করলে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। আবার এক পর্যায়ে এসে পানি যখন জলীয়বাষ্পে পরিণত হতে থাকে তখন আর তাপমাত্রা বাড়ে না। এই সময় পানি তাপ শোষণ করে বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এক্ষেত্রেও তরলের আন্তঃআণবিক বন্ধন ভাঙতে তাপের প্রভাব বিদ্যমান। বিপরীতক্রমে বায়বীয় পদার্থ থেকে তাপ অপসারণ করে তাকে প্রথমে তরলে এবং তরল থেকে তাপ অপসারণ করে তাকে কঠিনে পরিণত করা যায়। সুতরাং পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনে তাপের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

৬.১২ গলন, বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন
Fusion, vaporization and condensation

গলন

তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থকে তরলে পরিণত করাকে গলন বলে। যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থ গলতে শুরু করে সেই তাপমাত্রাকে গলনাঙ্ক বলে। সমস্ত পদার্থ না গলা পর্যন্ত এই তাপমাত্রা স্থির থাকে।

বাষ্পীভবন

পদার্থের তরল অবস্থা থেকে বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত হওয়ার ঘটনাকে বাষ্পীভবন বলে। এই বাষ্পীভবন দুইটি পদ্ধতিতে হতে পারে–

(i) বাষ্পায়ন (Evaporation) ও
(ii) স্ফুটন (Boiling)

বাষ্পায়ন:

যেকোনো তাপমাত্রায় তরলের শুধুমাত্র উপরিতল থেকে ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বাষ্পায়ন বলে।

কর্মকাণ্ড: একটি বাটিতে কিছুটা পানি নিয়ে তোমার ঘরের এক কোণে রেখে দাও। দুই একদিন পরে দেখ পানির কী হয়েছে? দেখা যাবে বাটির পানি কমে গেছে এই পানি কমার কারণ কী?

ঘরের তাপমাত্রাতেও পানি জলীয়বাষ্পে পরিণত হয়েছে। তাই পানি কমে গেছে। এটাই বাষ্পায়ন।

স্ফুটন : তাপ প্রয়োগে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তরলের সকল স্থান থেকে দ্রুত বাষ্পে পরিণত হওয়ার ঘটনাকে স্ফুটন বলে। যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো তরলের স্ফুটন হয়, তাকে ঐ তরলের স্ফুটনাঙ্ক বলে। স্ফুটনাঙ্কের মান চাপের উপর নির্ভর করে।

পরীক্ষা: যদি কিছু পরিমাণ পানি পাত্রে নিয়ে গরম কর, দেখা যাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পানি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফুটতে শুরু করেছে এবং জলীয় বাষ্পে রূপান্তরিত হচ্ছে এটাই স্ফুটন। সুতরাং বোঝা গেল তরল যেকোনো তাপমাত্রায় বায়বীয় অবস্থায় যেতে পারে আবার স্ফুটনাঙ্কের তাপমাত্রায়ও বায়বীয় অবস্থায় যেতে পারে।

ঘনীভবন : উষ্ণতার হ্রাস ঘটিয়ে কোনো পদার্থের বায়বীয় অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ঘনীভবন বলে।

৬.১৩ গলনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব
Effect of pressure on boiling points

নিজে করে দেখো : দুই টুকরো বরফকে এক সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণ জোরে চেপে ধরে ছেড়ে দাও। কী দেখতে পাচ্ছ? টুকরা দুইটি জোড়া লেগে গিয়েছে। কেন?

বরফ টুকরা দুইটির স্পর্শতলে চাপ পড়ায় সেখানে গলনাঙ্ক কমে যায় অর্থাৎ গলনাঙ্ক 0°C এর চেয়ে কম হয়। কিন্তু স্পর্শতলের উষ্ণতা 0°C থাকে। তাই স্পর্শতলের বরফ গলে যায়। গলার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ বরফ থেকে সংগৃহীত হবে। চাপ অপসারণ করলে গলনাঙ্ক পুনরায় 0°C হয়। তাই স্পর্শতলের বরফ গলা পানি জমে বরফে পরিণত হয়। এই কারণে চাপ প্রয়োগ করলে দুই টুকরা বরফ এক টুকরায় পরিণত হয়। চাপ দিয়ে কঠিন বস্তুকে তরলে পরিণত করে ও চাপ হ্রাস করে আবার কঠিন অবস্থায় আনাকে পুনঃশিলীভবন বলে।

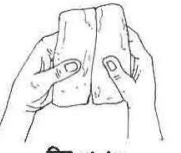
চিত্র : ৬.১০

পদার্থের উপর চাপের হ্রাস–বৃদ্ধির জন্য গলনাঙ্ক পরিবর্তিত হয়। চাপের জন্য গলনাঙ্ক পরিবর্তন দুইভাবে হতে পারে।

- কঠিন থেকে তরলে রূপান্তরের সময় যেসব পদার্থের আয়তন হ্রাস পায় (যেমন বরফ), চাপ বাড়লে তাদের গলনাঙ্ক কমে যায় অর্থাৎ কম তাপমাত্রায় গলে।
- কঠিন থেকে তরলে রূপান্তরের সময় যেসব পদার্থের আয়তন বেড়ে যায় (যেমন মোম), চাপ বাড়লে তাদের গলনাঙ্ক বেড়ে যায় অর্থাৎ বেশি তাপমাত্রায় গলে।

৬.১৪ গলনের সুপ্ততাপ ও বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ
Latent heat of fusion and latent heat of vaporisation

গলনের সুপ্ততাপ: আমরা জানি, তাপ প্রয়োগের ফলে কঠিন পদার্থের তাপমাত্রা যখন গলনাঙ্কে পৌঁছায় তখন সম্পূর্ণ পদার্থ তরলে রূপান্তরিত হওয়া পর্যন্ত তাপমাত্রার আর পরিবর্তন হয় না। এখানে যে পরিমাণ তাপ কঠিন পদার্থকে তরল অবস্থায় রূপান্তর করল তাই গলনের সুপ্ততাপ।

এই তাপ বস্তুর তাপমাত্রার পরিবর্তন করে না কিন্তু আন্তঃআণবিক বন্ধন শিথিল করতে ব্যয় হয়।

বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ: তরল পদার্থকে তাপ প্রয়োগ করতে থাকলে যখন তাপমাত্রা স্ফুটনাঙ্কে চলে আসে তখন যতই তাপ প্রয়োগ করা হোক না কেন সম্পূর্ণ তরল বাষ্পে রূপান্তরিত হওয়া পর্যন্ত তাপমাত্রা স্থির থাকে। এখানে যে পরিমাণ তাপ তরল পদার্থকে বাষ্পীয় অবস্থায় রূপান্তর করল তাই বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ।

বাষ্পায়নে শীতলতার উদ্ভব: গরমের দিনে নতুন মাটির কলসিতে পানি রাখলে ঐ পানি ঠান্ডা হয়। মাটির কলসির গায়ে অসংখ্য ছিদ্র থাকে ঐ ছিদ্র দিয়ে সর্বদা পানি চুইয়ে বাহিরে আসে ও বাষ্পে পরিণত হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় সুপ্ততাপ কলসির পানি সরবরাহ করে এবং ঠান্ডা হয়।

কাচ বা পিতলের পাত্রে পানি রাখলে তা ঠান্ডা হয় না। কারণ, ঐ পাত্রের গায়ে ছিদ্র থাকে না এবং বাষ্পায়নের কোনো সুযোগ সৃষ্টি হয় না।

এবার বল তোমার দেহ থেকে যখন ঘাম বের হয়; তখন পাখার বাতাসে ঠান্ডা অনুভূত হয় কেন?

৬.১৫ বিভিন্ন বিষয়ের উপর বাষ্পায়নের নির্ভরশীলতা
Dependence of evaporation on various factors

নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর বাষ্পায়ন নির্ভর করে :

বায়ু প্রবাহ : তরলের উপর বায়ু প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে বাষ্পায়ন দ্রুত হয়।

তরলের উপরিতলের

ক্ষেত্রফল : তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল যত বেশি হয়, বাষ্পায়ন তত দ্রুত হয়।

তরলের প্রকৃতি : বিভিন্ন তরলের বাষ্পায়নের হার বিভিন্ন। তরলের স্ফুটনাঙ্ক কম হলে বাষ্পায়নের হার বেশি হয়। উদ্বায়ী তরলের বাষ্পায়নের হার সর্বাধিক।

তরলের উপর চাপ : তরলের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ বাড়লে বাষ্পায়নের হার কমে যায়। চাপ কমলে বাষ্পায়নের হার বাড়ে। শূন্যস্থানে বাষ্পায়নের হার সর্বাধিক।

তরল ও তরল সংলগ্ন

বায়ুর উষ্ণতা : তরল ও তরল সংলগ্ন বায়ুর উষ্ণতা বাড়লে বাষ্পায়ন দ্রুত হয়।

বায়ুর শুষ্কতা : তরল পদার্থের উপরিতলের বাতাস যত শুষ্ক হবে, অর্থাৎ বায়ুতে যত কম পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকবে বাষ্পায়ন তত দ্রুত হবে। শীতকালে বায়ু শুষ্ক থাকে বলে ভিজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায়।

অনুসন্ধান নং ৬.১

বরফের গলনাঙ্ক নির্ণয়।

উদ্দেশ্য : বরফের গলন পর্যবেক্ষণ এবং গলনাঙ্কের সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক নির্ণয় ও লেখচিত্র অঙ্কন।

যন্ত্রপাতি: সেলসিয়াস থার্মোমিটার, বরফ, স্ট্যান্ড, বার্নার, বিকার, স্টপওয়াচ।

কার্যপদ্ধতি : ১. কিছু বরফ নিয়ে চূর্ণ করে একটি বিকারে রাখ।

২. থার্মোমিটারকে সতর্কতার সাথে বরফ চূর্ণের মধ্যে ডুবাও যাতে বাল্বটি বরফের মধ্যে থাকে কিন্তু বিকারের গায়ে না লাগে।

৩. তাপ প্রয়োগ করে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

৪. প্রতি মিনিটে তাপমাত্রা রেকর্ড কর যতক্ষণ পর্যন্ত সব বরফ না গলে যায়।

৫. উপরের নিয়মে বরফ সম্পূর্ণ গলে পানি হবার পরও তাপ দিতে থাকো যতক্ষণ না তাপমাত্রা $20^{\circ}C$-$25^{\circ}C$ হয়। প্রতি মিনিটে তাপমাত্রা লিপিবদ্ধ কর।

৬. প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে তাপমাত্রা বনাম সময় লেখচিত্র অঙ্কন কর।

৭. লেখচিত্র বা গ্রাফ থেকে বরফের গলনাঙ্ক বের কর।

৮. লেখচিত্রের প্রকৃতি আলোচনা কর।

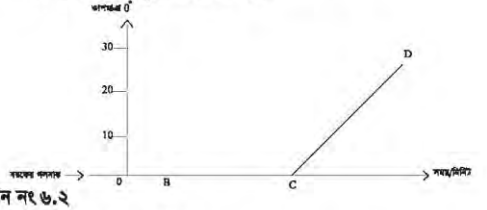

অনুসন্ধান নং ৬.২

পরীক্ষার নাম: পানির স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়।

উদ্দেশ্য : পানির স্ফুটন পর্যবেক্ষণ এবং স্ফুটনাঙ্কের সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক নির্ণয় করা।

যন্ত্রপাতি: থার্মোমিটার, বার্নার, বিকার, স্টপ ওয়াচ।

কার্যপদ্ধতি: ১. একটি বিকারে কক্ষ তাপমাত্রার পানি নাও এবং বিকারের পানিতে থার্মোমিটারটি এমনভাবে স্থাপন কর যেন বাল্বটি বিকারের গায়ে না লাগে।

২. বার্নারের সাহায্যে পানিতে তাপ দাও এবং ১ মিনিট পরপর পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি রেকর্ড কর।

৩. লক্ষ কর পানির তাপমাত্রা $100^{\circ}C$ হওয়ার পর আর যতই তাপ বৃদ্ধি করছ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

৪. প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে তাপমাত্রা–সময় লেখচিত্র অঙ্কন কর।

৫. লেখচিত্র থেকে পানির স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয় কর।

৬. লেখচিত্রের প্রকৃতি আলোচনা কর।

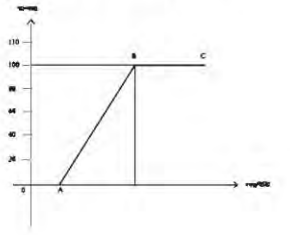

তাপমাত্রা বনাম সময় লেখচিত্রে (Graph) অঙ্কন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

১। রেল লাইন নির্মাণের সময় দুইটি রেল যেখানে মিলিত হয় সেখানে একটু ফাঁকা রাখা হয় কেন ?
ক. লোহা সাশ্রয় করার জন্য।
খ. গ্রীষ্মকালে রেললাইনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হ্রাস করার জন্য।
গ. রেলগাড়ি চলার সময় খট খট শব্দ করার জন্য।
ঘ. তাপীয় প্রসারণের জন্য রেল লাইনের বিকৃতি পরিহার করার জন্য।

২। ঘর্মাক্ত দেহে পাখার বাতাস আরাম দেয় কেন ?
ক. পাখার বাতাস গায়ের ঘাম বের হতে দেয় না তাই
খ. বাষ্পায়ন শীতলতার সৃষ্টি করে তাই
গ. পাখার বাতাস শীতল জলীয় বাষ্প ধারণ করে তাই
ঘ. পাখার বাতাস সরাসরি লোমকূপ দিয়ে শরীরে ঢুকে যায় তাই।

৩। সুপ্ততাপের মাধ্যমে –
i. বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়।
ii. বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন হয়।
iii. বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চিত্রের সাহায্যে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

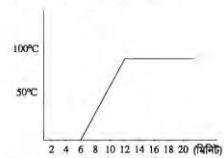

বরফ গলনের লেখচিত্র

৪। সম্পূর্ণ বরফ গলতে কত সময় লেগেছিল ?
ক. 2 মিনিট খ. 4 মিনিট
গ. 6 মিনিট ঘ. 8 মিনিট

৫। গলিত পানির তাপমাত্রা স্ফুটনাঙ্কে পৌছাতে প্রয়োজনীয় সময় কত মিনিট
ক. 6 খ. 8
গ. 12 ঘ. 18

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দুইটি বৈদ্যুতিক খুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব 30 m। খুটি দুইটির সাথে 30.001m দৈর্ঘ্যের তামার তার যেদিন সংযোগ দেওয়া হয় ঐ দিন বায়ুর তাপমাত্রা ছিল 30^{o} C । তামার দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ 16.7×10^{-6} K^{-1}। শীতকালে যেদিন বায়ুর তাপমাত্রা 4^{o} C হলো সেদিন তারটি ছিড়ে গেল।
ক. পানির ত্রৈধবিন্দুর সংজ্ঞা দাও।
খ. দুইটি বস্তুর তাপ সমান হলেও এদের তাপমাত্রা ভিন্ন হতে পারে কি? ব্যাখ্যা কর।
গ. বায়ুর তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট স্কেলে প্রকাশ কর।
ঘ. তারটি ছিড়ে যাবার কারণ গাণিতিক যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম অধ্যায়

তরঙ্গ ও শব্দ

WAVES AND SOUND

[পুকুরের পানিতে ঢিল ছুড়লে আমরা তরঙ্গ দেখতে পাই। তরঙ্গ শক্তিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বয়ে নিয়ে যায়। শব্দ এক প্রকার তরঙ্গ। শব্দ শক্তি আমাদেরকে শ্রবণের অনুভূতি জাগায়। শব্দের মাধ্যমেই আমরা তথ্য প্রেরণ করতে পারি। তাই শব্দ আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার শব্দ দূষণ আমাদের মারাত্মক ক্ষতি করে। এই অধ্যায়ে আমরা তরঙ্গ, শব্দ, শব্দের প্রতিধ্বনি, শব্দের বেগ, শব্দ দূষণ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করব।]

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১. তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
২. তরঙ্গসংশ্লিষ্ট রাশিসমূহের মধ্যে সরল গাণিতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং পরিমাপ করতে পারব।
৩. শব্দ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
৪. প্রতিধ্বনি সৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে পারব।
৫. দৈনন্দিন জীবনে প্রতিধ্বনির ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
৬. শব্দের বেগ, কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের গাণিতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তা থেকে রাশিসমূহ পরিমাপ করতে পারব।
৭. শব্দের বেগের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারব।
৮. শ্রাব্যতার সীমা ও এদের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
৯. শব্দের পীচ ও তীক্ষ্ণতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
১০. শব্দ দূষণের কারণ ও ফলাফল এবং প্রতিরোধের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।

৭.১ তরঙ্গ
Waves

পুকুরের স্থির পানিতে একটি ঢিল ছুড়ে মারা হলো। ঢিলটি যখন পানিতে আঘাত করে তখন ঐ স্থানের পানির কণাগুলো আন্দোলিত হয়। এই আন্দোলিত কণাগুলো পার্শ্ববর্তী স্থির কণাগুলোকে আন্দোলিত করে। এভাবে কণা হতে কণাতে স্থানান্তরিত হয়ে আন্দোলন অবশেষে পুকুরের কিনারায় গিয়ে পৌঁছায়। পানির কণাগুলো শুধু উপর নিচে উঠানামা করে কিন্তু সামনের দিকে অগ্রসর হয় না। প্রত্যেক কণার এই ধরনের গতির ফলে যে পর্যায়বৃত্ত আন্দোলন পানির উপর দিয়ে চলে যায় তাকেই তরঙ্গ বলে। পানিতে আন্দোলনের কারণে পানির কণাসমূহে যে যান্ত্রিক শক্তির সৃষ্টি হয় তা কম্পনের মাধ্যমে একস্থান হতে অন্যস্থানে সঞ্চালিত হয়। সুতরাং তরঙ্গ দ্বারা শক্তি একস্থান থেকে অন্যস্থানে সঞ্চালিত হয়।

চিত্র: ৭.১

যে পর্যায়বৃত্ত আন্দোলন কোনো জড় মাধ্যমের একস্থান থেকে অন্যস্থানে শক্তি সঞ্চালিত করে কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলোকে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করে না তাকে তরঙ্গ বলে।

কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় মাধ্যমে যে তরঙ্গের উদ্ভব হয় তা যান্ত্রিক তরঙ্গ। পানির তরঙ্গ,শব্দ তরঙ্গ প্রভৃতি যান্ত্রিক তরঙ্গ। যান্ত্রিক তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের প্রয়োজন। আর এক ধরনের তরঙ্গ আছে যা সঞ্চালনের জন্য কোনো মাধ্যম লাগে না। এরা হলো তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ।

উল্লেখ্য যে বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা শুধুমাত্র যান্ত্রিক তরঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো। এখানে তরঙ্গ বলতে স্থিতিস্থাপক মাধ্যমে সৃষ্ট তরঙ্গকে বুঝবো।

তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ

১. মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দন গতির ফলে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় কিন্তু কণাগুলোর স্থায়ী স্থানান্তর হয় না।
২. যান্ত্রিক তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন।
৩. তরঙ্গ একস্থান থেকে অন্যস্থানে শক্তি সঞ্চালন করে।
৪. তরঙ্গের বেগ মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।
৫. তরঙ্গের প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও উপরিপাতন ঘটে।

তরঙ্গের প্রকারভেদ

তরঙ্গ দুই প্রকার: ১) অনুপ্রস্থ তরঙ্গ ২) অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ।

কাজ : চিত্রের ন্যায় একটা লম্বা দড়ি নাও। দড়ির একপ্রান্ত একটি শক্ত অবলম্বনের সাথে আটকাও। অপর প্রান্ত ধরে হাত উপর-নিচে বা ডানে-বামে সঞ্চালন কর।

দড়িতে এবার ৭.২ চিত্রের ন্যায় একটি তরঙ্গের সৃষ্টি হবে। লক্ষ কর হাতের সঞ্চালন বা কম্পনের দিক উপর-নিচ বা ডানে-বামে কিন্তু তরঙ্গের গতির দিক অনুভূমিক। এখানে কম্পনের দিক তরঙ্গের গতির দিকের সাথে আড়াআড়ি বা প্রস্থ বরাবর। এই তরঙ্গই হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যে তরঙ্গ কম্পনের দিকের সাথে লম্বভাবে অগ্রসর হয় তাকে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলে। পানির তরঙ্গ অনুপ্রস্থ তরঙ্গের উদাহরণ।

চিত্র: ৭.২

চিত্র ৭.৩

একটি স্প্রিংকে ৭.৩ চিত্রের ন্যায় আটকানো হলো। এবার আমরা উক্ত স্প্রিংটির মুক্ত প্রান্ত ধরে চিত্রের ন্যায় সামনে–পিছে হাত সঞ্চালন করি। হাত সামনের দিকে নিলে স্প্রিং–এ একটি সংকোচন প্রবাহের সৃষ্টি হবে আবার হাত পিছনের দিকে নিলে একটি প্রসারণ প্রবাহের সৃষ্টি হবে। সংকোচন ও প্রসারণ প্রবাহ সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এখানে হাতের সঞ্চালন বা কম্পন যেদিকে তরঙ্গও সেই দিকে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ এখানে কম্পনের দিক এবং তরঙ্গের গতির দিক পরস্পর সমান্তরাল বা একই। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যে তরঙ্গ কম্পনের দিকের সাথে সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয় তাকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলে। বায়ু মাধ্যমে শব্দের তরঙ্গ অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের উদাহরণ।

অনুপ্রস্থ তরঙ্গের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিন্দুকে তরঙ্গশীর্ষ ও তরঙ্গপাদ বলে। অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গে অনুরূপ রাশি হচ্ছে সংকোচন ও প্রসারণ।

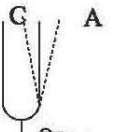

চিত্র ৭.৪

৭.২ তরঙ্গসংশ্লিষ্ট রাশি
Wave related quantities

পূর্ণ স্পন্দন : তরঙ্গের উপরস্থ কোনো কণা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে আবার একই দিক থেকে সেই বিন্দুতে ফিরে এলে তাকে একটি পূর্ণ স্পন্দন বলা হয়

পর্যায়কাল : যে সময় পরপর তরঙ্গের পুনরাবৃত্তি ঘটে। অর্থাৎ যে সময়ে তরঙ্গের উপরস্থ কোন কণার একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন হয় তাকে পর্যায়কাল বলে। পর্যায়কালকে T দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক সেকেন্ড (s)।

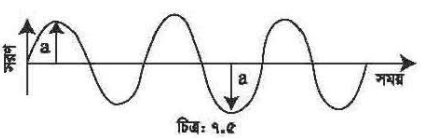

চিত্র: ৭.৫

কম্পাঙ্ক : প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাকে তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বলে। তরঙ্গ সৃষ্টি হয় কম্পনশীল বস্তু থেকে তাই কম্পনশীল বস্তুর কম্পাঙ্ক তরঙ্গের কম্পাঙ্কের সমান। কম্পাঙ্কের একক হার্জ (Hz)। স্পন্দনশীল কোনো বস্তুকণা এক সেকেন্ডে একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করলে তার কম্পাঙ্ককে 1 Hz বলে। একে f দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কালের সম্পর্ক হলো $f=\frac{1}{T}$

বিস্তার : তরঙ্গ সৃষ্টি হতে হলে মাধ্যমের কণাগুলোর সাম্যাবস্থানের দুই পাশে কম্পিত হতে হবে। সাম্যাবস্থান থেকে যেকোনো একদিকে তরঙ্গান্বিত কোন কণার সর্বাধিক সরণকে বিস্তার বলে। ৭.৫ চিত্রে a হলো বিস্তার।

দশা : কোনো একটি তরঙ্গায়িত কণার যেকোনো মুহূর্তের গতির সামগ্রিক অবস্থা প্রকাশক রাশিকে তার দশা বলে। গতির সামগ্রিক অবস্থা বলতে কণার গতির দিক, সরণ, বেগ,ত্বরণ ইত্যাদি বুঝায়। অনুপ্রস্থ তরঙ্গের ঊর্ধ্বচূড়াসমূহ বা নিম্নচূড়াসমূহ সর্বদা একই দশায় থাকে।
৭.৬ চিত্রে P এবং P' বা R ও R' অবস্থানের কণাগুলো একই দশায় আছে।

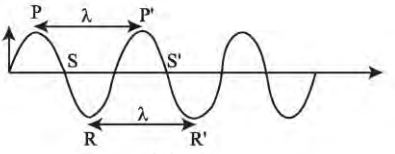

চিত্র ৭.৬

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য : তরঙ্গের উপরস্থ কোনো কণার একটি পূর্ণ কম্পনে যে সময় লাগে সেই সময়ে তরঙ্গ যেটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে। তরঙ্গের উপর একই দশায় আছে এমন পরপর দুইটি কণার মধ্যবর্তী দূরত্বই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে λ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এর একক মিটার (m)।

চিত্রে PP' বা RR' বা SS' দৈর্ঘ্য হলো তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ।

তরঙ্গ বেগ : নির্দিষ্ট দিকে তরঙ্গ এক সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ বেগ বলে।

৭.৩ তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সম্পর্ক

A few relations related to wave

কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কালের মধ্যে সম্পর্ক

আমরা জানি স্পন্দনশীল বস্তুকণা 1 সেকেন্ডে যতটা স্পন্দন সম্পন্ন করে তাকে কম্পাঙ্ক বলে। এই কম্পাঙ্ককে f দ্বারা সূচিত করা হয়। আবার পর্যায়কাল T হলে

T সেকেন্ডে স্পন্দনের সংখ্যা 1টি

1 সেকেন্ডে ,, ,, $\frac{1}{T}$ টি

1 সেকেন্ডের এই স্পন্দন সংখ্যাই কম্পাঙ্ক। সুতরাং কম্পনাঙ্ক $f = \frac{1}{T}$ (7.1)

তরঙ্গবেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক

আমরা জানি 1 সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণস্পন্দন সম্পন্ন হয় তাকে কম্পাঙ্ক বলে। আবার 1 টি পূর্ণ স্পন্দনের সময়ে তরঙ্গের অতিক্রান্ত দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে। সুতরাং তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ হলে,

1 টি পূর্ণ কম্পনের সময়ে তরঙ্গের অতিক্রান্ত দূরত্ব = λ

f টি পূর্ণ কম্পনের সময়ে তরঙ্গের অতিক্রান্ত দূরত্ব = $f\lambda$

যেহেতু কম্পাঙ্ক f তাই f টি পূর্ণ তরঙ্গ তৈরি হয় 1 সেকেন্ডে

সুতরাং 1 সেকেন্ডে তরঙ্গের অতিক্রান্ত দূরত্ব = $f\lambda$

এটাই তরঙ্গবেগ v। সুতরাং তরঙ্গ বেগ

$v = f\lambda$ (7.2)

গাণিতিক উদাহরণ ৭.১ : একটি বস্তু বাতাসে যে শব্দ সৃষ্টি করে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 20 cm। বাতাসে শব্দের বেগ 340 m s^{-1} হলে এর কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কাল বের কর।

আমরা জানি,

বেগ, $v = f\lambda$

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{340\ ms^{-1}}{0.2\ m} = 1700\ Hz$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1700\ s^{-1}} = 0.000588\ s$$

$$= 5.88 \times 10^{-4}\ s$$

নির্ণেয় কম্পাঙ্ক 1700 Hz ; পর্যায়কাল 5.88×10^{-4} s

দেওয়া আছে,
তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda = 20\ cm = 0.2\ m$
শব্দের বেগ, $v = 340\ ms^{-1}$
কম্পাঙ্ক, $f = ?$
পর্যায়কাল, $T = ?$

৭.৪ শব্দ তরঙ্গ

Sound wave

আমরা জানি শব্দ এক প্রকার শক্তি। এই শক্তি সঞ্চালিত হয় শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে। শব্দ তরঙ্গ হলো একটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। এই তরঙ্গ সঞ্চালনের সময় মাধ্যমের কণাগুলোর বা স্তরসমূহের সংকোচন ও প্রসারণের সৃষ্টি হয় (চিত্র ৭.৭)। মাধ্যম দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে এই শব্দতরঙ্গ আমাদের কানে এসে শ্রবণের অনুভূতি জাগায়। উল্লেখ্য যে উৎসের কম্পন ছাড়া শব্দের উৎপত্তি হয় না। সুরশলাকা, কাসার বাটি, স্কুলের ঘন্টা যখন বাজে তখন হাত দিয়ে আস্তে আস্তে স্পর্শ করলে বুঝতে পারবে যে ওটা কাঁপছে। যখন তুমি কথা বল তখন যদি তোমার কণ্ঠনালী স্পর্শ কর দেখবে তোমার কণ্ঠনালী কাঁপছে।

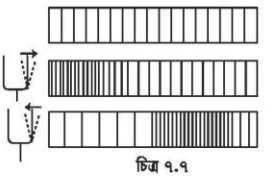

চিত্র ৭.৭

কর্মকাণ্ড : একটি কাঁসার বাটিতে পানি নাও। বাটিকে আঘাত কর। শব্দ শুনতে পাচ্ছো। পানিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউও দেখতে পাচ্ছো। এবার হাত দিয়ে বাটিটিকে ধরো। শব্দ কি এখন শুনতে পাচ্ছো? পানির ঢেউ কি আছে?

যতক্ষণ বাটিটি শব্দ সৃষ্টি করছিল ততক্ষণ সেটি কেঁপেছে তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। বাটিটির শব্দ থেমে গেলে তার কম্পনও থেমে গেছে আর ঢেউও থেমে গেছে। সুতরাং বোঝা গেল কম্পমান বস্তু শব্দ সৃষ্টি করে। কিন্তু কোনো বস্তু কাঁপলেই যে আমরা সেই শব্দ শুনতে পারবো এমন কোনো কথা নেই। শব্দের উৎস ও শ্রোতার মাঝে একটি জড় মাধ্যম থাকতে হবে এবং উৎসের কম্পাঙ্ক $20H_z$ থেকে $20{,}000H_z$ এর মধ্যে হতে হবে।

চিত্র: ৭.৮

শব্দ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য

কোনো বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং সঞ্চালনের জন্য স্থিতিস্থাপক জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। তাই শব্দকে একটি যান্ত্রিক তরঙ্গ বলা হয়। এই তরঙ্গের প্রবাহের দিক এবং কম্পনের দিক একই বলে এটি একটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। শব্দ তরঙ্গের বেগ মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। বায়বীয় মাধ্যমে এর বেগ কম, তরলে তার চেয়ে বেশি, কঠিন পদার্থে আরো বেশি। শব্দের তীব্রতা তরঙ্গের বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক। অর্থাৎ তরঙ্গের বিস্তার বেশি হলে শব্দের তীব্রতা বেশি হবে। শব্দ তরঙ্গের প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও উপরিপাতন সম্ভব। শব্দের বেগ মাধ্যমের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার উপরও নির্ভরশীল।

৭.৫ প্রতিধ্বনি
Echo

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে শব্দ করলে কিছুক্ষণ পর সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি শোনার অভিজ্ঞতা হয়তো আমাদের অনেকেরই আছে। পাহাড় বা দালানের কাছে জোরে শব্দ করলে অনুরূপ ঘটনা ঘটে। বড় খালি ঘরের একপ্রান্তে ধ্বনি করলে কিছুক্ষণ পর ঠিক সেই শব্দ শোনা যায়। এসব ঘটনা শব্দের প্রতিফলনের জন্য ঘটে।

যখন কোনো শব্দ মূল শব্দ থেকে আলাদা হয়ে মূল শব্দের পুনরাবৃত্তি করে, তখন ঐ প্রতিফলিত শব্দকে প্রতিধ্বনি বলে। সহজ কথায় প্রতিফলনের জন্য ধ্বনির পুনরাবৃত্তিকে প্রতিধ্বনি বলে।

প্রতিফলকের নূন্যতম দূরত্ব

কোনো ক্ষণস্থায়ী শব্দ বা ধ্বনি কানে শোনার পর সেই শব্দের রেশ প্রায় $\frac{1}{10}$ সেকেন্ড যাবৎ আমাদের মস্তিষ্কে থেকে যায়। একে শব্দানুভূতির স্থায়ীত্বকাল বলে। এই $\frac{1}{10}$ সেকেন্ডের মধ্যে অন্য শব্দ কানে এসে পৌঁছালে তা আমরা আলাদা করে শুনতে পাই না। সুতরাং কোনো ক্ষণস্থায়ী শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে হলে প্রতিফলককে উৎস থেকে এমন দূরত্বে রাখতে হবে যাতে মূল শব্দ প্রতিফলিত হয়ে কানে ফিরে আসতে অন্তত $\frac{1}{10}$ সেকেন্ড সময় নেয়। যদি 0^0C তাপমাত্রায় বায়ুতে শব্দের বেগ 332 ms^{-1} ধরা হয় তাহলে $\frac{1}{10}$ সেকেন্ডে শব্দ 33.2 m যায়। সুতরাং প্রতিফলককে শ্রোতা থেকে কমপক্ষে $\frac{33.2}{2}$ m বা 16.6 m দূরত্বে রাখতে হবে।

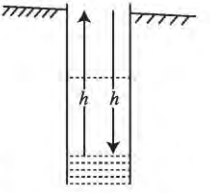

চিত্র: ৭.৯

এবার বল ছোট্ট ঘরে শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যায় না কেন?

৭.৬ প্রতিধ্বনির ব্যবহার
Uses of echo

কূপের গভীরতা নির্ণয় : প্রতিধ্বনির সাহায্যে খুব সহজে কূপের মধ্যে পানির উপরিতল কত গভীরে আছে তা নির্ণয় করা যায়। কূপের উপরে কোনো শব্দ উৎপন্ন করলে সেই শব্দ পানি পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলে প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এখন শব্দ উৎপন্ন করা ও সেই শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময় থামা ঘড়ির সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। ধরা যাক, পানি পৃষ্ঠের গভীরতা h,

শব্দ উৎপন্ন করা ও প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময় t,

শব্দের বেগ v,

এখন শব্দ উৎপন্ন হওয়ার পর পানি পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে শ্রোতার কাছে ফিরে আসতে যেহেতু $2h$ দূরত্ব অতিক্রম করে

অতএব, $2h = v \times t$

$$\text{বা } h = \frac{v \times t}{2} \tag{7.3}$$

কূপের পানি পৃষ্ঠের গভীরতা 16.6 মিটারের কম হলে, প্রতিধ্বনি ভিত্তিক এই পরীক্ষাটি করা সম্ভব হবে না।

একইভাবে ভূগর্ভের খনিজ পদার্থের সন্ধান লাভে এ পদ্ধতি ব্যবহার হচ্ছে।

বাদুরের পথচলা

শব্দের প্রতিধ্বনির সাহায্যেই বাদুর পথ চলে। বাদুর চোখে দেখে না। বাদুর শব্দোত্তর কম্পাঙ্কের শব্দ তৈরি করতে পারে আবার শুনতেও পারে।এই শব্দ আমরা শুনতে পাই না। বাদুর শব্দোত্তর কম্পাঙ্কের শব্দ তৈরি করে সামনে ছড়িয়ে দেয়। ঐ শব্দ কোনো প্রতিবন্ধকে বাধা পেয়ে আবার বাদুরের কাছে চলে আসে।ফিরে আসা শব্দ শুনে বুঝতে পারে যে সামনে কোনো বস্তু আছে কিনা। বাদুর এভাবে তার শিকারও ধরে। যদি বাধা পেয়ে শব্দ

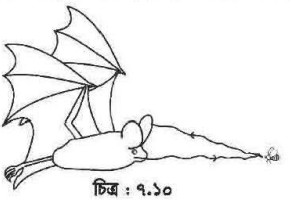

চিত্র : ৭.১০

ফিরে না আসে তবে বুঝতে পারে যে ফাঁকা জায়গা আছে, সেই পথ বরাবর সে উড়ে চলে। অনেক সময় বাদুর বৈদ্যুতিক তারের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়। ফলে সমান্তরাল দুই তারের মধ্য দিয়ে উড়ে চলার সময় যখনই ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তার (বা সক্রিয় ও নিরপেক্ষ তার) বাদুরের শরীরের মাধ্যমে সংযোগ পেয়ে যায় তখনই বাদুরের শরীরের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় আর সে মারা যায়। এজন্য মাঝেমধ্যে বৈদ্যুতিক তারে ঝুলন্ত মরা বাদুর দেখা যায়।

বাদুর প্রায় 1,00000 হার্জ কম্পাঙ্কের শব্দ তৈরি করতে ও শুনতে পারে।

৭.৭ শব্দের বেগের পরিবর্তন

Variation of velocity of sound

শব্দ উৎস থেকে আমাদের কানে শব্দ আসতে কিছুটা সময় নেয়। প্রতি সেকেন্ডে শব্দ যতটা পথ অতিক্রম করে তাকে শব্দের বেগ বলে। শব্দের বেগ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

মাধ্যমের প্রকৃতি : বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দের বেগ বিভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ বায়ু, পানি এবং লোহাতে শব্দের বেগ ভিন্ন ভিন্ন। 20^0C তাপমাত্রায় বায়ুতে শব্দের বেগ 344 m s^{-1}, পানিতে 1450 m s^{-1}, আর লোহায় 5130 m s^{-1}। সাধারণভাবে বলা যায় বায়ুতে শব্দের বেগ কম,তরলে তার চেয়ে বেশি আর কঠিন পদার্থে সবচেয়ে বেশি।

নিজেরা কর : দুইটি খালি টিনের কৌটা নাও। প্রায় বিশ মিটার লম্বা চিকন তার দ্বারা কৌটা দুইটিকে সংযুক্ত কর। তোমার বন্ধু একটা কৌটায় মুখ লাগিয়ে কথা বলছে। অপর কৌটায় তুমি কান লাগিয়ে সেই কথা শোনার চেষ্টা কর।

তুমি কি কথা শুনতে পারবে? হ্যাঁ শুনতে পারবে। কারণ এখানে শব্দ সঞ্চালিত হচ্ছে তার দ্বারা যা একটি কঠিন পদার্থ।

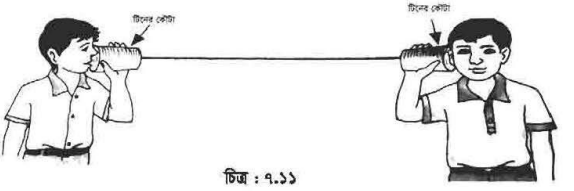

চিত্র : ৭.১১

তাপমাত্রা: বায়ুর তাপমাত্রা যত বাড়ে বায়ুতে শব্দের বেগও তত বাড়ে। এজন্য শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে শব্দের বেগ বেশি।

হিসাব করি : 20^0C তাপমাত্রায় বায়ুতে শব্দের বেগ 344 m s^{-1}। 0^0C তাপমাত্রায় বেগ 332 m s^{-1}। প্রতি 1^0C তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বায়ুতে শব্দের বেগ কতটুকু বৃদ্ধি পায়?

বায়ুর আর্দ্রতা : বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে শব্দের বেগ বৃদ্ধি পায়। এজন্য শুষ্ক বায়ুর চেয়ে ভেজা বায়ুতে শব্দের বেগ বেশি।

৭.৮ শ্রাব্যতার সীমা ও এদের ব্যবহার

Audibility range and its uses

আমরা জানি, বস্তুর কম্পন ছাড়া শব্দ উৎপন্ন হয় না। যদি কোনো বস্তু প্রতি সেকেন্ডে কমপক্ষে 20 বার কাঁপে তবে সেই বস্তু থেকে উৎপন্ন শব্দ শোনা যাবে। এভাবে আবার কম্পন যদি প্রতি সেকেন্ডে 20,000 বার এর বেশি হয় তাহলেও শব্দ শোনা যাবে না। সুতরাং আমাদের কানে যে শব্দ শোনা যায় তার কম্পাঙ্কের সীমা হলো 20 Hz থেকে 20,000 Hz। কম্পাঙ্কের এই পাল্লাকে শ্রাব্যতার পাল্লা (Audible Range) বলে। যদি কম্পাঙ্ক 20 Hz এর কম হয় তবে তাকে শব্দেতর (Infrasonic) কম্পন বলে। যদি কম্পাঙ্ক 20,000Hz এর বেশি হয় তবে তাকে শব্দোত্তর (Ultrasonic) কম্পন বলে। শব্দোত্তর কম্পাঙ্কের শব্দ মানুষে শুনতে না পেলেও বাদুর, কুকুর, মৌমাছির ন্যায় কিছু কিছু প্রাণী এ শব্দ উৎপন্ন করতে পারে আবার শুনতেও পারে।

শব্দোত্তর শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহার

সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়: সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ের জন্য SONAR নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। SONAR এর পুরো নাম Sound Navigation And Ranging।এই যন্ত্রে শব্দোত্তর কম্পাঙ্কের শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণের ব্যবস্থা আছে।

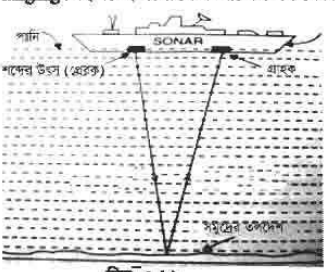

চিত্র: ৭.১২

পানির মধ্যে এই যন্ত্রের সাহায্যে শব্দোত্তর কম্পাঙ্কের শব্দ উৎপন্ন করে প্রেরণ করা হয়। এই শব্দ সমুদ্রের তলদেশে বাধা পেয়ে আবার উপরে উঠে আসলে গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহণ করা হয়। শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণের সময় রেকর্ড করে বিয়োগ করলে শব্দের ভ্রমণকাল বের করা যায়। ধরা যাক এই সময় t এবং সমুদ্রের গভীরতা d। যদি পানিতে শব্দের বেগ v হয় তবে,

$2d = v \times t$

$$\text{or, } d = \frac{v \times t}{2} \qquad (7.4)$$

শব্দ যাওয়া ও আসা মিলে $d + d = 2d$ পথ অতিক্রম করে। এখন শব্দের বেগ জেনে উপরের সমীকরণের সহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়।

কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা: আজকাল আধুনিক ওয়াশিং মেশিন বের হয়েছে যার দ্বারা সহজে কাপড় পরিষ্কার করা যায়। পানির মধ্যে সাবান বা গুড়ো সাবান মিশ্রিত করে কাপড় ভিজিয়ে রেখে সেই পানির মধ্যে শব্দোত্তর কম্পনের শব্দ প্রেরণ করা হয়। এই শব্দ কাপড়ের ময়লাকে বাইরে বের করে আনে এবং কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায়।

রোগ নির্ণয়ে : মানুষের দেহের অভ্যন্তরীণ ছবি এক্সরে দ্বারা যেমন তোলা যায় তেমন শব্দোত্তর কম্পনের শব্দের সাহায্যে ছবি তুলে রোগ নির্ণয় করা যায়। এই প্রক্রিয়ার নাম আল্ট্রাসনোগ্রাফি (Ultrasonography)। এই শব্দ দেহের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা হয় এবং প্রতিফলিত শব্দকে আলোক শক্তিতে রূপান্তর করে টেলিভিশনের পর্দায় ফেলা হয়। ফলে কোনো রোগ থাকলে ধরা পড়ে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে: দাঁতের স্কেলিং বা পাথর তোলার জন্য শব্দোত্তর কম্পনের শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিডনির ছোট পাথর ভেঙে গুড়া করে তা অপসারণের কাজেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য কাজে: ধাতব পিণ্ড বা পাতে সূক্ষ্মতম ফাটল অনুসন্ধানে,সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করার কাজে, ক্ষতিকর রোগজীবাণু ধ্বংসের কাজেও শব্দোত্তর কম্পনের শব্দ ব্যবহৃত হয়।

শব্দোত্তর কম্পাঙ্কের শব্দের ব্যবহার :

শব্দোত্তর কম্পনের সীমা হচ্ছে 1 Hz থেকে 20 Hz। এই কম্পনের শব্দ মানুষ শুনতে পায়না তবে কোনো কোনো জীবজন্তু শুনতে পায়। হাতি এই কম্পনের শব্দ দ্বারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। কোনোরূপ বিকৃতি ছাড়া এই শব্দ বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারে। ভূমিকম্প এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণের সময় এই শব্দোত্তর কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং প্রবল ঝাকুনির মাধ্যমে ধ্বংসে যজ্ঞ চালায়।

চিত্র: ৭.১৩

গাণিতিক উদাহরণ ৭.২ : নদীর এক পাড়ে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি হাততালি দিল। ঐ শব্দ নদীর অপর পাড় থেকে ফিরে এসে 1.5 s পর প্রতিধ্বনি শোনা গেল। ঐ সময় বায়ুতে শব্দের বেগ 340 m s^{-1} হলে নদীটির প্রশস্ততা কত?

সমাধান : ধরা যাক নদীর প্রশস্ততা d। সুতরাং আমরা পাই,

$$2d = v \times t$$

$$\text{অতএব } d = \frac{v \times t}{2}$$

$$= \frac{340 \text{ m s}^{-1} \times 1.5 \text{ s}}{2}$$

$$= 255 \text{ m}$$

সুতরাং নদীর প্রশস্ততা 255 m

এখানে,
বেগ $v = 340 \text{ m s}^{-1}$
সময় $t = 1.5 \text{ s}$,
প্রশস্ততা $d = ?$

৭.৯ সুরযুক্ত শব্দ ও তার বৈশিষ্ট্য

Musical sound and its characteristics

আমরা প্রতিদিন বহুরকম শব্দ শুনতে পাই। রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচলের শব্দ, হাটবাজারের শব্দ,বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়ার শব্দ,বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ইত্যাদি আমরা প্রতিদিন শুনে থাকি। এসকল শব্দের কিছু কিছু শুনতে শ্রুতিমধুর লাগে আর কিছু কিছু শুনতে শ্রুতিকটু লাগে। অনুভূতির দিক দিয়ে বিচার করলে শ্রুতিমধুর শব্দ হচ্ছে সুরযুক্ত শব্দ।

মূলত শব্দ উৎসের নিয়মিত ও পর্যায়বৃত্ত কম্পনের ফলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং যা আমাদের কানে শ্রুতিমধুর বলে মনে হয় তাকে সুরযুক্ত শব্দ বলে। গিটার, বেহালা, বাশের বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ সুরযুক্ত শব্দ।

সুরযুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্য

সুরযুক্ত শব্দের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে– প্রাবল্য বা তীব্রতা (Loudness or Intensity), তীক্ষ্ণতা (Pitch) এবং গুণ বা জাতি (Quality or Timbre)।

প্রাবল্য বা তীব্রতা: প্রাবল্য বা তীব্রতা বলতে শব্দ কতটা জোরে হচ্ছে তা বুঝায়। শব্দ বিস্তারের অভিমুখে লম্বভাবে রাখা একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ শব্দ শক্তি প্রবাহিত হয় তাকে শব্দের তীব্রতা বলে। SI প[] তিতে শব্দের তীব্রতার একক Wm^{-2}।

তীক্ষ্ণতা: সুরযুক্ত শব্দের যে বৈশিষ্ট্য দিয়ে একই প্রাবল্যের খাদের সুর এবং চড়া সুরের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যায় তাকে তীক্ষ্ণতা বা পীচ বলে। তীক্ষ্ণতা উৎসের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে। কম্পাঙ্ক যত বেশি হয়, সুর তত চড়া হয় এবং তীক্ষ্ণতা বা পীচ তত বেশি হয়।

গুণ বা জাতি: সুরযুক্ত শব্দের যে বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন একই প্রাবল্য ও তীক্ষ্ণতাযুক্ত শব্দের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যায় তাকে গুণ বা জাতি বলে।

পুরুষের গলার স্বর মোটা কিন্তু নারী ও শিশুর গলার স্বর তীক্ষ্ণ কেন?

মানুষের গলার স্বরযন্ত্রে দুইটি পর্দা আছে এদেরকে বলে স্বরতন্ত্রী বা Vocal Chord। এই ভোকাল কর্ডের কম্পনের ফলে গলা থেকে শব্দ নির্গত হয় এবং মানুষ কথা বলে। বয়স্ক পুরুষদের ভোকাল কর্ড বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় হয়ে পড়ে। কিন্তু শিশু বা নারীদের ভোকাল কর্ড দৃঢ় থাকে না ফলে বয়স্ক পুরুষদের গলার স্বরের কম্পাঙ্ক কম এবং নারী বা শিশুদের স্বরের কম্পাঙ্ক বেশি হয়। তাই পুরুষদের গলার স্বর মোটা কিন্তু শিশু বা নারীদের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ।

৭.১০ শব্দ দূষণ

Noise pollution

পারস্পরিক যোগাযোগ ও ভাব আদানপ্রদানের জন্য শব্দ প্রয়োজন। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় শব্দ ও কোলাহল অসহ্য লাগে। বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন জোরালো এবং অপ্রয়োজনীয় শব্দ যখন মানুষের সহনশীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে বিরক্তি ঘটায় এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করে তখন তাকে শব্দ দূষণ বলে।

মাইকের অবাধ ব্যবহার, ঢোলের শব্দ, বোমাবাজি, পটকা ফোটানোর আওয়াজ, কল কারখানার শব্দ, গাড়ির হর্নের আওয়াজ, উচ্চ ভলুমে চালিত টেপ রেকর্ডার ও টেলিভিশনের শব্দ, পুরনো গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ, উড়োজাহাজ ও যুদ্ধ বিমানের তীব্র শব্দ প্রভৃতি শব্দ দূষণের প্রধান কারণ।

অবিরাম তীব্র শব্দ মানসিক উত্তেজনা বাড়ায় ও মেজাজ খিটখিটে করে। শব্দ দূষণ বমি বমি ভাব, ক্ষুধা মন্দা, রক্তচাপ বৃদ্ধি, হৃদপিন্ড ও মস্তিষ্কের জটিল রোগ, অনিদ্রাজনিত অসুস্থতা, ক্লান্তি ও অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়া, কর্মক্ষমতা হ্রাস, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, মাথা ঘোরা প্রভৃতি ক্ষতিকারক প্রভাব সৃষ্টি করে। হঠাৎ তীব্র শব্দ মানুষের শ্রবণশক্তি নষ্ট করতে পারে।

বর্তমানে শব্দ দূষণ মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করছে। এর কবলে পড়ে প্রায়ই অসুস্থ রোগী এবং পরীক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। শব্দ দূষণের হাত থেকে বাচাঁর উপায় হলো শব্দ কমানো। এ প্রসঙ্গে আমরা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। যেকোনো উৎসব বা অনুষ্ঠানে উচ্চস্বরে মাইক বাজানো থেকে বিরত থাকতে হবে। উৎসবে পটকা, বাজি ফুটানো নিষিদ্ধ করতে হবে। গাড়ির হর্ন অযথা বাজানো বা জোরে বাজানো পরিহার করা উচিত। কম শব্দ উৎপাদনকারী ইঞ্জিন বা যন্ত্রপাতি তৈরি এবং লোকালয় থেকে দূরে কলকারখানা ও বিমান বন্দর স্থাপন করেও আমরা শব্দদূষণের হাত থেকে রেহাই পেতে পারি। শহরের মাঝে মাঝে উন্মুক্ত জায়গা রাখা এবং রাস্তার ধারে গাছপালা লাগানো উচিত। কলকারখানায় শব্দ শোষণ যন্ত্রের ব্যবহার চালু করে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

অনুশীলনী

ক.বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

১। শব্দ কোন ধরনের তরঙ্গ?

ক. তির্যক তরঙ্গ খ. তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ

গ. অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ ঘ. বেতার তরঙ্গ

২। শব্দের বেগ কোন মাধমে সবচেয়ে বেশি।

ক. কঠিন খ. তরল

গ. গ্যাসীয় ঘ. প্লাজমা

৩। বৈদ্যুতিক লাইনে মৃত বাদুর ঝুলে থাকতে দেখা যায় কেন ?

i. বৈদ্যুতিক তারগুলোর অবস্থান এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায়।

ii. সামনের দিকের শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রতিধ্বনি শুনতে না পাওয়ায়।

iii. বাদুর একটি তারে ঝুলে অপর তারটি স্পর্শ করায়।

নিচের কোন উত্তরটি সঠিক

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চিত্রে S একটি শব্দ উৎস এবং AB পানির পৃষ্ঠতল। শব্দের বেগ 332 m s^{-1} ধরে নিয়ে এবং পার্শ্বের তথ্য ও চিত্রের ভিত্তিতে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

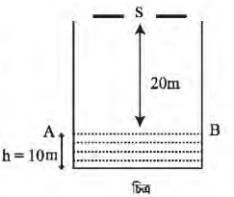

চিত্র

৪. পানির উচ্চতা h এর মান সর্বোচ্চ কত পর্যন্ত প্রতিধ্বনি শোনা যাবে ?

ক. 13.40 cm খ. 13.40 m

গ. 3.4 m ঘ. 3.4 cm

৫. প্রদত্ত চিত্রের ক্ষেত্রে প্রতিধ্বনি শুনতে কত সময় প্রয়োজন হবে ?

ক. 0.10 s খ. 0.12 s

গ. 0.14 s ঘ. 0.18 s

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রাফসান দশম শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষা দিচ্ছে। পরের দিন তার পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষা। পাশের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান। সেখানে রাত দুইটা পর্যন্ত জোরে জোরে গান বাজলো।উচ্চ শব্দের জন্য তার পড়াশুনার দারুণ ব্যাঘাত ঘটলো। তার বাবা উচ্চরক্তচাপের রোগী। তাঁরও অসুবিধা হলো।

ক. শব্দদূষণ কী ?

খ. শব্দদূষণের কারণ ব্যখ্যা কর।

গ. রাফসানের বাবার কী অসুবিধা হতে পারে এবং এ প্রসঙ্গে জনস্বাস্থ্যে শব্দ দূষণের প্রভাব লিখ।

ঘ. রাফসানের এলাকায় শব্দদূষণ প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

২।

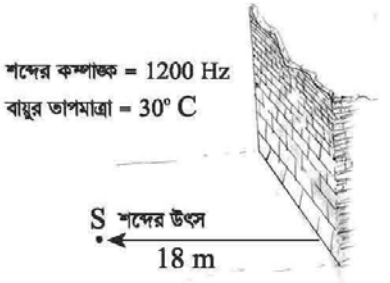

ক) পর্যায়বৃত্ত গতি কাকে বলে?

খ) পানির ঢেউ অনুপ্রস্থ তরঙ্গ কেন? ব্যাখ্যা কর

গ) শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

ঘ) S অবস্থান থেকে প্রতিধ্বনি শোনা সম্ভব কি? গাণিতিক যুক্তিসহ যাচাই কর।

অষ্টম অধ্যায়

আলোর প্রতিফলন
REFLECTION OF LIGHT

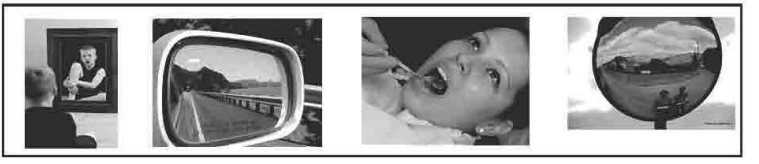

[আমরা আমাদের চারপাশে নানারকম বস্তু দেখতে পাই। যখন কোনো আলোক উৎস থেকে আলো সরাসরি আমাদের চোখে আসে তখন আমরা উৎসটি দেখতে পাই। আবার আলোক উৎস থেকে নির্গত আলো কোনো বস্তুর পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে যখন আমাদের চোখে আসে তখনও আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। আলো হচ্ছে এক প্রকার শক্তি বা বাহ্যিক কারণ যা আমাদের দেখতে সাহায্য করে বা দর্শনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এ অধ্যায়ে আমরা আলোর প্রকৃতি, দর্পণ, আলোর প্রতিফলনের সূত্রাবলী, দর্পণের প্রকারভেদ, দর্পণে কীভাবে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়, দর্পণের ব্যবহার ও প্রতিবিম্বের বিবর্ধন সম্পর্কে আলোচনা করব।]

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১. আলোর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব।

২. আলোর প্রতিফলনের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।

৩. দর্পণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

৪. প্রতিবিম্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

৫. আলোক রশ্মির ক্রিয়ারেখা অঙ্কন করে দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

৬. দর্পণে প্রতিবিম্ব সৃষ্টির কিছু সাধারণ ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারব।

৭. দর্পণের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।

৮. বিবর্ধন ব্যাখ্যা করতে পারব।

৯. প্রতিবিম্ব সৃষ্টি প্রদর্শন করতে পারব।

১০. আমাদের জীবনে বিভিন্ন আলোকীয় ঘটনার প্রভাব এবং এদের অবদান উপলব্ধি করতে পারব এবং প্রশংসা করতে পারব।

৮.১ আলোর প্রকৃতি
Nature of light

আমরা জানি, আলো হলো এক প্রকার শক্তি যার মাধ্যমে আমরা কোনো বস্তু দেখতে পাই। আমরা যখন কোনো বস্তু দেখি, তখন বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে আসে। চোখে প্রবিষ্ট আলো চোখের রেটিনায় বস্তুটির প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে এবং জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কে বস্তুটির অনুরূপ একটি বস্তুর অনুভূতি সৃষ্টি করে। প্রাচীনকাল হতে মানুষ আলোর প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করে আসছে। এক সময় ধারণা করা হতো আমাদের চোখ হতে আলো কোনো বস্তুর উপর পড়ে, তাই আমরা সেই বস্তু দেখতে পাই। আসলে যখন কোনো বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে আসে, তখনই কেবল আমরা সেই বস্তু দেখতে পাই।

আলোর প্রধান প্রধান ধর্মগুলো নিম্নরূপ:

১. কোনো স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো সরলপথে চলে।
২. কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যমে আলো একটি নির্দিষ্ট বেগে চলে। শূন্যস্থানে এই বেগের মান, $c = 3 \times 10^8\ m\ s^{-1}$।
৩. আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন, বিচ্ছুরণ এবং সমবর্তন ঘটে।
৪. আলো এক প্রকার শক্তি।
৫. আলো এক ধরনের তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ।
৬. কোনো কোনো ঘটনায় আলো তরঙ্গের ন্যায়, আবার কখনো কখনো আলো কণার ন্যায় আচরণ করে।

৮.২ আলোর প্রতিফলন
Laws of reflection of light

আমরা আমাদের চারপাশে অনেক রকম বস্তু দেখে থাকি। এদের কোনোটি চারদিকে আলো ছড়ায় আবার কোনোটি আলো ছড়ায় না। যে সকল বস্তু যেমন–সূর্য,তারা, জ্বলন্ত মোমবাতি, নক্ষত্র ইত্যাদি নিজে থেকে আলো নিঃসরণ করে তাদেরকে বলা হয় দীপ্তিমান বস্তু। আবার যে সকল বস্তু যেমন– মানুষ, গাছপালা, টেবিল, দেয়াল, ছবি, চক বোর্ড ইত্যাদির নিজের আলো নেই বা নিজে আলো নিঃসরণ করতে পারে না তাদেরকে বলা হয় দীপ্তিহীন বস্তু। যখন দীপ্তিমান বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে আসে তখন আমরা সেই বস্তুটি দেখতে পাই। আমাদের চারপাশে যে সকল সাধারণ বস্তু দেখতে পাই সেগুলো দীপ্তিমান বস্তু নয়, তবুও আমরা সেগুলো দেখতে পাই। এর কারণ হচ্ছে আলোর প্রতিফলন। ৮.১ চিত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছো কীভাবে আমরা একটি দীপ্তিমান বস্তু (সূর্য) এবং একটি দীপ্তিহীন বস্তুকে (বিড়াল) দেখতে পাচ্ছি। চোখ দীপ্তিমান বস্তুটিকে দেখতে পায় কেননা এটি থেকে আলো সরাসরি চোখে প্রবেশ করে। দীপ্তিমান বস্তু থেকে আসা আলো বিড়াল থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে প্রবেশ করে বলে বিড়ালটি আমরা দেখতে পাই।

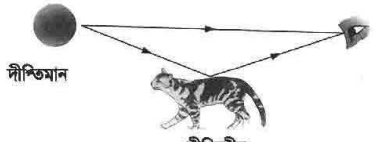

চিত্র : ৮.১

একটি স্বচ্ছ ও সমসত্ত্ব মাধ্যমে (যেমন–কাচ) আলোকরশ্মি সরলপথে এবং একই বেগে চলে। কিন্তু আলোকরশ্মি যখন এক মাধ্যম দিয়ে চলতে চলতে অন্য এক মাধ্যমের কোনো তলে আপতিত হয় তখন দুই মাধ্যমের বিভেদতল হতে কিছু পরিমাণ আলো আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। এ ঘটনাকে আলোর প্রতিফলন বলে।
যে পৃষ্ঠ হতে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে তাকে প্রতিফলক পৃষ্ঠ বলে।

প্রতিফলনের সূত্র

আপতিত রশ্মি এবং প্রতিফলিত রশ্মি দুইটি সহজ সূত্র মেনে চলে–

১. **প্রথম সূত্র:** আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।

২. **দ্বিতীয় সূত্র:** প্রতিফলন কোণ আপতন কোণের সমান হয়।

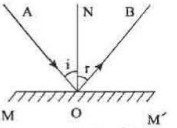

চিত্র ৮.২: আলোর প্রতিফলন

যখন আলো কোনো পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয় তখন তা অবশ্যই প্রতিফলনের সূত্র মেনে চলে। কোনো পৃষ্ঠ থেকে কীভাবে আলো প্রতিফলিত হবে তা নির্ভর করে প্রতিফলকের পৃষ্ঠের প্রকৃতির উপর। প্রতিফলক পৃষ্ঠের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে প্রতিফলনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. নিয়মিত বা সুষম প্রতিফলন

২. ব্যাপ্ত বা অনিয়মিত প্রতিফলন

১. নিয়মিত প্রতিফলন

যদি একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মি কোনো মসৃণ তলে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ বা অভিসারী বা অপসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয় তবে এ ধরনের প্রতিফলনকে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন বলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– যদি একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মি কোনো সমতল দর্পণে বা খুব ভালোভাবে পালিশ করা কোনো ধাতব পৃষ্ঠে আপতিত হয়, তবে প্রতিফলনের পরেও রশ্মিগুচ্ছ সমান্তরাল থাকে। এ ক্ষেত্রে রশ্মিগুচ্ছের প্রত্যেকটি আলোকরশ্মির আপতন কোণের মান সমান এবং নিয়মিত প্রতিফলনের ফলে প্রত্যেকটি রশ্মির প্রতিফলন কোণেরও মান সমান হয় [চিত্র: ৮.৩]।

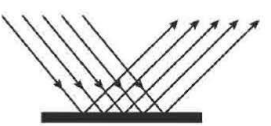
চিত্র ৮.৩: নিয়মিত প্রতিফলন

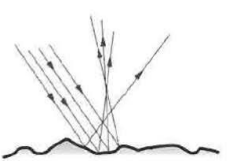
চিত্র ৮.৪ : ব্যাপ্ত প্রতিফলন

২. ব্যাপ্ত প্রতিফলন

যদি একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মি কোনো তলে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর আর সমান্তরাল না থাকে বা অভিসারী বা অপসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত না হয় তবে এ ধরনের প্রতিফলনকে আলোর ব্যাপ্ত বা অনিয়মিত প্রতিফলন বলে।

৮.৪ চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মি একটি অমসৃণ তলে আপতিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে রশ্মিগুলো অমসৃণ তলের বিভিন্ন আপতন বিন্দুতে বিভিন্ন আপতন কোণে আপতিত হয়, ফলে এসকল রশ্মির আনুষঙ্গিক প্রতিফলন কোণগুলোও বিভিন্ন হয়। যার ফলে প্রতিফলিত রশ্মিগুলো আর সমান্তরাল থাকে না। আমাদের চারপাশে যে সকল বস্তু দেখতে পাই, তাদের অধিকাংশের পৃষ্ঠ মসৃণ নয়। ফলশ্রুতিতে আমাদের চোখে যে সকল প্রতিফলিত রশ্মি প্রবেশ করে তারা ব্যাপ্ত প্রকৃতির। যার ফলে বস্তুগুলো আমাদের নিকট উজ্জ্বল না হয়ে অনুজ্জ্বল দেখায়। খালি চোখে দেখা অধিকাংশ পৃষ্ঠ আপাতদৃষ্টিতে মসৃণ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এ সকল পৃষ্ঠ মসৃণ নয়। যখন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা এ সকল পৃষ্ঠ দেখা হয় তখন তা বোঝা যায়।

৮.৩ দর্পণ
Mirror

দর্পণ হলো এমন একটি মসৃণ তল যেখানে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে। দর্পণে আলোর প্রতিফলনের ফলে দর্পণের সামনে স্থাপিত বস্তুর একটি স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

একটি মসৃণ তলে প্রতিফলক আস্তরণ দিয়ে দর্পণ প্রস্তুত করা হয়। সাধারণত কাচের এক পৃষ্ঠে ধাতুর প্রলেপ লাগিয়ে দর্পণ তৈরি করা হয়। কাচের উপর পারদ বা রুপার প্রলেপ লাগানোর এই প্রক্রিয়াকে 'পারা লাগানো' বা সিলভারিং বলা হয়। ধাতুর প্রলেপ লাগানো পৃষ্ঠের বিপরীত পৃষ্ঠটি প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও স্থির পানি পৃষ্ঠ, মসৃণ বরফ ইত্যাদিও দর্পণের ন্যায় কাজ করে থাকে।

দর্পণ প্রধানত দুই প্রকার। যথা–

১. সমতল দর্পণ

২. গোলীয় দর্পণ

সমতল দর্পণ

প্রতিফলক পৃষ্ঠটি যদি মসৃণ ও সমতল হয় এবং তাতে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তবে সে পৃষ্ঠকে সমতল দর্পণ বলে। আমরা সচরাচর যে দর্পণ বা আয়না ব্যবহার করে থাকি। সেটি হলো সমতল দর্পণ।

গোলীয় দর্পণ

প্রতিফলক পৃষ্ঠটি যদি মসৃণ এবং গোলীয় হয় অর্থাৎ প্রতিফলক পৃষ্ঠটি যদি কোনো গোলকের অংশবিশেষ হয় এবং তাতে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তবে তাকে গোলীয় দর্পণ বলে। ৮.৫ ও ৮.৬ চিত্রে গোলকীয় দর্পণ দেখানো হয়েছে। একটি কাচের ফাঁপা গোলকের খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে যদি তার এক পৃষ্ঠে পারা লাগানো হয়, তবে গোলীয় দর্পণ তৈরি হয়। গোলীয় দর্পণ আবার দুই প্রকার। যথা–

১. অবতল দর্পণ

২. উত্তল দর্পণ

অবতল দর্পণ: কোনো গোলকের অবতল পৃষ্ঠ যদি প্রতিফলকরূপে কাজ করে অর্থাৎ আলোর নিয়মিত প্রতিফলন যদি গোলীয় দর্পণের অবতল পৃষ্ঠ হতে সংঘটিত হয় তবে সে দর্পণকে অবতল দর্পণ বলে। এক্ষেত্রে গোলকের কেটে নেয়া অংশের উত্তল পৃষ্ঠে পারা লাগিয়ে অবতল দর্পণ তৈরি করা হয় [চিত্র: ৮.৫]। অবতল দর্পণ একটি অভিসারী দর্পণ কেননা

সমান্তরাল আলোকরশ্মি অবতল দর্পণে আপতিত হওয়ার পর প্রতিফলিত হয়ে একটি বিন্দুতে অভিসারিত হয় বা একত্রে মিলিত হয়।

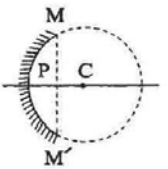

চিত্র: ৮.৫

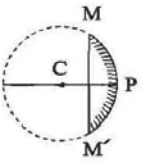

চিত্র: ৮.৬

উত্তল দর্পণ: কোনো গোলকের উত্তল পৃষ্ঠ যদি প্রতিফলকরূপে কাজ করে অর্থাৎ আলোর নিয়মিত প্রতিফলন যদি গোলীয় দর্পণের উত্তল পৃষ্ঠ হতে সংঘটিত হয়, তবে সে দর্পণকে উত্তল দর্পণ বলে। এক্ষেত্রে গোলকের কেটে নেওয়া অংশের অবতল পৃষ্ঠে অর্থাৎ ভিতরের দিকে পারা লাগিয়ে উত্তল দর্পণ তৈরি করা হয় [চিত্র: ৮.৬]।

উত্তল দর্পণ একটি অপসারী দর্পণ, কারণ সমান্তরাল আলোকরশ্মি উত্তল দর্পণে আপতিত হয়ে প্রতিফলিত হবার পর অপসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয় অর্থাৎ ছড়িয়ে পড়ে এবং কখনই একটি বিন্দুতে মিলিত হয় না।

গোলীয় দর্পণ সংক্রান্ত কয়েকটি সংজ্ঞা

মেরু (Pole) : গোলীয় দর্পণের প্রতিফলক পৃষ্ঠের মধ্যবিন্দুকে দর্পণের মেরু বলে। ৮.৭ চিত্রে P দর্পণের মেরু। অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিফলক পৃষ্ঠের সবচেয়ে নিচু বিন্দু এবং উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিফলক পৃষ্ঠের সবচেয়ে উঁচু বিন্দুই দর্পণের মেরু।

বক্রতার কেন্দ্র : গোলীয় দর্পণ যে গোলকের অংশবিশেষ, সেই গোলকের কেন্দ্রকে ঐ দর্পণের বক্রতার কেন্দ্র বলে। ৮.৭ চিত্রে C বিন্দু দর্পণের বক্রতার কেন্দ্র।

বক্রতার ব্যাসার্ধ : গোলীয় দর্পণ যে গোলকের অংশ, সেই গোলকের ব্যাসার্ধকে ঐ দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ বলে। ৮.৭ চিত্রে PC বা MC হলো গোলীয় দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ। বক্রতার ব্যাসার্ধকে r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

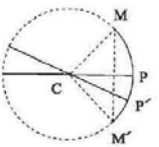

চিত্র : ৮.৭

প্রধান অক্ষ : গোলীয় দর্পণের মেরু ও বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকারী সরলরেখাকে দর্পণের প্রধান অক্ষ বলে। ৮.৭ চিত্রে PC সরলরেখা হলো দর্পণের প্রধান অক্ষ।

গৌণ অক্ষ : মেরু বিন্দু ব্যতিত দর্পণের প্রতিফলক পৃষ্ঠের উপরস্থ যেকোনো বিন্দু ও বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকারী সরলরেখাকে গৌণ অক্ষ বলে। ৮.৭ চিত্রে $P'C$ সরলরেখা দর্পণের গৌণ অক্ষ।

প্রধান ফোকাস : প্রধান অক্ষের নিকটবর্তী ও সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ কোনো গোলীয় দর্পণে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের উপর যে বিন্দুতে মিলিত হয় (অবতল দর্পণে) বা যে বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় (উত্তল

দর্পণে) তাকে ঐ দর্পণের প্রধান ফোকাস বলে। ৮.৮ ও ৮.৯ চিত্রে F বিন্দু হলো যথাক্রমে অবতল ও উত্তল দর্পণের প্রধান ফোকাস।

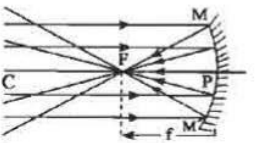

চিত্র : ৮.৮

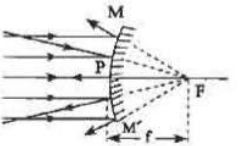

চিত্র : ৮.৯

ফোকাস দূরত্ব : গোলীয় দর্পণের মেরু বিন্দু থেকে প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে ফোকাস দূরত্ব বলে। একে f দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ৮.৮ ও ৮.৯ চিত্রে PF হলো ফোকাস দূরত্ব। গোলীয় দর্পণের ফোকাস দূরত্ব বক্রতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক, অর্থাৎ $f = \frac{r}{2}$।

ফোকাস তল : গোলীয় দর্পণের প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে যে সমতল কল্পনা করা হয় তাকে ফোকাস তল বলে।

৮.৪ প্রতিবিম্ব
Image

তুমি যখন কোনো আয়নার দিকে তাকাও, তখন তুমি নিজেকে দেখতে পাও। এটাই তোমার প্রতিবিম্ব। শুধু আয়না কেন, তুমি যখন কোনো পুকুর বা নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে যাও তখনও পানির মধ্যে তোমার প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে।

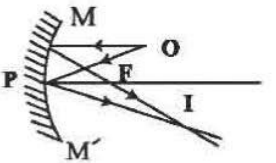

চিত্র : ৮.১০

চিত্র : ৮.১০-এ অবতল দর্পণের সম্মুখে O একটি বিন্দু লক্ষবস্তু। O হতে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি OM দর্পণে আপতিত হয়ে প্রধান ফোকাস দিয়ে MFI পথে প্রতিফলিত হয়। OP রশ্মি দর্পণের মেরুবিন্দু P তে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর PI পথে যায়। প্রতিফলিত রশ্মি দুটি I বিন্দুতে ছেদ করে। এই I বিন্দুই হলো O বিন্দুর প্রতিবিম্ব।

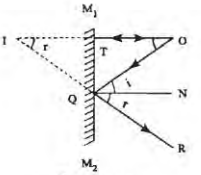

চিত্র : ৮.১১

চিত্র ৮.১১–এ O সমতল দর্পণের সামনে অবস্থিত একটি বিন্দু লক্ষবস্তু। O হতে OT রশ্মি অভিলম্বভাবে দর্পণে আপতিত হয় এবং TO পথে প্রতিফলিত হয়। OQ রশ্মি তীর্যকভাবে দর্পণে আপতিত হয় এবং QR পথে প্রতিফলিত হয়। এ রশ্মি দুইটি অপসারী হওয়ায় রশ্মিগুলোকে পিছনের দিকে বর্ধিত করলে এগুলো I বিন্দুতে মিলিত হয়। অর্থাৎ প্রতিফলিত রশ্মিগুলো দর্পণের পিছনে I বিন্দু থেকে অপসারিত হচ্ছে বলে মনে হয়। এই I বিন্দুই হলো O বিন্দুর প্রতিবিম্ব।

কোনো বিন্দু হতে নির্গত আলোকরশ্মিগুচ্ছ কোনো তলে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হবার পর দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় বা দ্বিতীয় কোনো বিন্দু হতে অপসারিত হচ্ছে বলে মনে হয়, তখন ঐ দ্বিতীয় বিন্দুটিকে প্রথম বিন্দুর প্রতিবিম্ব বলে। একটি বস্তু হলো অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টি। ফলে বিন্দুর ন্যায় বস্তুরও প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

প্রতিবিম্বের প্রকারভেদ

তুমি যখন আয়নায় তোমার চেহারা দেখ, তখন আয়নার পিছনে তোমার প্রতিবিম্ব দেখতে পাও। আলোর প্রতিফলনের জন্য এমনটি ঘটে। আয়নায় দেখা তোমার এরূপ প্রতিবিম্বে সত্যিকার অর্থে আলো মিলিত হয় না। এ ধরনের প্রতিবিম্বকে বলে অবাস্তব প্রতিবিম্ব। আর যে সকল প্রতিবিম্বে আলো সত্যিকার অর্থে মিলিত হয় (যেমন– সিনেমার পর্দায় ফেলা কোনো দৃশ্য) সেগুলোকে বলা হয় বাস্তব প্রতিবিম্ব। ডিজিটাল ক্যামেরার পর্দায় ভেসে উঠা ছবি হলো বাস্তব প্রতিবিম্ব। বাস্তব প্রতিবিম্ব পর্দায় ফেলা যায় কিন্তু অবাস্তব প্রতিবিম্ব পর্দায় ফেলা যায় না। প্রতিবিম্ব দুই প্রকারের হয়–

(ক) বাস্তব প্রতিবিম্ব

(খ) অবাস্তব প্রতিবিম্ব

(ক) বাস্তব প্রতিবিম্ব: কোনো বিন্দু হতে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ কোনো তলে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হবার পর যদি দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে প্রকৃতপক্ষে মিলিত হয় তাহলে ঐ দ্বিতীয় বিন্দুটিকে প্রথম বিন্দুর বাস্তব প্রতিবিম্ব বলে। চিত্র : ৮.১০ এ I হলো প্রতিফলনের জন্য বাস্তব প্রতিবিম্ব।

(খ) অবাস্তব প্রতিবিম্ব: কোনো বিন্দু হতে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ কোনো তলে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হবার পর যদি দ্বিতীয় কোনো বিন্দু থেকে অপসারিত হচ্ছে বলে মনে হয়, তবে ঐ দ্বিতীয় বিন্দুটিকে প্রথম বিন্দুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব বলে। চিত্র: ৮.১১ এ I হলো প্রতিফলনের জন্য সৃষ্ট অবাস্তব প্রতিবিম্ব।

৮.৫ দর্পণে বস্তুর প্রতিবিম্ব

Image in a mirror

আমরা জানি দর্পণ দুই প্রকার। (ক) সমতল দর্পণ এবং (খ) গোলীয় দর্পণ। সমতল এবং গোলীয় দর্পণে কীভাবে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় তা আমরা আলোচনা করব।

সমতল দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব

(ক) বিন্দু লক্ষবস্তু

চিত্র ৮.১২ এ M_1M_2 সমতল দর্পণের সামনে O একটি বিন্দু লক্ষবস্তু। O থেকে OT রশ্মি অভিলম্বভাবে দর্পণে আপতিত হয় এবং TO পথে ফিরে আসে। OQ রশ্মি দর্পণে তীর্যকভাবে আপতিত হয় এবং QR পথে প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলিত রশ্মি QR এবং TO পিছনে বর্ধিত করলে এরা I বিন্দুতে মিলিত হয়। অর্থাৎ প্রতিফলিত রশ্মি দুইটি যেন দর্পণের পিছনে অবস্থিত I বিন্দু থেকে আসছে। অতএব, এই I বিন্দুই হলো O বিন্দুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব।

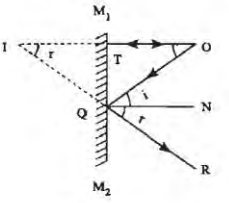

চিত্র : ৮.১২

Q বিন্দুতে QN অভিলম্ব আঁকা হলো।

চিত্রে TO এবং QN সমান্তরাল। OQ ছেদক।

$$\therefore \angle TOQ = \angle OQN = i \qquad (8.1)$$

আবার, OI এবং QN সমান্তরাল, RQI সরলরেখা এদের ছেদক।

$$\therefore \angle TIQ = \angle NQR = r \qquad (8.2)$$

আমরা জানি, $i = r$

$\therefore$ (8.1) ও (8.2) সমীকরণ হতে পাই,

$\angle TOQ = \angle TIQ$

এখন, ΔQOT এবং ΔQIT এর মধ্যে,

$\angle TOQ = \angle TIQ$, TQ সাধারণ বাহু,

এবং $\angle QTO = \angle QTI = 90°$

সুতরাং, ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম।

সুতরাং, $TO = TI$

অর্থাৎ, লক্ষবস্তু O দর্পণের যত সামনে অবস্থিত, প্রতিবিম্ব I দর্পণের ঠিক ততটা পিছনে গঠিত হয়।

(খ) বিস্তৃত লক্ষবস্তু

বিন্দু লক্ষবস্তুর ন্যায় বিস্তৃত লক্ষবস্তুর জন্যও প্রতিবিম্ব আঁকা যায়। এক্ষেত্রে, বিস্তৃত লক্ষবস্তুকে অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টি হিসেবে গণ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে, প্রত্যেক বিন্দুর জন্য দর্পণের পিছনে অবাস্তব প্রতিবিম্ব গঠিত হয় [চিত্র : ৮.১৩]।

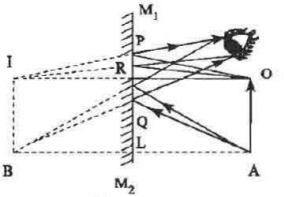

চিত্র : ৮.১৩

চিত্রে AO লক্ষবস্তু এবং এর প্রতিবিম্ব BI দেখানো হয়েছে। O এবং A হতে M_1M_2 দর্পণের উপর লম্ব টানা হলো। এরা দর্পণকে যথাক্রমে R এবং L বিন্দুতে ছেদ করে। এখন OR এবং AL কে পিছনের দিকে যথাক্রমে I এবং B পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো যেন $OR = IR$ এবং $AL = BL$ হয়।

O এবং A হতে দুইটি করে রশ্মি তীর্যকভাবে দর্পণে আপতিত হয়ে প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলিত রশ্মি দুইটিকে পেছনের দিকে বর্ধিত করলে এগুলো যথাক্রমে I ও B বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয়। I ও B যোগ করা হলো। তাহলে BI ই হলো সমতল দর্পণে গঠিত AO লক্ষবস্তুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব।

সমতল দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্বের আকার লক্ষবস্তুর আকারের সমান হয়।

সমতল দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্বের বৈশিষ্ট্য

সমতল দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্বের নিম্নলিখিত ধর্মগুলো রয়েছে:

১. সমতল দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব যত, দর্পণ থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্বও তত।

২. প্রতিবিম্বের আকার লক্ষবস্তুর আকারের সমান।

৩. প্রতিবিম্ব অবাস্তব এবং সোজা।

গোলীয় দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব

গোলীয় দর্পণ তা অবতল হোক কিংবা উত্তল হোক, এদের সামনে কোনো বস্তু রাখলে দর্পণে তার প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এই প্রতিবিম্বের অবস্থান, আকৃতি ও প্রকৃতি জানতে হলে, বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলনের পর কোনো দিকে প্রতিফলিত হবে তা জানা দরকার। নিম্নবর্ণিত তিনটি রশ্মির যেকোনো দুইটি ব্যবহার করে আমরা গোলীয় দর্পণে প্রতিবিম্ব আঁকতে পারি।

১. গোলীয় দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর আপতিত রশ্মি প্রতিফলনের পর পুনরায় সেই পথেই ফিরে আসে [চিত্র: ৮.১৪]।

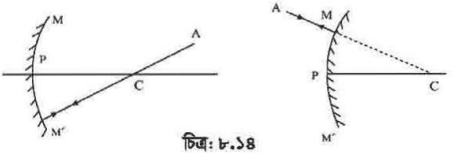

চিত্র: ৮.১৪

২. অবতল দর্পণের প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত রশ্মি প্রতিফলনের পর প্রধান ফোকাস দিয়ে যায়; [চিত্র: ৮.১৫ক] উত্তল দর্পণের প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত রশ্মি প্রতিফলনের পর প্রধান ফোকাস হতে আসছে বলে মনে হয় [চিত্র: ৮.১৫ খ]।

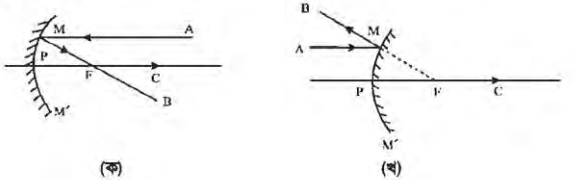

চিত্র : ৮.১৫

৩. অবতল দর্পণের প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে আপতিত রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিফলিত হয়; উত্তল দর্পণের প্রধান ফোকাস অভিমুখে আপতিত রশ্মি প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়। [চিত্র : ৮.১৬]।

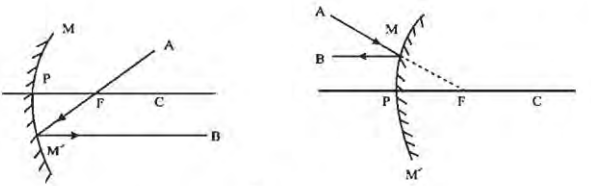

চিত্র : ৮.১৬

অবতল দর্পণে প্রতিবিম্ব: গোলীয় দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্বের অবস্থান, আকৃতি ও প্রকৃতি দর্পণের সামনে অবস্থিত লক্ষবস্তুর অবস্থানের উপর নির্ভর করে। লক্ষবস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন হলে প্রতিবিম্বের অবস্থান, আকৃতি ও প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে।

লক্ষবস্তুকে অসীম এবং প্রধান ফোকাসের মধ্যে দর্পণের সামনে যেখানেই রাখা হোক না কেন সৃষ্ট প্রতবিম্ব সর্বদা বাস্তব ও উল্টো হবে। আবার লক্ষবস্তুকে প্রধান ফোকাস ও মেরুর মধ্যে স্থাপন করা হলে গঠিত প্রতিবিম্ব হবে অবাস্তব এবং সোজা। নিম্নে অবতল দর্পণে সৃষ্ট বাস্তব এবং অবাস্তব প্রতিবিম্ব বর্ণনা করা হলো:

বাস্তব প্রতিবিম্ব

ধরা যাক MPM' একটি অবতল দর্পণ। P হলো এর মেরু এবং F প্রধান ফোকাস এবং C বক্রতার কেন্দ্র। দর্পণের সামনে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত লক্ষবস্তু AO।

O বিন্দু থেকে একটি রশ্মি OM প্রধান অক্ষের সমান্তরালে দর্পণের M বিন্দুতে আপতিত হয়ে প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে MI পথে প্রতিফলিত হয়। O হতে অপর একটি রশ্মি OCM' বক্রতার কেন্দ্র C বরাবর দর্পণে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর সেটি একই পথে ফিরে যায়। প্রতিফলনের পর রশ্মি দুইটি I বিন্দুতে প্রকৃতপক্ষে মিলিত হয়। সুতরাং I হলো O বিন্দুর বাস্তব প্রতিবিম্ব। A থেকে প্রধান অক্ষ বরাবর আপতিত রশ্মি ঐ পথেই ফিরে যায়। ফলে A এর

প্রতিবিম্ব ঐ রেখার উপরই হবে। I থেকে প্রধান অক্ষের উপর IB লম্ব অঙ্কন করি। BI ই হলো লক্ষবস্তু OA এর বাস্তব প্রতিবিম্ব [চিত্র: ৮.১৭]।

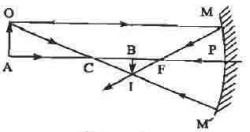

চিত্র : ৮.১৭

প্রতিবিম্বের প্রকৃতি হলো বাস্তব ও উল্টো।

অবাস্তব প্রতিবিম্ব: চিত্র : ৮.১৮ এ লক্ষবস্তু প্রধান ফোকাস এবং মেরুর মধ্যে অবস্থিত। O বিন্দু থেকে একটি রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হয়ে প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় এবং অপর একটি রশ্মি বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর দর্পণে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর সেটি একই পথে ফিরে যায়। প্রতিফলনের ফলে রশ্মি দুইটি পরস্পর অপসারী রশ্মিতে পরিণত হয়। রশ্মি দুইটিকে পিছনের দিকে বাড়ালে এরা I বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ, I বিন্দুই হলো O বিন্দুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব। I বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপর IB লম্ব টানা হলো। সুতরাং BI হলো বস্তুর অবাস্তব ও সোজা প্রতিবিম্ব।

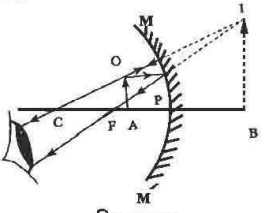

চিত্র : ৮.১৮

সৃষ্ট প্রতিবিম্বের অবস্থান হলো দর্পণের পিছনে, প্রকৃতি অবাস্তব, সোজা এবং আকারে বিবর্ধিত অর্থাৎ বস্তুর চেয়ে আকারে বড়।

(খ) উত্তল দর্পণে প্রতিবিম্ব: আমরা জানি, অবতল দর্পণে লক্ষবস্তুর অবস্থানের উপর নির্ভর করে বাস্তব অথবা অবাস্তব প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। কিন্তু উত্তল দর্পণ সর্বদা বস্তুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব গঠন করে। এই প্রতিবিম্ব সবসময় সোজা এবং বস্তুর চেয়ে আকারে ছোট হয়। চিত্র: ৮.১৯ এ MPM' একটি উত্তল দর্পণ। C এর বক্রতার কেন্দ্র, F প্রধান ফোকাস এবং P দর্পণের মেরু। AO লক্ষবস্তু দর্পণের সামনে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। O বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল OM রশ্মি দর্পণে আপতিত হয়। প্রতিফলনের পর রশ্মিটি দর্পণের প্রধান ফোকাস F থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়। অপর একটি রশ্মি OD দর্পণের বক্রতার কেন্দ্র বরাবর লম্বভাবে আপতিত হয়ে একই পথে প্রতিফলিত হয়। এখন এই অপসারী প্রতিফলিত রশ্মি দুইটিকে পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিলে এরা I বিন্দুতে ছেদ করে এবং I বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয়। সুতরাং, I

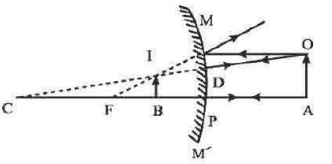

চিত্র : ৮.১৯

বিন্দুই হলো O বিন্দুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব। এখন I বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপর IB লম্ব অঙ্কন করা হলো। এই BI হলো লক্ষবস্তু AO -এর অবাস্তব প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব দর্পণের পিছনে গঠিত হয় এবং তা অবাস্তব, সোজা এবং আকারে লক্ষবস্তুর চেয়ে ছোট হয়। লক্ষবস্তুকে ক্রমশ দর্পণের নিকটে আনা হলে প্রতিবিম্বও দর্পণের কাছে সরে আসবে এবং প্রতিবিম্বের আকৃতি ক্রমশ বড় হতে থাকবে তবে তা সর্বদাই বস্তুর আকারের চেয়ে ছোট থাকবে।

কোনো নির্দিষ্ট দর্পণের অর্থাৎ নির্দিষ্ট ফোকাস দূরত্ব f এর গোলীয়দর্পণের সামনে u দূরত্বে যদি কোনো লক্ষবস্তু থাকে তাহলে যে অবস্থানে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবে তার দূরত্ব v নিম্নোক্ত সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়,

$$\frac{1}{v}+\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$$ ।

এ সমীকরণে মান বসানোর ক্ষেত্রে অবতল দর্পণের জন্য f এর মান ধনাত্মক। উত্তল দর্পণের জন্য f এর মান ঋণাত্মক এবং u এর মান ধনাত্মক বসাতে হবে। হিসাব করে v এর মান ধনাত্মক হলে প্রতিবিম্বটি বাস্তব আর ঋণাত্মক হলে প্রতিবিম্বটি অবাস্তব।

৮.৬ সমতল ও গোলীয় দর্পণে প্রতিবিম্ব সৃষ্টির কিছু সাধারণ ঘটনা

১. সরল পেরিস্কোপ: দূরের কোনো জিনিস সোজাসুজি দেখতে বাধা থাকলে পেরিস্কোপ ব্যবহার করা হয়। একটি সরল পেরিস্কোপ দুইটি সমতল দর্পণ দ্বারা গঠিত। আলোর ক্রমিক প্রতিফলন ব্যবহার করে এ যন্ত্র তৈরি করা হয়। ৮.২০ চিত্রে একটি সরল পেরিস্কোপ দেখানো হয়েছে। একটি লম্বা আয়তাকার কাঠ বা ধাতব নলের মধ্যে দুইটি সমতল দর্পণকে পরস্পরের সমান্তরাল এবং নলের অক্ষের সাথে 45° কোণ করে রাখা হয়। দূরের বস্তু থেকে সমান্তরাল আলোকরশ্মি প্রথমে M_1 দর্পণে অভিলম্বের সাথে 45° কোণে আপতিত হয়। আপতিত রশ্মি M_1 দর্পণ দ্বারা 45° কোণে প্রতিফলিত হয়ে নলের অক্ষ বরাবর এসে M_2 দর্পণে আপতিত হয়। আলোক রশ্মি M_2 দর্পণে পুনরায় প্রতিফলিত হয়ে অনুভূমিকভাবে চোখে পড়ে ফলে বস্তুটি দেখা যায়।

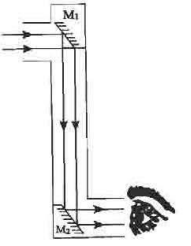

চিত্র : ৮.২০

সমতল দর্পণ ব্যবহার করে এভাবে আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তন করে যা আমরা সরাসরি দেখতে পাই না এমন বস্তুকেও দেখতে পাই।

ভীড়ের মধ্যে খেলা দেখা, উঁচু দেয়ালের উপর দিয়ে দেখা, শত্রু সৈন্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে পেরিস্কোপ ব্যবহার করা হয়। ডুবোজাহাজে প্রিজম ব্যবহার করে আরো উন্নত ধরনের পেরিস্কোপ ব্যবহার করা হয়।

২. সেলুনে সমতল দর্পণ: সেলুনে বা পার্লারে চুল কাটানোর সময় আমরা সামনে ও পেছনে সমতল দর্পণ দেখতে পাই। সামনের দর্পণে আমরা মাথার সম্মুখভাগ দেখতে পাই। মাথার পেছনে অবস্থিত দর্পণে মাথার পেছনের অংশের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। এই প্রতিবিম্ব সামনের দর্পণের জন্য অবাস্তব বস্তু হিসেবে কাজ করে এবং সামনের দর্পণে পুনরায় প্রতিবিম্ব গঠন করে। ফলে সামনে অবস্থিত দর্পণে আমরা মাথার পশ্চাদভাগও দেখতে পাই।

৩. চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবতল দর্পণ: দাঁতের চিকিৎসকরা দাঁত পরীক্ষা করার কাজে অবতল দর্পণ ব্যবহার করেন। দাঁত পরীক্ষা করার সময় দর্পণটিকে দাঁতের বেশ নিকটে ধরা হয়। ফলে দর্পণে দাঁতের একটি অবাস্তব ও বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। এ ছাড়া নাক–কান–গলা বিভাগের চিকিৎসকরাও বিভিন্ন প্রয়োজনে অবতল দর্পণ ব্যবহার করে থাকেন।

৮.৭ দর্পণের ব্যবহার
Uses of mirrors

বিভিন্ন ধরনের দর্পণ আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি। এগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

সমতল দর্পণ

১. সমতল দর্পণের সাহায্যে আমরা আমাদের চেহারা দেখি।
২. চোখের ডাক্তারগণ রোগীর দৃষ্টি শক্তি পরীক্ষা করার জন্য বর্ণমালা পাঠের সুবিধার্থে সমতল দর্পণ ব্যবহার করে থাকেন।
৩. সমতল দর্পণ ব্যবহার করে পেরিস্কোপ তৈরি করা হয়।
৪. পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে দুর্ঘটনা এড়াতে এটি ব্যবহার করা হয়।
৫. বিভিন্ন আলোকীয় যন্ত্রপাতি যেমন– টেলিস্কোপ,ওভারহেড প্রজেক্টর, লেজার তৈরি করতে সমতল দর্পণ ব্যবহার করা হয়।
৬. নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদির সুটিং এর সময় সমতল দর্পণ দিয়ে আলো প্রতিফলিত করে কোনো স্থানের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করা হয়।

অবতল দর্পণ

১. সুবিধাজনক আকৃতির অবতল দর্পণ ব্যবহার করে মুখমণ্ডলের বিবর্ধিত এবং সোজা প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয়, এতে রূপচর্চা ও দাঁড়ি কাঁটার সুবিধা হয়।
২. দন্ত চিকিৎসকগণ অবতল দর্পণ ব্যবহার করেন।
৩. প্রতিফলক হিসেবে অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয়। যেমন– টর্চলাইট, স্টিমার বা লঞ্চের সার্চলাইটে অবতল দর্পণ ব্যবহার করে গতিপথ নির্ধারণ করা হয়।
৪. অবতল দর্পণের সাহায্যে আলোকশক্তি, তাপশক্তি ইত্যাদি কেন্দ্রীভূত করে কোনো বস্তুকে উত্তপ্ত করতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও এটি রাডার এবং টিভি সংকেত সংগ্রহে ব্যবহৃত হয়। যেমন– ডিশ এন্টেনা, সৌরচুল্লী, টেলিস্কোপ এবং রাডার সংগ্রাহক ইত্যাদি।
৫. অবতল দর্পণের সাহায্যে আলোক রশ্মিগুচ্ছকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করা যায় বলে ডাক্তাররা চোখ, নাক, কান ও গলা পরীক্ষা করার সময় এ দর্পণ ব্যবহার করেন।

উত্তল দর্পণ

১. উত্তল দর্পণ সর্বদা অবাস্তব, সোজা এবং খর্বিত প্রতিবিম্ব গঠন করে বিধায় পেছনের যানবাহন বা পথচারী দেখার জন্য গাড়িতে এবং বিয়ের সময় ভিউ মিরর হিসেবে এ দর্পণ ব্যবহার করা হয়।
২. উত্তল দর্পণের সাহায্যে বিস্তৃত এলাকা দেখতে পারা যায় বলে দোকান বা শপিংমলে নিরাপত্তার কাজে উত্তল দর্পণ ব্যবহার করা হয়।
৩. প্রতিফলক টেলিস্কোপ তৈরিতে এ দর্পণ ব্যবহৃত হয়।
৪. এ দর্পণ বিস্তৃত এলাকায় আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দেয় বলে রাস্তার বাতিতে প্রতিফলকরূপে ব্যবহৃত হয়।

৮.৮ নিরাপদ ড্রাইভিং
Safe driving

নিরাপদে গাড়ি, মোটর সাইকেল ইত্যাদি যানবাহন চালানোর জন্য চালককে অনেক কিছু খেয়াল করতে হয়। প্রথমেই তাকে গাড়ির সকল বাতি জ্বালিয়ে এগুলো ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হয়। নিঁখুত এবং নিরাপদ গাড়ি চালাতে হলে চালককে শুধুমাত্র গাড়ির সামনে কী আছে তা দেখলেই চলে না। বরং গাড়ির পিছনে কী আছে এ ব্যাপারেও সজাগ থাকতে হয়। গাড়ির জন্য দর্পণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য অঙ্গ। এজন্য গাড়ি চালককে গাড়িতে উঠার পরপরই দর্পণগুলোকে ঠিকমত উপযোজন করতে হয়।

৮.৯ পাহাড়ি রাস্তার অদৃশ্য বাঁক
Blind turns on hilly roads

নিরাপদ গাড়িচালনা সকল গাড়িচালকের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। এছাড়া খারাপ আবহাওয়া যেমন– বৃষ্টিপাত, কুয়াশার মাঝে গাড়ি চালানো আরও কঠিন কাজ। বিশেষত পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানো অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা পার্বত্য সড়ক যেমন আকাবাঁকা, তেমনি যথেষ্ট উঁচু নিচু [চিত্র : ৮.২১]। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়িচালনার জন্য অনেক সময় ৯০° কোণে বাঁক নিতে হয়। এই বাঁক নেওয়ার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অদৃশ্য বাঁকে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির চালক পরস্পরকে দেখতে পান না, এছাড়া বাঁকের অপর পাশে কী আছে তা আদৌ তারা জানেন না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিপজ্জনক বাঁকে ৪৫° কোণে বৃহৎ আকৃতির সমতল দর্পণ বসানো হয়। এর ফলে গাড়িচালকগণ বাঁকের আশেপাশে সবকিছু দেখতে পান এবং নিরাপদে গাড়ি চালাতে সক্ষম হন। মনে রাখতে হবে, পাহাড়ি রাস্তায় বাঁকে কখনো জোরে গাড়ি চালানো ঠিক নয়। এছাড়া জরুরি কোনো কাজ না থাকলে রাতের বেলায় পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানো উচিত নয়। কেননা আলোক স্বল্পতার জন্য রাতের বেলায় দৃষ্টিগ্রাহ্যতা অনেক কমে যায়।

চিত্র : ৮.২১

৮.১০ বিবর্ধন
Magnification

আমরা যখন কোনো দর্পণ বা লেন্সে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব দেখি, তখন সেটি লক্ষবস্তুর তুলনায় বড়, ছোট বা সমান আকারের হতে পারে।

কোনো দর্পণ বা লেন্সে গঠিত প্রতিবিম্ব বস্তুর চেয়ে আকারে কতটুকু বড় বা ছোট বিবর্ধন দ্বারা তা পরিমাপ করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য ও লক্ষবস্তুর দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে রৈখিক বিবর্ধন বা সংক্ষেপে বিবর্ধন বলে।

যদি l দৈর্ঘ্যের একটি বস্তুর জন্য কোনো দর্পণ বা লেন্সে l' দৈর্ঘ্যের একটি প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তবে ঐ বস্তুর বিবর্ধন হবে l' ও l এর অনুপাতের সমান।

$$\text{অর্থাৎ, } m = \frac{l'}{l} \tag{8.3}$$

বিবর্ধনকে লক্ষবস্তুর দূরত্ব ও প্রতিবিম্বের দূরত্বের সাহায্যে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়,

$$m = -\frac{v}{u}$$

u এবং v এর যথাযথ চিহ্নসহকারে মান বসালে m যদি ধনাত্মক হয় তাহলে প্রতিবিম্বটি সোজা হবে। আর m ঋণাত্মক হলে প্রতিবিম্ব উল্টা হবে।

বিবর্ধন m এর মান থেকে আমরা প্রতিবিম্ব লক্ষবস্তুর তুলনায় কতগুণ বড় বা ছোট তা জানতে পারি।

অনুসন্ধান : ৮.১

অবতল দর্পণ ব্যবহার করে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি ও প্রদর্শন

উদ্দেশ্য : ল্যাবরেটরিতে অবতল দর্পণ ব্যবহার এবং বাস্তব প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করা।

যন্ত্রপাতি : একটি অবতল দর্পণ।

কাজের ধারা :

১. একটি অবতল দর্পণ নাও।
২. দর্পণটি নিয়ে তোমার ল্যাবরেটরির দরজা অথবা জানালার নিকট দাঁড়াও।
৩. এবার দর্পণটিকে বাহিরের কোনো দৃশ্য যেমন–গাছপালা, দালান ইত্যাদির দিকে ধরো।
৪. দর্পণটিকে ডানে বামে নড়াচড়া করে তোমার খুব নিকটবর্তী মসৃণ দেয়ালে ঐ দৃশ্যের প্রতিবিম্ব তৈরি কর।
৫. প্রতিবিম্বটিকে স্পষ্ট করার জন্য দর্পণটিকে দেয়াল হতে সামনে বা পিছনে সরাও।
৬. কোনো একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে তুমি বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেয়ালে দেখতে পাবে।
৭. এভাবে দূরের বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেয়ালে প্রদর্শন করা যায়।
৮. প্রতিবিম্বের প্রকৃতি আলোচনা কর।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দাও

১. উত্তল দর্পণ কোথায় ব্যবহার হয়?

ক. গাড়িতে খ. টর্চ লাইটে
গ. সৌরচুল্লীতে ঘ. রাডারে

২. প্রতিফলন কত প্রকার?

ক. ৪ খ. ৩
গ. ২ ঘ. ১

৩. সমতল দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব–

i. আকারে লক্ষ বস্তুর সমান
ii. পর্দায় গঠন করা যায়
iii. দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্বের সমান দূরত্বে গঠিত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

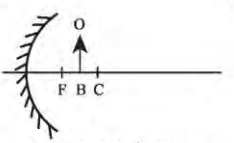

চিত্রের আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৪. *BO* বস্তুর প্রতিবিম্বের আকৃতি কিরূপ হবে–

ক. বিবর্ধিত খ. খর্বিত
গ. অত্যন্ত বিবর্ধিত ঘ. অত্যন্ত খর্বিত

৫. BO বস্তুর প্রতিবিম্বের অবস্থান কোথায় হবে?

ক. ফোকাস ও মেরুর মাঝে
খ. প্রধান ফোকাসে
গ. বক্রতার কেন্দ্রে
ঘ. বক্রতার কেন্দ্র ও অসীমের মাঝে।

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

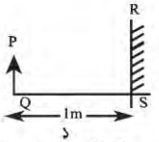

১

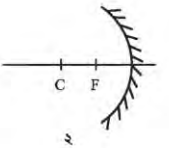

২

ক) সমতল দর্পণ কী?

খ) দর্পণের পিছনে ধাতুর প্রলেপ লাগানো হয় কেন?

গ) চিত্র এঁকে দর্পণ থেকে PQ বস্তুর প্রতিবিম্বের অবস্থান নির্ণয় কর।

ঘ) প্রতিবিম্ব গঠনের ক্ষেত্রে ১এবং ২নম্বর দর্পণের তুলনা কর।

২।

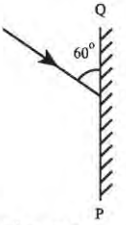

ক) প্রতিবিম্ব কাকে বলে?

খ) দর্পণে লম্বভাবে আপতিত রশ্মি একইপথে ফিরে আসে কেন?

গ) চিত্রের আলোকে প্রতিফলন কোণের মান নির্ণয় কর

ঘ) PQ দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্ব অবাস্তব চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

গ. সাধারণ প্রশ্ন

১। আলোর প্রতিফলন বলতে কী বোঝ ?

২। নিয়মিত প্রতিফলন ও ব্যাপ্ত প্রতিফলন বলতে কী বোঝ ?

৩। দর্পণ কাকে বলে ?

৪। প্রতিবিম্ব কাকে বলে? প্রতিবিম্ব কয় প্রকার ও কী কী ?

৫। অবতল দর্পণে কীভাবে বাস্তব প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় তা রশ্মি চিত্রের সাহয্যে দেখাও।

৬। অবতল দর্পণে কীভাবে অবাস্তব প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় তা চিত্রসহ বর্ণনা কর।

নবম অধ্যায়

আলোর প্রতিসরণ

REFRACTION OF LIGHT

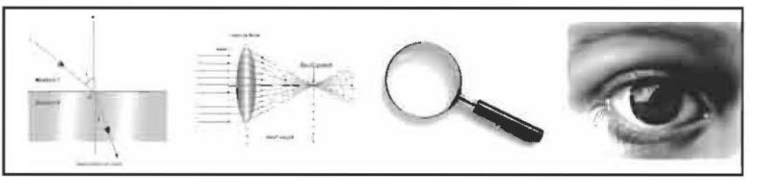

[একটা লাঠিকে তির্যকভাবে পানির মধ্যে ডুবালে বাঁকা দেখায়। জল ভরা স্বচ্ছ পানির দিকে উপর থেকে তাকালে জগের তলা উপরে উঠেছে বলে মনে হয়। এসব ঘটনা আমরা দৈনন্দিন জীবনে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছি। এ ঘটনাগুলোর মূলে রয়েছে আলোর একটা বিশেষ ধর্ম যা হচ্ছে 'প্রতিসরণ'। প্রতিসরণের একটা বিশেষ ঘটনা হচ্ছে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্যই মরুভূমিতে মরীচিকার সৃষ্টি হয়, হীরককে উজ্জ্বল দেখায়, অপটিক্যাল ফাইবারের সাহায্যে তথ্য সংকেত প্রেরণ করা হয়। আমরা অনেকেই দৃষ্টির ত্রুটি দূর করার জন্য চশমা ব্যবহার করে থাকি। এই চশমার কাচ একটা লেন্স। আমরা এই অধ্যায়ে এসব বিষয় আলোচনা করব।]

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

১. প্রতিসরণের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারব

২. প্রতিসরণাঙ্ক ব্যাখ্যা করতে পারব

৩. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ব্যাখ্যা করতে পারব

৪. অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব

৫. লেন্স এবং এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব

৬. আলোকরশ্মির ক্রিয়ারেখা অঙ্কন করে লেন্স সংক্রান্ত বিভিন্ন রাশি বর্ণনা করতে পারব

৭. লেন্সে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব আলোক রশ্মির ক্রিয়ারেখা অঙ্কন করে বর্ণনা করতে পারব

৮. লেন্সের ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে পারব

৯. আলোক রশ্মির ক্রিয়ারেখা অঙ্কন করে চোখের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব

১০. স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম বিন্দু ব্যাখ্যা করতে পারব

১১. দৃষ্টির ত্রুটি ব্যাখ্যা করতে পারব

১২. আলোক রশ্মির ক্রিয়ারেখা অঙ্কন করে দৃষ্টির ত্রুটি সংশোধনে লেন্সের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব

১৩. রঙিন বস্তুর আলোকীয় উপলব্ধি ব্যাখ্যা করতে পারব

১৪. দৈনন্দিন জীবনে আলোর প্রতিসরণের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব

৯.১ আলোর প্রতিসরণ
Refraction of light

চিত্র ৯.১ লক্ষ কর। এখানে বায়ু এবং কাচ দুইটি মাধ্যম দেখানো হয়েছে। আলোক রশ্মি বায়ু মাধ্যমে AB পথে এসে মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদতল PQ এর B বিন্দুতে তির্যকভাবে আপতিত হলো। সোজা পথে গেলে আলো কাচের মধ্যে BC' পথে যেতো কিন্তু তা না যেয়ে BC পথে বেঁকে গিয়েছে। আলোক রশ্মির এই বেঁকে যাবার ঘটনাই হচ্ছে প্রতিসরণ। সুতরাং আলোক রশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যমের থেকে ভিন্ন স্বচ্ছ মাধ্যমে তির্যকভাবে প্রবেশ করলে দুই মাধ্যমের বিভেদতলে এর দিক পরিবর্তিত হয়। আলোক রশ্মির এই দিক পরিবর্তনের ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।

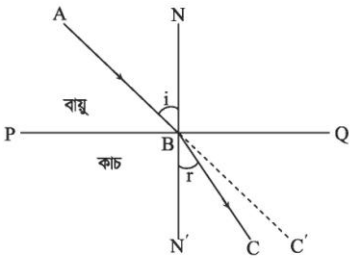

চিত্র : ৯.১

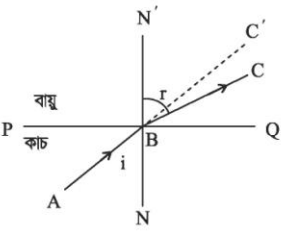

চিত্র : ৯.২

চিত্র ৯.১ এ AB আপতিত রশ্মি, BC প্রতিসৃত রশ্মি এবং NBN', B বিন্দুতে PQ এর উপর অঙ্কিত অভিলম্ব। $\angle ABN$ কে আপতন কোণ i এবং $\angle N'BC$ কে প্রতিসরণ কোণ r বলে।

বিভিন্ন মাধ্যমে আলোর বেগ বিভিন্ন তাই মাধ্যম পরিবর্তনের সময় আলোর প্রতিসরণ ঘটে। আলোক রশ্মি হালকা মাধ্যম (যেমন বায়ু) থেকে ঘন মাধ্যমে (যেমন কাচে) প্রতিসৃত হলে প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের দিকে বেঁকে যায় অর্থাৎ $i > r$। আবার বিপরীতভাবে ঘন মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি হালকা মাধ্যমে প্রতিসৃত হলে (চিত্র ৯.২) আলোক রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে বেঁকে যাবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে $r > i$।

করে দেখ : একটি সাদা কাগজের উপর একটি বিন্দু O নাও এবং তার উপর একটি স্বচ্ছ কাচের ফলক রাখ। কী দেখলে?

O বিন্দু O' বিন্দুতে উঠে এসেছে। আলোর প্রতিসরণের জন্য এরূপ ঘটে। O বিন্দু থেকে আগত আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে এসে হালকা মাধ্যমে প্রতিসৃত হয় (চিত্র ৯.৩) ফলে অভিলম্ব থেকে প্রতিসৃত রশ্মিগুলো দূরে বেঁকে যায়। প্রতিসৃত রশ্মিগুলোকে পিছনে বর্ধিত করলে O' বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয়। O' বিন্দু O বিন্দুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব। তাই উপর থেকে দেখলে O বিন্দু O' বিন্দুতে উঠে এসেছে বলে মনে হয়।

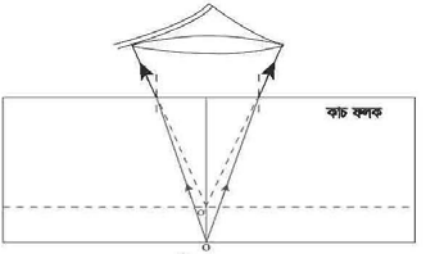

চিত্র : ৯.৩

আলোর প্রতিসরণের সূত্র

আমরা ইতোমধ্যে চিত্র : ৯.১ (এখানে চিত্র : ৯.৪) এ লক্ষ করেছি AB আপতিত রশ্মি, BC প্রতিসৃত রশ্মি এবং NBN', B বিন্দুতে PQ এর উপর অঙ্কিত অভিলম্ব। $\angle ABN$ কে আপতন কোণ i এবং $\angle N'BC$ কে প্রতিসরণ কোণ r বলে।

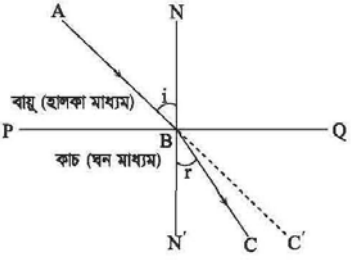

চিত্র : ৯.৪

এখন যদি আপতন কোণ বৃদ্ধি করা হয় তবে প্রতিসরণ কোণও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণের সমানুপাতিক হবে না, অর্থাৎ আপতন কোণ i দ্বিগুণ করলে প্রতিসরণ কোণ r দ্বিগুণ হবে না। দেখা গেছে i_1, i_2, i_3 ..... আপতন কোণের জন্য প্রতিসরণ কোণ যথাক্রমে r_1, r_2, r_3 ..... ইত্যাদি হলে, $\frac{\sin i_1}{\sin r_1} = \frac{\sin i_2}{\sin r_2} = \frac{\sin i_3}{\sin r_3} =$ ..... $=$ ধ্রুবক হবে। এই ধ্রুবকটির মান নির্ভর করবে আপতন ও প্রতিসরণ মাধ্যমের প্রকৃতি এবং আপতিত আলোর বর্ণের উপর। আবার দেখা যাচ্ছে AB, BC এবং অভিলম্ব NBN' তিনটি রেখাই তোমার বইয়ের পৃষ্ঠার সমতলে আছে। এর থেকে দেখা যায় আলোর প্রতিসরণ নিম্নোক্ত দুইটি সূত্র মেনে চলে।

প্রথম সূত্র : আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে বিভেদতলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।

দ্বিতীয় সূত্র: একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট বর্ণের আলোক রশ্মির ক্ষেত্রে আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইন–এর অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক।

এই দ্বিতীয় সূত্রকে স্নেলের সূত্রও বলে।

৯.২ প্রতিসরণাঙ্ক
Refractive index

একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোকরশ্মি এক মাধ্যম থেকে অপর মাধ্যমে প্রতিসৃত হলে যদি আপতন কোণ i এবং প্রতিসরণ কোণ r হয় তাহলে $\frac{\sin i}{\sin r}$ যে ধ্রুব সংখ্যা হয় তাকে বলা হয় ঐ বর্ণের আলোর জন্য প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক। একে η দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

আলোকরশ্মি যদি a মাধ্যম থেকে b মাধ্যমে প্রবেশ করে তবে, a মাধ্যমের সাপেক্ষে b মাধ্যমের আপেক্ষিক প্রতিসরণাঙ্ক, (চিত্র ৯.৫)

$$_a\eta_b = \frac{\sin i}{\sin r} \qquad (9.1)$$

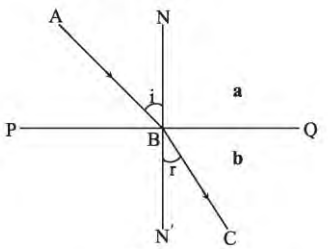

চিত্র : ৯.৫

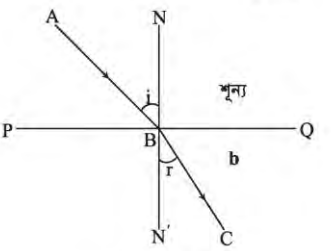

চিত্র : ৯.৬

η এর নিচে ডানদিকের অক্ষরটি নির্দেশ করে কোন মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক এবং বামদিকের অক্ষরটি নির্দেশ করে কোন মাধ্যমের সাপেক্ষে।

আবার শূন্যস্থান থেকে যখন আলোক রশ্মি কোনো মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন মাধ্যমের যে প্রতিসরণাঙ্ক হয় তাকে ঐ বর্ণের জন্য ঐ মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ক বলে (চিত্র ৯.৬)। যদি শূন্যস্থান থেকে b মাধ্যমে আলো প্রতিসৃত হয় তবে, b মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ক $\eta_b = \frac{\sin i}{\sin r}$। এক্ষেত্রে η এর বামদিকে কিছু না লিখে কেবল ডানদিকে মাধ্যম লেখা হয়। যেমন b মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ক η_b।

আবার আলোকরশ্মি যদি b মাধ্যম থেকে a মাধ্যমে প্রবেশ করে তবে সেক্ষেত্রে আলোকরশ্মির প্রত্যাবর্তনের সূত্রানুসারে (৯.৫ চিত্রে) CB হবে আপতিত রশ্মি, BA প্রতিসৃত রশ্মি,অর্থাৎ আপতন কোণ = r ও প্রতিসরণ কোণ = i এবং b মাধ্যমের সাপেক্ষে a মাধ্যমের আপেক্ষিক প্রতিসরণাঙ্ক হবে [সমীকরণ ৯.১ অনুসারে]

$$_b\eta_a = \frac{\sin r}{\sin i} = \frac{1}{\sin i / \sin r} = \frac{1}{_a\eta_b} \qquad (9.2)$$

সুতরাং মনে রাখতে হবে

$${}_b\eta_a = \frac{1}{{}_a\eta_b}$$ এবং বিপরীতক্রমে $${}_a\eta_b = \frac{1}{{}_b\eta_a}$$

আবার,

প্রতিসরণাঙ্ককে আলোর বেগের সাহায্যেও প্রকাশ করা যায়,

$${}_a\eta_b = \frac{a \text{ মাধ্যমে আলোর বেগ}}{b \text{ মাধ্যমে আলোর বেগ}}$$ এবং

$${}_o\eta_b = \frac{\text{শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ}}{b \text{ মাধ্যমে আলোর বেগ}}$$ ।

যে মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক বেশি সেই মাধ্যম বেশি ঘন এবং তাতে আলোর বেগ কম। আর যে মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক কম সেই মাধ্যম কম ঘন এবং তাতে আলোর বেগ বেশি।

গাণিতিক উদাহরণ ৯.১ : বায়ু থেকে পানিতে প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আপতন কোণ 30^0 এবং প্রতিসরণ কোণ 19^0 হলে, বায়ু সাপেক্ষে পানির প্রতিসরণাঙ্ক কত ?

আমরা জানি, $$\frac{\sin i}{\sin r} = \eta$$

$${}_a\eta_w = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin 30}{\sin 19} = \frac{0.5}{0.325} = 1.538$$

উত্তর : নির্ণেয় প্রতিসরণাঙ্ক 1.538

দেওয়া আছে,
আপতন কোণ $i = 30^0$
প্রতিসরণ কোণ $r = 19^0$
বায়ু সাপেক্ষে পানির প্রতিসরণাঙ্ক
${}_a\eta_w = ?$

গাণিতিক উদাহরণ ৯.২ : বায়ুর সাপেক্ষে পানির প্রতিসরণাঙ্ক 1.33 হলে পানি সাপেক্ষে বায়ুর প্রতিসরণাঙ্ক কত ?

আমরা জানি

$${}_w\eta_a = \frac{1}{{}_a\eta_w}$$

$$= \frac{1}{1.33} = 0.75$$

দেওয়া আছে,
বায়ুর সাপেক্ষে পানির প্রতিসরণাঙ্ক, ${}_a\eta_w = 1.33$
পানির সাপেক্ষে বায়ুর প্রতিসরণাঙ্ক, ${}_w\eta_a = ?$

উ : 0.75

৯.৩ ক্রান্তি কোণ ও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন
Critical angle and total internal reflection

ক্রান্তি কোণ : ঘন মাধ্যম থেকে আলোকরশ্মি যখন হালকা মাধ্যমে প্রতিসৃত হয় তখন প্রতিসৃত রশ্মিটি হালকা মাধ্যমে অভিলম্ব থেকে আরও দূরে বেঁকে যায়, ফলে আপতন কোণের চেয়ে প্রতিসরণ কোণ বড় হয়।

১. ধরি, AB হলো কাচ এবং বায়ু মাধ্যমের বিভেদ তল। কাচ ঘন মাধ্যম এবং বায়ু হালকা মাধ্যম। কাচের মধ্যে P বিন্দু থেকে PQ রশ্মি ক্ষুদ্র আপতন কোণে AB বিভেদ তলের Q বিন্দুতে আপতিত হলে বায়ু মাধ্যমে প্রতিসৃত রশ্মি QR হবে [চিত্র : ৯.৭ ক]। এক্ষেত্রে আপতন কোণ ($\angle PQN'$) এর চেয়ে প্রতিসরণ কোণ ($\angle NQR$) বড় হবে।

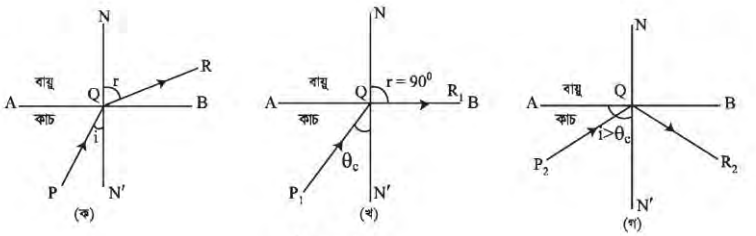

চিত্র : ৯.৭

২. এখন ঘন মাধ্যমে আপতন কোণ বৃদ্ধি করলে, হালকা মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণও বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে আপতন কোণ বৃদ্ধি করলে শেষে একটি বিশেষ আপতন কোণ $\angle P_1QN'$ পাওয়া যাবে (চিত্র ৯.৭ খ) যার জন্য প্রতিসৃত রশ্মি QR_1 মাধ্যম দুইটির বিভেদ তল AB বরাবর চলে যাবে অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ $\angle NQR_1 = 90^0$ হবে। এই অবস্থায় ঘন মাধ্যমের আপতন কোণটিকে ($\angle P_1QN'$) হালকা মাধ্যমের সাপেক্ষে ঘন মাধ্যমের ক্রান্তি কোণ বলে। ৯.৭ খ চিত্রে $\angle P_1QN' = \theta_c$ = ক্রান্তি কোণ। এই ক্রান্তি কোণের মানও মাধ্যমদ্বয়ের প্রকৃতি এবং আলোর বর্ণের উপর নির্ভর করে।

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন : ঘন মাধ্যমে আপতন কোণটিকে ক্রান্তি কোণের চেয়ে আরও একটু বাড়ালে ($i > \theta_c$) আলোক রশ্মির সবটুকুই দুই মাধ্যমের বিভেদতলে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে ঘন মাধ্যমেই ফিরে আসে। এই অবস্থায় আর কোনো প্রতিসৃত রশ্মি পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় মাধ্যম দুইটির বিভেদতল দর্পণের মত আচরণ করে। এই ঘটনাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

[চিত্র ৯.৭ গ] এ ঘন মাধ্যমে আপতন কোণ $\angle P_2QN'$ মাধ্যম দুটির ক্রান্তি কোণ θ_c এর চেয়ে বড়। সেইজন্য P_2Q রশ্মিটি দুই মাধ্যমের বিভেদ তল AB এর উপর আপতিত হয়ে প্রতিফলনের নিয়মানুসারে QR_2 পথে প্রতিফলিত হয়েছে।

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্ত :

- আলোকরশ্মিকে অবশ্যই ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমের অভিমুখে যেতে হবে এবং দুই মাধ্যমের বিভেদতলে আপতিত হতে হবে।
- ঘন মাধ্যমে আপতন কোণ ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় হতে হবে।

৯.৪ মরীচিকা

Mirage

মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত পথিক সময়ে দূরবর্তী গাছের উল্টানো প্রতিবিম্ব দেখে মনে করেন সেখানে পানি আছে। কিন্তু গাছের কাছে গেলে তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন যে সেখানে কোনো পানি নাই। আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্যই এ রকম হয়। এটাই মরীচিকা।

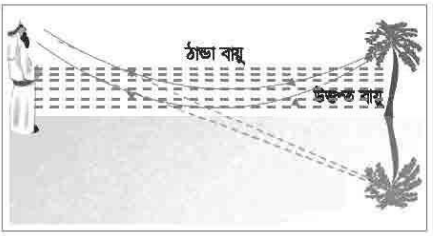

চিত্র : ৯.৮

সূর্যের প্রচণ্ডতাপে মরুভূমির বালি উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বালিসংলগ্ন বায়ুস্তরগুলোও গরম হয়ে উঠে। নিচের বায়ু উত্তপ্ত ও হালকা হয়, তবে উপরের বায়ু নিচের বায়ু স্তরের তুলনায় ঠান্ডা থাকায় ঘন থাকে। এখন গাছ থেকে যে আলো আসে তা ঘনতর মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করতে থাকে। এর ফলে প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এক সময় ঐ আলোকরশ্মি কোনো একটি বায়ুস্তরে ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হয় ও আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে। ঐ সময়েই গাছের উল্টানো প্রতিবিম্ব দেখা যায় [চিত্র: ৯.৮], যাকে আমরা মরীচিকা বলি।

পর্যবেক্ষণ: গ্রীষ্মকালে প্রখর রোদে পিচ ঢালা পথে হাঁটার সময় বা যানবাহনে যাবার সময় মাঝে মধ্যে হয়তো দেখে থাকবে রাস্তা চিকচিক করছে। মনে হবে যেন রাস্তায় পানি জমেছে। এখানেও মরুভূমির মরিচিকার ন্যায় ঘটনা ঘটেছে।

৯.৫ অপটিক্যাল ফাইবার বা আলোকীয় তন্তু
Optical fibre

অপটিক্যাল ফাইবার তৈরি করা হয় কাচ বা প্লাস্টিকের খুব সরু, দীর্ঘ নমনীয় অথচ নিরেট ফাইবার বা তন্তু দ্বারা। এই ফাইবারের পদার্থের প্রতিসরণাঙ্ক 1.7। ফাইবারের উপর অপেক্ষাকৃত কম প্রতিসরণাঙ্কের (1.5) পদার্থের একটি আবরণ দেওয়া হয়। ফাইবারের একপ্রান্তে ক্ষুদ্র কোণে আপতিত আলোক রশ্মি ফাইবারের ভিতরে বারবার পূর্ণ অভ্যন্তরীণভাবে প্রতিফলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত অন্য প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে আসে।

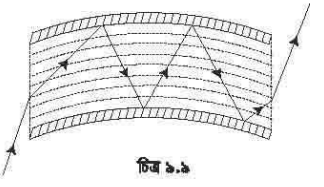

চিত্র ৯.৯

ফাইবারটি বাঁকা বা পাকানো অবস্থায় থাকলেও আলোক এর ভিতর দিয়ে প্রায় কোনো শক্তিক্ষয় ছাড়াই পাঠানো যায় (চিত্র ৯.৯)। একগুচ্ছ অপটিক্যাল ফাইবারকে আলোক নল বলে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্র এবং টেলিকমিউনিকেশনে অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার

কোনো রোগীর পাকস্থলির ভিতরের দেয়াল পরীক্ষা করতে হলে একটি আলোক নলকে মুখের ভিতর দিয়ে পাকস্থলিতে ঢোকানো হয়। এই আলোক নলের এক সেট আলোকীয় তন্তু দিয়ে আলো পাঠিয়ে পাকস্থলির দেয়ালের সংশ্লিষ্ট অংশকে আলোকিত করা হয়, অন্য সেট দিয়ে ওই আলোকিত অংশকে বাইরে থেকে দেখা যায়। এই পদ্ধতি এন্ডোস্কোপি নামে পরিচিত। এভাবে আলোক নল ঢুকিয়ে রক্তবাহী ধমনি বা শিরার ব্লক বা হৃৎপিন্ডের ভালভগুলোর ক্রিয়া দেখা যায়।

একস্থান থেকে অন্যস্থানে বৈদ্যুতিক সংকেত আদানপ্রদানের জন্য অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হয়; অবশ্য আগে বৈদ্যুতিক সংকেতকে প্রথমে আলোক সংকেতে রূপান্তরিত করে নিতে হয়। প্রায় ২০০০ টেলিফোন সংকেতকে এভাবে একসঙ্গে একটি অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে সঞ্চালন করা যায়। এতে সংকেতগুলোর তীব্রতার প্রায় কোনো পরিবর্তন হয় না। অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

৯.৬ লেন্স ও তার প্রকারভেদ

Lenses and their classification

দুইটি গোলীয় পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনো স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমকে লেন্স বলে।

লেন্স দুই রকমের হয় : উত্তল লেন্স বা অভিসারী লেন্স ও অবতল লেন্স বা অপসারী লেন্স।

উত্তল লেন্স : যে লেন্সের মধ্যভাগ পুরু এবং প্রান্তভাগ সরু তাকে উত্তল লেন্স বলে। উত্তল লেন্সের উপর সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ আপতিত হলে প্রতিসরণের পর নির্গত হওয়ার সময় অভিসারী করে বলে উত্তল লেন্সকে অভিসারী লেন্সও বলে [চিত্র : ৯.১০ ক]।

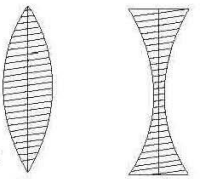

ক খ

চিত্র : ৯.১০

অবতল লেন্স : যে লেন্সের মধ্যভাগ সরু এবং প্রান্তভাগ ক্রমশ পুরু তাকে অবতল লেন্স বলে। অবতল লেন্সে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ আপতিত হলে প্রতিসরণের পর নির্গত হওয়ার সময় অপসারী হয় বলে অবতল লেন্সকে অপসারী লেন্সও বলে [চিত্র ৯.১০ খ]।

৯.৭ লেন্স সংক্রান্ত কয়েকটি সংজ্ঞা

Few definitions related to lens

বক্রতার কেন্দ্র : লেন্সের উভয় পৃষ্ঠই এক একটি নির্দিষ্ট গোলকের অংশ। প্রত্যেক গোলকের কেন্দ্রকে ঐ পৃষ্ঠের বক্রতার কেন্দ্র বলে। ৯.১১ নং চিত্রে C_1 এবং C_2, LN লেন্সের দুইটি বক্রতা কেন্দ্র। যদি লেন্সের কোনো একটি পৃষ্ঠ গোলীয় না হয়ে সমতল হয় তবে তার বক্রতা কেন্দ্র অসীমে অবস্থিত হবে।

প্রধান অক্ষ : লেন্সের দুইটি গোলীয় পৃষ্ঠ থাকে। এই পৃষ্ঠদ্বয়ের বক্রতা কেন্দ্র দুইটিকে যোগ করলে যে সরলরেখা পাওয়া যায় তাকে ঐ লেন্সের প্রধান অক্ষ বলে। ৯.১১নং চিত্রে, C_1C_2 সরলরেখাটি লেন্সের প্রধান অক্ষ।

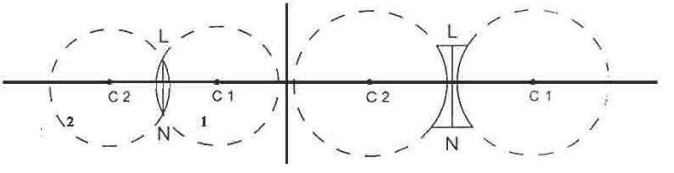

চিত্র : ৯.১১

আলোক কেন্দ্র : আলোক কেন্দ্র হলো লেন্সের মধ্যে প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দু, যার মধ্য দিয়ে কোনো রশ্মি অতিক্রম করলে প্রতিসরণের পর লেন্সের অপর পৃষ্ঠ থেকে নির্গত হওয়ার সময় আপতিত রশ্মির সমান্তরালভাবে নির্গত হয়। ৯.১২ নং চিত্রে লেন্সের একপৃষ্ঠে PQ রশ্মি আপতিত হয়ে QR পথে প্রতিসৃত হয়েছে। এই রশ্মি অপর পৃষ্ঠ থেকে RS পথে নির্গত হয়েছে। নির্গত রশ্মি RS এবং আপতিত রশ্মি PQ পরস্পর সমান্তরাল। এখন লেন্সের মধ্যে প্রতিসৃত রশ্মি QR প্রধান অক্ষ C_1C_2 কে O বিন্দুতে ছেদ করেছে, O বিন্দু হলো লেন্সের আলোক কেন্দ্র।

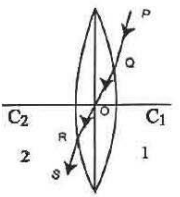

পুরু লেন্স

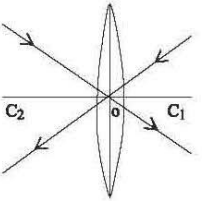

পাতলা লেন্স

চিত্র : ৯.১২

লেন্সটি যদি পাতলা হয় তবে আলোক কেন্দ্র হচ্ছে লেন্সের মধ্যে অবস্থিত প্রধান অক্ষের উপর এমন একটি বিন্দু যে বিন্দু দিয়ে আলোক রশ্মি আপতিত হলে দিক পরিবর্তন না করে প্রতিসৃত হয়।

প্রধান ফোকাস : লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এবং নিকটবর্তী রশ্মিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের উপর যে বিন্দুতে মিলিত হয় (উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে) অথবা যে বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় (অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে), সেই বিন্দুকে লেন্সের প্রধান ফোকাস বলে। ৯.১৩ নং চিত্রে লেন্সের প্রধান ফোকাস F।

ফোকাস দূরত্ব : লেন্সের আলোক কেন্দ্র থেকে প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে ফোকাস দূরত্ব বলে। ৯.১৩ নং চিত্রে OF লেন্সের ফোকাস দূরত্ব। ফোকাস দূরত্বকে f দ্বারা সূচিত করা হয়।

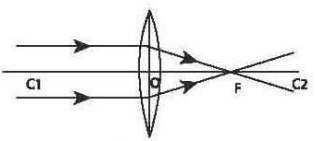

উত্তল লেন্স

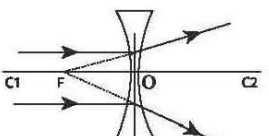

অবতল লেন্স

চিত্র : ৯.১৩

ফোকাস তল : প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে লেন্সের প্রধান অক্ষের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত কল্পিত সমতলকে লেন্সের ফোকাস তল বলে। ৯.১৪ নং চিত্রে $ABCD$ হচ্ছে ফোকাস তল।

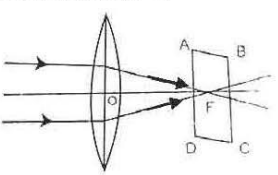

চিত্র ৯.১৪

লেন্সে রশ্মি চিত্র অঙ্কনের নিয়মাবলী

১. লেন্সের আলোক কেন্দ্র দিয়ে আপতিত রশ্মি প্রতিসরণের পর সোজাসুজি চলে যায় (চিত্র ৯.১৫ ক ও খ)

২. লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি প্রতিসরণের পর প্রধান ফোকাস দিয়ে যায় (উত্তল লেন্সে) [চিত্র ১৫ গ] বা প্রধান ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হয় (অবতল লেন্সে) [চিত্র ১৫ ঘ]

৩. লেন্সের প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে (উত্তল লেন্সে) [চিত্র ১৫ ঙ] বা প্রধান ফোকাস অভিমুখী (অবতল লেন্সে) [চিত্র ১৫ চ] আপতিত রশ্মি প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে যায়।

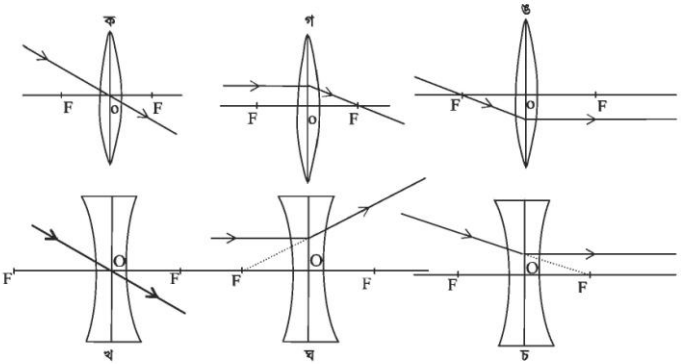

চিত্র ৯.১৫

উত্তল লেন্সে প্রতিবিম্ব গঠন

LOL_1 একটি উত্তল লেন্স। FOF' প্রধান অক্ষ, O আলোক কেন্দ্র, F প্রধান ফোকাস। এই লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর PQ একটি বস্তুকে লেন্সটির ফোকাস দূরত্বের চেয়ে বেশি কিন্তু দ্বিগুণ ফোকাস দূরত্বের কম দূরে খাড়াভাবে রাখা হলো।

এখন P থেকে আগত PR রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালভাবে এসে লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত হওয়ার পর প্রধান ফোকাস F-এর মধ্য দিয়ে RFP_1 পথে যায়। P থেকে নির্গত অন্য একটি রশ্মি PO পথে আলোক কেন্দ্র O তে আপতিত হয়ে সোজাসুজি OP_1 বরাবর প্রতিসৃত হলো। RFP_1 এবং OP_1 রশ্মি দুইটি পরস্পর P_1 বিন্দুতে ছেদ করে। P_1 বিন্দু থেকে অক্ষের উপর P_1Q_1 লম্বটানা হলো। P_1Q_1 হলো PQ এর বাস্তব প্রতিবিম্ব। এখানে OQ বস্তুর দূরত্ব এবং OQ_1 প্রতিবিম্বের দূরত্ব (চিত্র ৯.১৬)।

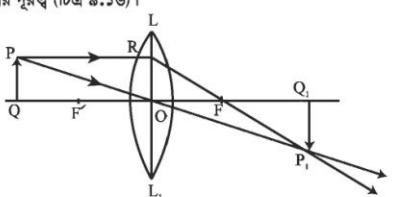

চিত্র ৯.১৬

এই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব বাস্তব, উল্টা ও বিবর্ধিত হয়েছে।

লক্ষবস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের উপর নির্ভর করে প্রতিবিম্ব বাস্তব, অবাস্তব; সোজা, উল্টা; বিবর্ধিত, খর্বিত বা আকারে সমান হতে পারে।

লক্ষবস্তু উত্তল লেন্সের প্রধান ফোকাসের ভিতরে থাকলে প্রতিবিম্ব অবাস্তব সোজা ও বিবর্ধিত হবে।

কাজ: উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে বস্তুর অবস্থানের জন্য চিত্র এঁকে প্রতিবিম্ব দেখাও।

অবতল লেন্সে প্রতিবিম্ব গঠন

ধরা যাক LOL_1 একটি অবতল লেন্স। FOF' এর প্রধান অক্ষ, O আলোক কেন্দ্র, F প্রধান ফোকাস। লেন্সের সামনে PQ একটি লক্ষবস্তু প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত (চিত্র ৯.১৭)। PQ এর প্রতিবিম্ব অঙ্কন করতে হবে।

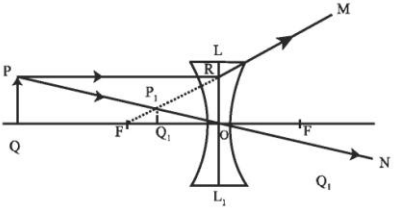

চিত্র ৯.১৭

P বিন্দু থেকে নিঃসৃত একটি আলোক রশ্মি PR প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে লেন্সে R বিন্দুতে আপতিত হলে প্রতিসরণের পর RM পথে এমনভাবে প্রতিসরিত হয় যেন রশ্মিটি প্রধান ফোকাস F থেকে আসছে বলে মনে হয়। P থেকে আর একটি রশ্মি PO আলোক কেন্দ্র দিয়ে লেন্সে আপতিত হয়ে সোজাসুজি PON পথে প্রতিসৃত হয়। এই প্রতিসৃত রশ্মি দুইটি অপসারী বলে মিলিত হয় না। এদেরকে পেছন দিকে বাড়িয়ে দিলে P_1 বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয়। সুতরাং P_1 বিন্দুই হচ্ছে P বিন্দুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব। এখন P_1 থেকে প্রধান অক্ষের উপর P_1Q_1 লম্ব টানলে P_1Q_1 হবে PQ লক্ষবস্তুর প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্ব অবাস্তব, সোজা এবং আকারে লক্ষবস্তুর চেয়ে ছোট। অবতল লেন্স সর্বদা অবাস্তব, সোজা এবং ছোট আকারের প্রতিবিম্ব গঠন করে।

লেন্স চেনার উপায় : লেন্সের খুব কাছাকাছি কিন্তু পিছনে একটা আঙুল ধরলে যদি এটিকে সোজা এবং আকারে বড় দেখায় তবে লেন্সটি উত্তল। সোজা এবং আকারে ছোট দেখালে লেন্সটি অবতল। এভাবে লেন্স সনাক্ত করা যায়।

করে দেখো : তোমার বই এর লেখার কাছাকাছি একটি উত্তল লেন্স ধর। লেখাগুলো বড় দেখতে পাচ্ছো কী ? কেন?

উত্তল লেন্স কর্তৃক প্রতিসরণের পর বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব তোমার চোখে পড়েছে বলে লেখাগুলো বড় দেখাচ্ছে।
কোনো নির্দিষ্ট লেন্সের অর্থাৎ নির্দিষ্ট ফোকাস দূরত্ব f এর লেন্সের সামনে u দূরত্বে যদি কোনো লক্ষবস্তু থাকে তাহলে যে অবস্থানে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবে তার দূরত্ব v নিম্নোক্ত সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়

$$\frac{1}{v}+\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$$

এ সমীকরণে মান বসানোর ক্ষেত্রে উত্তল লেন্সের জন্য f এর মান ধনাত্মক। অবতল লেন্সের জন্য f এর মান ঋণাত্মক এবং u এর মান ধনাত্মক বসাতে হবে। হিসাব করে v এর মান ধনাত্মক হলে প্রতিবিম্বটি বাস্তব আর ঋণাত্মক হলে প্রতিবিম্বটি অবাস্তব।

বিবর্ধন :
লেন্সের ক্ষেত্রে বিবর্ধনকে লক্ষবস্তুর দূরত্ব ও প্রতিবিম্বের দূরত্বের সাহায্যে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়।

$$m=-\frac{v}{u}$$

u এবং v এর যথাযথ চিহ্নসহকারে মান বসালে m যদি ধনাত্মক হয় তাহলে প্রতিবিম্বটি সোজা হবে। আর m ঋণাত্মক হলে প্রতিবিম্ব উল্টা হবে।

৯.৮ লেন্সের ক্ষমতা
Power of a lens

মনে করো দুইটি উত্তল লেন্স (চিত্র ৯.১৮)। প্রথমটির ফোকাস দূরত্ব বেশি এবং দ্বিতীয়টির ফোকাস দূরত্ব কম। এখন যদি একগুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মি লেন্স দুইটির প্রধান অক্ষের সমান্তরালভাবে এসে আপতিত হয় তবে তারা লেন্স কর্তৃক প্রতিসৃত হয়ে প্রধান ফোকাসে মিলিত হবে। প্রথম লেন্সের ক্ষেত্রে ঐ ফোকাস বিন্দু লেন্সের যত দূরে হবে দ্বিতীয় লেন্সের ক্ষেত্রে তা হবে না বরং কম হবে। উত্তল লেন্সের ক্ষমতা বলতে আমরা বুঝি যে ঐ লেন্স সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকে কত বেশি কাছে মিলাতে পারে বা অভিসারী করতে পারে। এক্ষেত্রে বলা যায় প্রথম লেন্সের ক্ষমতা কম আর দ্বিতীয় লেন্সের ক্ষমতা বেশি। লেন্সের ক্ষমতা কম হলে ফোকাস দূরত্ব বেশি আর ক্ষমতা বেশি হলে ফোকাস দূরত্ব কম।

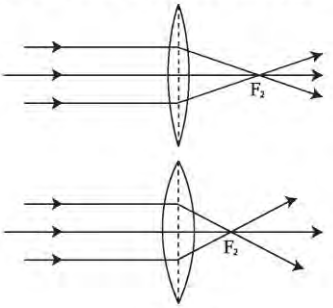

চিত্র ৯.১৮

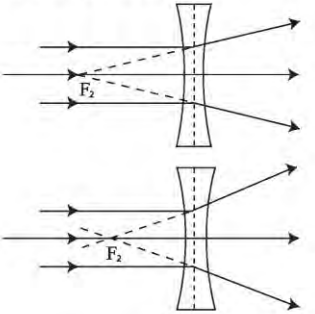

চিত্র ৯.১৯

৯.১৯ নং চিত্রে অবতল লেন্সে সমান্তরালভাবে আগত আলোক রশ্মিগুচ্ছের প্রতিসরণ দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে যে লেন্স সমান্তরালভাবে আগত আলোক রশ্মিগুচ্ছকে প্রতিসরণের পর যত বেশি ছড়িয়ে দিতে পারে বা অপসারী করতে পারে তার ক্ষমতা তত বেশি। এক্ষেত্রেও লেন্সের ফোকাস দূরত্ব যত কম, ক্ষমতা তত বেশি।

সুতরাং আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি কোনো লেন্সের অভিসারী বা অপসারী করার সামর্থ্যকে তার ক্ষমতা বলে।

ক্ষমতা P এবং ফোকাস দূরত্ব f এর মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটি হচ্ছে, $P = \frac{1}{f}$

এক মিটার ফোকাস দূরত্ববিশিষ্ট কোনো লেন্সের ক্ষমতাকে 1 ডায়াপ্টার (Dioptre) বলে। চক্ষু বিশেষজ্ঞরা চশমার কাচের যে ক্ষমতা লিখে থাকেন তা ডায়াপ্টার এককে লিখেন।

চিহ্নের প্রথা : সকল দূরত্ব লেন্সের আলোক কেন্দ্র থেকে পরিমাপ করতে হবে। সকল বাস্তব দূরত্ব ধনাত্মক, বাস্তব দূরত্ব বলতে আলোকরশ্মি প্রকৃতপক্ষে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দূরত্বকে বুঝায়। সুতরাং সকল বাস্তব লক্ষবস্তু,বাস্তব প্রতিবিম্ব বা বাস্তব ফোকাসের দূরত্বকে ধনাত্মক ধরা হয়। সকল অবাস্তব দূরত্ব ঋণাত্মক। অবাস্তব লক্ষবস্তু, অবাস্তব প্রতিবিম্ব ও অবাস্তব ফোকাস দূরত্বকে অবাস্তব দূরত্ব ধরা হয়।

উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ধনাত্মক এবং অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব উভয়ই ঋণাত্মক।

গাণিতিক উদাহরণ ৯.৩ : কোনো লেন্সের ফোকাস দূরত্ব + 0.1 m হলে ক্ষমতা কত?

আমরা জানি, $P = \frac{1}{f} = \frac{1}{+0.1\ m} = 10\ D$

উ: 10 D

দেওয়া আছে,
ফোকাস দূরত্ব, $f = +0.1$ m
ক্ষমতা, $P = ?$

৯.৯ চোখের গঠন

১. **অক্ষিগোলক (Eye-ball) :** চোখের কোটরের মধ্যে অবস্থিত এর গোলাকার অংশকে অক্ষিগোলক বলে। এর সামনে ও পিছনের অংশ খানিকটা চ্যাপ্টা। এটি চোখের কোটরের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সীমার চারদিকে ঘুরতে পারে।

২. **শ্বেতমণ্ডল (Sclerotic) :** এটি শক্ত, সাদা, অস্বচ্ছ তন্তু দিয়ে তৈরি অক্ষিগোলকের বাইরের আবরণ (চিত্র ৯.২০)। এটি চোখের আকৃতি ঠিক রাখে। বাইরের নানা প্রকার অনিষ্ট হতে চোখকে রক্ষা করে।

৩. **কর্নিয়া (Cornea) :** এটি শ্বেতমণ্ডলের সামনের অংশ। শ্বেতমণ্ডলের এ অংশ স্বচ্ছ এবং বাইরের দিকে কিছুটা উত্তল।

৪. **কৃষ্ণমণ্ডল (Choroid) :** শ্বেতমণ্ডলের ভিতরের গায়ে কালো রঙের একটি আস্তরণ থাকে যাকে কৃষ্ণমণ্ডল বলে। এই কালো আস্তরণের জন্য চোখের ভিতরে অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয় না।

চিত্র : ৯.২০

৫. **আইরিস (Iris) :** কর্নিয়ার ঠিক পিছনে অবস্থিত একটি অস্বচ্ছ পর্দাকে আইরিস বলে। আইরিসের রং বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের হয়। সাধারণত এর রং কালো, হালকা নীল বা গাঢ় বাদামী হয়। আইরিস চক্ষু লেন্সের উপর আপতিত আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৬. **চোখের মণি ও তারারন্ধ্র (Pupil) :** আইরিসের মাঝখানে একটি ছোট ছিদ্র থাকে। একে চোখের মণি বা তারারন্ধ্র বলে। তারারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে আলো চোখের ভিতরে প্রবেশ করে।

৭. **চক্ষুলেন্স (Eye Lens) :** চোখের মণির ঠিক পিছনে অবস্থিত এটি চোখের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি স্বচ্ছ জৈব পদার্থের তৈরি। লেন্সের পিছনের দিকের বক্রতা সামনের দিকের বক্রতার চেয়ে কিছুটা বেশি। লেন্সটি অক্ষিগোলকের সাথে সিলিয়ারি মাংসপেশি ও সাসপেনরি লিগামেন্ট দ্বারা আটকানো থাকে। এই মাংসপেশি ও লিগামেন্টগুলোর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে চক্ষু লেন্সের বক্রতা পরিবর্তিত হয় ফলে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন ঘটে। দূরের বা কাছের জিনিস দেখার জন্য চক্ষু লেন্সের ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়।

৮. **রেটিনা (Retina) :** চক্ষু লেন্সের পেছনে অবস্থিত অক্ষিগোলকের ভিতরের পৃষ্ঠের গোলাপী রঙের ঈষদচ্ছ আলোক সংবেদন আবরণকে রেটিনা বলে। এটি রড ও কোন (rods & cones) নামে কতগুলো স্নায়ুতন্তু দ্বারা তৈরি। এই তন্তুগুলো চক্ষু স্নায়ুর সাথে সংযুক্ত থাকে। রেটিনার উপর আলো পড়লে তা ঐ স্নায়ুতন্তুতে এক প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি করে ফলে মস্তিষ্কে দর্শনের অনুভূতি জাগে।

৯. **অ্যাকুয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার (Aqueous humour and vitreous humour) :** কর্নিয়া ও চক্ষু লেন্সের মধ্যবর্তী স্থান যে স্বচ্ছ লবণাক্ত জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে তাকে অ্যাকুয়াস হিউমার বলে। রেটিনা ও চক্ষু লেন্সের মধ্যবর্তী স্থান যে জেলি জাতীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে তাকে ভিট্রিয়াস হিউমার বলে।

চোখের উপযোজন : একটি উত্তল লেন্সের সামনে ফোকাস দূরত্বের বাইরে কোনো বস্তু রাখলে লেন্সের পিছনে বস্তুটির একটি বাস্তব প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। লেন্সের পিছনে একট পর্দা রাখলে পর্দার উপর বস্তুটির একটি উল্টো প্রতিবিম্ব দেখা যায়। পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে পর্দাটির একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে প্রতিবিম্ব সবচেয়ে পরিষ্কার হয়। একটি বস্তুকে যদি লেন্সের নিকটে আনা হয় বা লেন্স থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে পরিষ্কার প্রতিবিম্ব পাওয়ার জন্য পর্দাটিকে সামনে বা পিছনে সরাতে হয়। এখন আমরা যদি পর্দার পূর্ব অবস্থানে পরিষ্কার বিম্ব পেতে চাই তাহলে ভিন্ন ফোকাস দূরত্বের লেন্স ব্যবহার করতে হবে।

চোখের ক্ষেত্রে ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটে। কর্নিয়া, অ্যাকুয়াস হিউমার, চক্ষু লেন্স ও ভিট্রিয়াস হিউমার একত্রে একটি অভিসারী লেন্সের কাজ করে। চোখের সামনে কোনো বস্তু থাকলে সেই বস্তুর প্রতিবিম্ব যদি রেটিনার উপর পড়ে তাহলে মস্তিষ্কে দর্শনের অনুভূতি জাগে এবং আমরা সেই বস্তু দেখতে পাই। আমরা চোখের সাহায্যে বিভিন্ন দূরত্বের বস্তু দেখি। চোখের লেন্সের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এর আকৃতি প্রয়োজন মতো বদলে যায় ফলে ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন ঘটে। ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তনের ফলে লক্ষবস্তুর যেকোনো অবস্থানের জন্য লেন্স থেকে একই দূরত্বে অর্থাৎ রেটিনার উপর স্পষ্ট বিম্ব গঠিত হয়। যেকোনো দূরত্বের বস্তু দেখার জন্য চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করার এই ক্ষমতাকে চোখের উপযোজন বলে।

স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব : আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যেকোনো বস্তুকে চোখের যত নিকটে নিয়ে আসা যায় বস্তুটিও তত স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু কাছে আনতে আনতে এমন একটা দূরত্ব আসে যখন আর বস্তুটি খুব স্পষ্ট দেখা যায় না। যে ন্যূনতম দূরত্ব পর্যন্ত চোখ বিনা শ্রান্তিতে স্পষ্ট দেখতে পায় তাকে স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব বলে। স্বাভাবিক চোখের জন্য স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার। চোখ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার দূরবর্তী বিন্দুকে চোখের নিকট বিন্দু বলে। কোনো বস্তু ২৫ সেন্টিমিটারের কম দূরত্বে থাকলে তাকে স্পষ্ট দেখা যায় না।

সবচেয়ে বেশি যে দূরত্বে কোনো বস্তু থাকলে তা স্পষ্ট দেখা যায় তাকে চোখের দূরবিন্দুও বলে। স্বাভাবিক চোখের জন্য দূরবিন্দু অসীম দূরত্বে অবস্থিত হয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক চোখ বহুদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায়।

দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকাল : চোখের সামনে কোনো বস্তু রাখলে রেটিনায় তার প্রতিবিম্ব গঠিত হয় এবং আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। এখন যদি বস্তুটিকে চোখের সম্মুখ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সরিয়ে নেওয়ার 0.1 সেকেন্ড পর্যন্ত এর অনুভূতি মস্তিষ্কে থেকে যায়। এই সময়কে দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকাল বলে।

দুইটি চোখ থাকার সুবিধা : দুইটি চোখ দিয়ে একটি বস্তু দেখলে আমরা কেবলমাত্র একটি বস্তুই দেখতে পাই। যদিও প্রত্যেকটি চোখ আপন আপন রেটিনায় প্রতিবিম্ব গঠন করে, কিন্তু মস্তিষ্ক দুইটি ভিন্ন প্রতিবিম্বকে একটি প্রতিবিম্বে পরিণত করে। দুইটি চোখ থাকার জন্য দূরত্ব নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায়। তাই একটি চোখ বন্ধ রেখে সুইয়ে সুতা পরাতে খুবই অসুবিধা হয়। তাছাড়া বস্তুর তুলনায় দুইটি চোখের বিভিন্ন অবস্থানের জন্য ডান চোখ ডান দিকটা বেশি এবং বাম চোখ বাম দিকটা বেশি দেখে। দুই চোখ দিয়ে বস্তু দেখলে দুইটি ভিন্ন প্রতিবিম্বের উপরিপাত ঘটবে এবং বস্তুকে ভালোভাবে দেখা যাবে।

৯.১০ চোখের ক্রিয়া

Function of an eye

পূর্বেই আমরা জেনেছি যে,আমাদের চোখের মণির ঠিক পিছনে একটি করে উত্তল লেন্স আছে যার নাম চক্ষু লেন্স। দূরের বা কাছের জিনিস দেখার জন্য চক্ষু লেন্সের ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়।

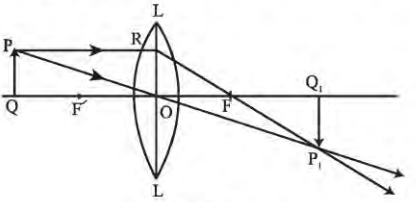

চিত্র : ৯.২১

চিত্রে চক্ষু লেন্স দেখানো হয়েছে। চোখের সামনে তথা লেন্সের সামনে PQ একটি বস্তু। বস্তুটির P বিন্দু থেকে একটি আলোকরশ্মি PR, প্রধান অক্ষের সমান্তরালে যেয়ে লেন্সের R বিন্দুতে আপতিত হলো। লেন্সে প্রতিসরণের পর তা RFP_1 পথে গেল। P থেকে আর একটি আলোকরশ্মি PO পথে লেন্সের আলোককেন্দ্র আপতিত হয়ে সোজাসুজি OP_1 বরাবর প্রতিসৃত হলো। RP_1 এবং OP_1 প্রতিসৃত রশ্মি দুইটি P_1 বিন্দুতে মিলিত হলো। এবার প্রধান অক্ষের উপর P_1Q_1 লম্ব আঁকলে P_1Q_1 হবে PQ এর বাস্তব ও উল্টা প্রতিবিম্ব।

প্রতিবিম্বটি যেখানে গঠিত হলো তা হলো চোখের রেটিনা। এটি রড ও কোন (rods and cones) নামে কতগুলো আলোক সংবেদনশীল কোষ তথা স্নায়ুতন্তু দ্বারা তৈরি। রেটিনার উপর বিম্ব বা আলো পড়লে তা ঐ স্নায়ুতন্তুতে এক প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি করে ফলে মস্তিষ্কে দর্শনের অনুভূতি জাগে এবং আমরা সেই বস্তু দেখতে পাই।

উল্লেখ্য যে রেটিনার উপর বস্তুর উল্টো প্রতিবিম্ব পড়ে। এই অনুভূতি চক্ষু নার্ভের সাহায্যে মস্তিষ্কে চলে যায়। রেটিনায় গঠিত বস্তুর প্রতিবিম্ব উল্টো হলেও মস্তিষ্কের বিশেষ প্রক্রিয়ার জন্য আমরা বস্তুকে সোজা দেখি।

৯.১১ চোখের ত্রুটি ও তার প্রতিকার

Defects of vision and their remedy

স্বাভাবিক চোখের দৃষ্টির পাল্লা 25 cm থেকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ, স্বাভাবিক চোখ 25 cm থেকে অসীম দূরত্বের মধ্যে যেকোনো বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায়। যদি কোনো চোখ এই পাল্লার মধ্যে কোনো বস্তুকে স্পষ্ট দেখতে না পায় তাহলে সেই চোখ ত্রুটিপূর্ণ বলে ধরা হয়। চোখে প্রধানত দুই ধরনের ত্রুটি দেখা যায়। যথা–

১. হ্রস্ব দৃষ্টি (Short sight or Myopia)

২. দীর্ঘ দৃষ্টি (Long sight or Hypermetropia)

১. হ্রস্ব দৃষ্টি: এই ত্রুটিগ্রস্ত চোখ দূরের জিনিস ভালোভাবে দেখতে পায় না কিন্তু কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায়। এমনকি এই চোখের নিকট বিন্দু 25 cm এরও কম হয়।সুতরাং চোখের নিকটবিন্দু 25 cm এরও কম হলে সেটাও হ্রস্ব দৃষ্টি।

কারণ : অক্ষিগোলকের ব্যাসার্ধ বেড়ে গেলে বা চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কমে গেলে অর্থাৎ অভিসারী ক্ষমতা বেড়ে গেলে এই ত্রুটি দেখা দেয় [৯.২২ (ক)]।

ত্রুটির ফল : এক্ষেত্রে অনেক দূরবর্তী বস্তু থেকে আগত সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ চোখের লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে রেটিনার সামনে I বিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র ৯.২২ (ক)] ফলে লক্ষবস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না। এই চোখের দূরবিন্দু অসীমের পরিবর্তে F বিন্দুতে হয় তাই এই চোখ F এর বেশি দূরের কোনো বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় না [চিত্র ৯.২২ (খ)]

প্রতিকার : চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা বেড়ে যাবার জন্য এই ত্রুটির উদ্ভব হয়। দৃষ্টির এ ত্রুটি সংশোধন করার জন্য সহায়ক লেন্স বা চশমা হিসেবে অবতল লেন্স ব্যবহার করা হয় চিত্র ৯.২২ (গ)।

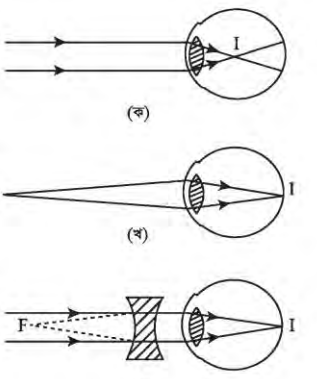

চিত্র : ৯.২২

তাছাড়া একমাত্র অবতল লেন্সই লক্ষবস্তুর চেয়েও নিকটে সোজা ও অবাস্তব প্রতিবিম্ব গঠন করে বলে এক্ষেত্রে চোখের লেন্সের সামনে সহায়ক লেন্স বা চশমা হিসেবে অবতল লেন্স ব্যবহার করতে হবে। এই লেন্সেটির ক্ষমতা তথা ফোকাস দূরত্ব এমন হবে যা অসীম দূরত্বে অবস্থিত লক্ষবস্তুর প্রতিবিম্ব ত্রুটিপূর্ণ চোখের দূরবিন্দুতে গঠন করে [চিত্র ৯.২২ (গ)]। আমরা জানি অসীম দূরত্বে অবস্থিত লক্ষবস্তুর প্রতিবিম্ব ফোকাসে গঠিত হয়। সুতরাং অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ত্রুটিপূর্ণ চোখের দূরবিন্দুর দূরত্বের সমান হতে হবে।

২. দীর্ঘদৃষ্টি : এই ত্রুটিগ্রস্ত চোখ দূরের জিনিস দেখতে পায় কিন্তু কাছের জিনিস স্পস্ট দেখতে পায় না। চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে গেলে অর্থাৎ, অভিসারী ক্ষমতা কমে গেলে চোখে এ ধরনের ত্রুটি দেখা দেয় [চিত্র ৯.২৩ (ক)]।

ত্রুটির ফল: এক্ষেত্রে চোখের সামনে লক্ষবস্তু থেকে আগত আলোক রশ্মিগুচ্ছ চোখের লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে রেটিনার পেছনে I বিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র ৯.২৩ (ক)]। ফলে লক্ষবস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না। [এই চোখের নিকট বিন্দু N থেকে দূরে সরে O বিন্দুতে চলে যায় যা 25cm চেয়ে অনেক বেশি। তাই এ চোখে O এর চেয়ে নিকটবর্তী স্থানের বস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না [চিত্র ৯.২৪ (খ)]।

প্রতিকার : চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা কমে যাওয়ার দরুন এ ত্রুটির উদ্ভব হয়। তাই এ ত্রুটি দূর [চিত্র ৯.২৩ (গ)] করতে চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা বাড়াতে হয়। এ জন্যে সহায়ক লেন্স হিসেবে উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়।

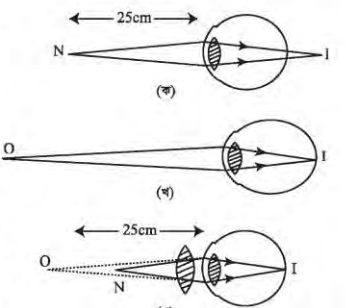

চিত্র : ৯.২৩

তাছাড়া একমাত্র উত্তল লেন্সই লক্ষবস্তুর চেয়েও দূরে সোজা অবাস্তব প্রতিবিম্ব গঠন করে। এক্ষেত্রে তাই চোখের লেন্সের সামনে সহায়ক লেন্স বা চশমা হিসেবে এমন ক্ষমতা তথা ফোকাস দূরত্ববিশিষ্ট উত্তল লেন্স ব্যবহার করতে হবে যা স্বাভাবিক চোখের নিকট বিন্দু N এ স্থাপিত লক্ষবস্তুর বিম্ব ত্রুটিপূর্ণ চোখের নিকট বিন্দু O তে গঠন করে [চিত্র ৯.২৩ (গ)]।

৯.১২ রঙিন বস্তুর আলোকীয় উপলব্ধি

Perceptions of coloured objects

আমরা যখন কোনো বস্তু দেখি তখন বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে। চক্ষু লেন্স কর্তৃক উক্ত আলো প্রতিসরিত হয়ে বস্তুর একটি প্রতিবিম্ব রেটিনায় গঠন করে। রেটিনায় বহুসংখ্যক স্নায়ু থাকে যারা এই অনুভূতি মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। মস্তিষ্কে নিখুঁত বিশ্লেষণের পর আমরা সেই বস্তুকে দেখতে পাই। রেটিনা থেকে যে নার্ভগুলো মস্তিষ্কে গিয়েছে সেগুলোর নাম রড ও কোন (rods and cones)। এদের মধ্যে কোনগুলো বর্ণ সংবেদনশীল (colour sensitive)। তিন ধরনের কোণ আছে নীলবর্ণ সংবেদনশীল কোন, লাল বর্ণ সংবেদনশীল কোন এবং সবুজ বর্ণ সংবেদনশীল কোন। কোনো বর্ণ যতই মিশ্র বা জটিল হোক না কেন চোখ সকল বর্ণকে মাত্র এই তিনটি বর্ণে ধারণ করে। রেটিনার কোনগুলো এই ধারণকৃত তথ্য মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। মস্তিষ্ক আবার বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সকল বর্ণকে আলাদা করে দেয়। এভাবেই আমরা রঙিন বস্তুর আলোকীয় উপলব্ধি পাই।

৯.১৩ দৈনন্দিন জীবনে আলোর প্রতিসরণের ব্যবহার

Uses of refraction in our daily life

আমাদের চোখে একটি উত্তল লেন্স আছে। যখন আমরা কোনো বস্তু দেখি তখন আলো ঐ বস্তু থেকে এসে চোখের লেন্স কর্তৃক প্রতিসৃত হয়ে রেটিনার উপর পড়ে। রেটিনায় ঐ বস্তুর একটি বাস্তব ও উল্টা প্রতিবিম্ব গঠন করার পর আমরা বস্তুকে দেখতে পাই। সুতরাং আমাদেরকে দেখার কাজে সাহায্য করছে আলোর প্রতিসরণ।

অনেকের চোখে দৃষ্টির ত্রুটি আছে। কেউ হয়তো কাছের বস্তু দেখে না কেউ আবার দূরেরটা দেখে না। এসব ত্রুটি দূর করার জন্য আমরা নির্দিষ্ট ক্ষমতার লেন্স দ্বারা তৈরি চশমা ব্যবহার করি। চশমার মধ্য দিয়ে আগত আলোক রশ্মি প্রতিসৃত হয়ে চোখে পড়ে এবং বস্তু সঠিকভাবে দেখতে সহায়তা করে। সুতরাং দৃষ্টির ত্রুটি দূর করতে আলোর প্রতিসরণ কাজ করে।

আমরা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলি, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে অতিক্ষুদ্র জিনিস বড় করে দেখি, টেলিস্কোপ দিয়ে দূরের জিনিস কাছে দেখি এসব যন্ত্রেই আলোর প্রতিসরণ ধর্মকে ব্যবহার করা হয়।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ও টেলিকমিউনিকেশনে আমরা যে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে থাকি তাও আলোর প্রতিসরণ ধর্মের অবদান।

আমাদের অনেকের ঘরে মাছের এ্যাকুরিয়াম আছে। এখানে কিছু রঙিন মাছ রাখলে তাদের মজার গতিবিধি দেখা যায়। মাছ থেকে প্রথমে আলো পানির মধ্য দিয়ে এসে কাচের বক্সে আপতিত হয়। কাচে প্রতিসরণের পর আমাদের চোখে সেই দৃশ্য আসে। সুতরাং এখানেও প্রতিসরণের অবদান রয়েছে।

অনুসন্ধান : ৯.১

উত্তল লেন্স ব্যবহার করে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি ও প্রদর্শন

উদ্দেশ্য : ল্যাবরেটরিতে উত্তল লেন্স ব্যবহার এবং বাস্তব প্রতিবিম্ব সৃষ্টি।

যন্ত্রপাতি : একটি উত্তল লেন্স।

কাজের ধারা

১. একটি উত্তল লেন্স নাও।
২. লেন্সটি নিয়ে তোমার ল্যাবরেটরির দরজা অথবা জানালার নিকট দাঁড়াও।
৩. এবার লেন্সটিকে বাহিরের কোনো দৃশ্য যেমন–গাছপালা, দালান ইত্যাদির দিকে ধরো।
৪. লেন্সটিকে ডানে বামে নড়াচড়া করে লেন্সের পেছনের রাখা সাদা কাগজের উপর ঐ দৃশ্যের প্রতিবিম্ব তৈরি কর।
৫. প্রতিবিম্বটিকে স্পষ্ট করার জন্য লেন্সটিকে কাগজ হতে সামনে বা পিছনে সরাও।
৬. কোনো একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে তুমি বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব কাগজে দেখতে পাবে।
৭. এভাবে দূরের বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেয়ালে প্রদর্শন করা যায়।
৮. প্রতিবিম্বের গঠন আলোচনা কর।

অনুসন্ধান : ৯.২

বিভিন্ন ব্যক্তির চোখের স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব নির্ণয় ও ব্যবহারযোগ্য চশমা সনাক্তকরণ

উদ্দেশ্য : স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব পরিমাপ করে চোখের ত্রুটি চিহ্নিত করা ও ব্যবহারযোগ্য চশমা সনাক্ত করা।

উপকরণ : খবরের কাগজ অথবা বই।

কাজের ধারা

১. তোমার শিক্ষক, সহপাঠী, মা বাবা, বড় ভাই বোনদের মধ্য থেকে চশমা ব্যবহার করে না এমন পাঁচজনকে বাছাই কর।
২. বাছাইকরা একজনকে খবরের কাগজটি পড়তে দাও।
৩. তিনি খবরের কাগজটি চোখ থেকে যে অবস্থানে রেখে ভালোভাবে পড়তে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সে অবস্থানটি চিহ্নিত কর।
৪. এবার একটি সেন্টিমিটার স্কেল ব্যবহার করে চোখ থেকে খবরের কাগজের অবস্থান পরিমাপ কর। এটাই তার স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব।
৫. এইভাবে পাঁচজন ব্যক্তিরই স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব পরিমাপ করে ছকে লিখ।
৬. ছক থেকে প্রত্যেকের স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব যাচাই (25cm এর কম বা বেশি হলে) করে প্রয়োজনীয় চশমা সুপারিশ করতে পার।
৭. ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আলাদা স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব হওয়ার কারণ আলোচনা কর।

পর্যবেক্ষণ ছক

ব্যক্তির নাম	আনুমানিক বয়স	স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব	সুপারিশকৃত চশমা (প্রয়োজন হলে)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও

১। ঘন মাধ্যমের ভিতরে রাখা কোনো বস্তুকে হালকা মাধ্যম থেকে দেখলে এর প্রতিবিম্ব কোথায় হবে?

ক) উপরের দিকে উঠে আসবে খ) নিচের দিকে সরে যাবে

গ) একই জায়গায় থাকবে। ঘ) পাশে সরে যাবে

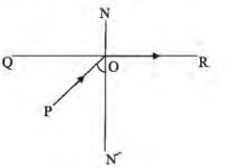

পাশের চিত্র থেকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

২। এখানে প্রতিসরণ কোণ কত?

ক) 0^0 খ) 90^0

গ) 180^0 ঘ) 45^0

৩। আপতন কোণটি যদি আরও বড় হয় তাহলে কী ঘটবে ?

ক) পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিসরণ খ) পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

গ) প্রতিসরণ ঘ) প্রতিফলন

৪। উত্তল লেন্সে প্রতিবিম্ব অঙ্কনের ক্ষেত্রে সচরাচর ব্যবহৃত রশ্মি চিত্র –

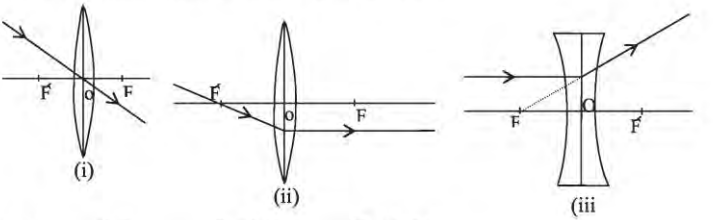

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৫। লেন্সের ক্ষমতার একক কোনোটি ?

ক) ডায়াপ্টার খ) ওয়াট

গ) অশ্ব ক্ষমতা ঘ) কিলোওয়াট-ঘণ্টা

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দশম শ্রেণির ছাত্রী শিউলী শ্রেণি কক্ষে ব্ল্যাক বোর্ডের লেখা ভালভাবে দেখতে পায় না। ফলে ডাক্তারের সরনাপন্ন হলে ডাক্তার তাকে $-2D$ ক্ষমতাসম্পন্ন লেন্স চশমা হিসাবে ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন।

ক) লেন্স কাকে বলে?

খ) স্পর্শ না করে কীভাবে একটি লেন্স সনাক্ত করা যায়?

গ) শিউলীর চশমার ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় কর।

ঘ) শিউলীকে ঋণাত্মক (–) ক্ষমতার লেন্স ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়ার যৌক্তিকতা লিখ।

দশম অধ্যায়

স্থির তড়িৎ

STATIC ELECTRICITY

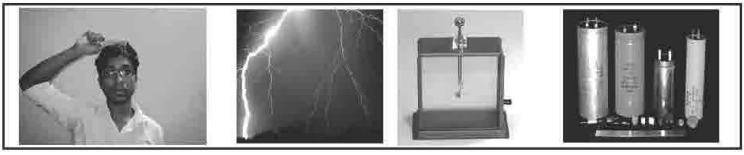

[আমরা জানি প্রত্যেক পদার্থেই প্রোটন ও ইলেকট্রন থাকে। তুমি কি জান যে তোমার শরীরে 10^{28} টি এর চেয়েও বেশি প্রোটন এবং প্রায় সমান সংখ্যক ইলেকট্রন আছে। এই ইলেকট্রন ও প্রোটনের একটি মৌলিক ধর্ম হচ্ছে আধান (Charge)। প্রোটনের আধানকে ধনাত্মক ও ইলেকট্রনের আধানকে ঋণাত্মক ধরা হয়। আহিত বস্তু পরস্পরের উপর বল প্রয়োগ করে – যা তড়িৎ বল নামে পরিচিত। তড়িৎ বল প্রকৃতির একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বল। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব কীভাবে কোনো বস্তুকে আহিত করা যায়। আমরা আরো দেখব কীভাবে আধানের অস্তিত্ব বোঝা যায়, কীভাবে তাদের মধ্যকার বল হিসাব করতে হয়। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচিত আধানগুলো একস্থানে স্থির থাকবে। এই জন্য আমরা এই অধ্যায়কে স্থির তড়িৎ হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। আমরা সবশেষে এই স্থির আধানের ব্যবহার এবং এর থেকে কিছু বিপদ ও সেই বিপদ থেকে কীভাবে সাবধান থাকতে হবে তাও আলোচনা করব।]

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

১. পরমাণু গঠনের ভিত্তিতে আধান সৃষ্টির মৌলিক কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

২. ঘর্ষণ ও আবেশ প্রক্রিয়ায় আধান সৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে পারব।

৩ তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আধান সনাক্তকরণ করতে পারব।

৪ কুলম্বের সূত্র ব্যবহার করে তড়িৎ বল পরিমাপ করতে পারব।

৫. তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

৬ তড়িৎ বলরেখার দিক তড়িৎ ক্ষেত্রের দিককে নির্দেশ করে ব্যাখ্যা করতে পারব।

৭. তড়িৎ বিভব ব্যাখ্যা করতে পারব।

৮. তড়িৎ শক্তি সংরক্ষণে ধারকের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।

৯. স্থির তড়িৎ ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।

১০. স্থির তড়িৎ বিপদজনক ঝুঁকি হতে রক্ষার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।

১০.১ আধান
Charge

এক শীতের সকালে সৌরভ তার প্লাস্টিকের চিরুনীটি হাতে নিল চুল আচড়ানোর জন্য। কিন্তু চুল আঁচড়ানোর আগে সৌরভ চিরুনীটিকে তার উলের পুলওভারের সাথে কিছুক্ষণ ঘষে নিল। এবার চুল আচড়াতে গেলে সে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করল যে ঐ চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ানো যাচ্ছে না, চুলগুলো সব খাড়া হয়ে গেছে যেন পরস্পরকে বিকর্ষণ করে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। সৌরভ এখন চিরুনীটিকে টেবিলের কাছে আনতেই দেখতে পেল যে, টেবিলের উপর পড়ে থাকা টুকরো কাগজগুলোকে চিরুনীটি আকর্ষণ করছে। সৌরভের মত এ রকম অভিজ্ঞতা হয়তো তোমাদের অনেকেরই হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দেখি যে আমাদের চারপাশের অনেক জিনিসই সৌরভের চিরুনীর মত আচরণ করে।

করে দেখ : তোমার প্লাস্টিকের স্কেলটিকে তোমার শুকনো চুলের সাথে কিছুক্ষণ ঘষে কতগুলো কাগজের টুকরোর কাছে ধর । কী দেখতে পেলে?

আমরা দেখি যে, কোনো বস্তু বিশেষ অবস্থায় অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে বা তড়িৎগ্রস্থ বা আহিত হয় অর্থাৎ বস্তুতে তড়িতের উৎপত্তি হয়। এই তড়িৎ যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানেই থাকে বলে একে স্থির তড়িৎ বলা হয়। এখন দেখা যাক, তড়িৎগ্রস্থ বা আহিত হওয়া বলতে আমরা কী বুঝি ?

আমরা জানি প্রত্যেক পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। এদেরকে পরমাণু বলে। প্রত্যেক পদার্থের পরমাণু নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন দ্বারা গঠিত। নিউক্লিয়াসের মধ্যে দুই ধরনের কণা থাকে–প্রোটন ও নিউট্রন। পদার্থ সৃষ্টিকারী মৌলিক কণাসমূহের (ইলেক্ট্রন ও প্রোটন) মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্মই হচ্ছে আধান বা চার্জ। ইলেকট্রনের আধানকে ঋণাত্মক এবং প্রোটনের আধানকে ধনাত্মক ধরা হয়। নিউট্রন তড়িৎ নিরপেক্ষ অর্থাৎ এতে কোনো আধান নেই।একটি প্রোটনে আধানের পরিমাণ ইলেকট্রনের আধানের সমান। স্বাভাবিকভাবে একটি পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যার সমান থাকে। ফলে একটা গোটা পরমাণুতে কোনো তড়িৎ ধর্ম প্রকাশ পায় না। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন হয়।

কোনো পরমাণুতে যতক্ষণ পর্যন্ত ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তা নিস্তড়িৎ বা তড়িৎ নিরপেক্ষ থাকে। কিন্তু পরমাণুতে এদের সংখ্যা সমান না হলে পরমাণু তড়িৎগ্রস্থ হয় অর্থাৎ আহিত হয়। কোনো পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে গেলে প্রোটনের আধিক্য দেখা দেয়। এ অবস্থাকে বলা হয় ধনাত্মক আধানে আহিত হওয়া। আবার এই বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন অপর কোনো পরমাণুর সাথে যুক্ত হলে সে পরমাণুতে প্রোটনের চেয়ে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যায়, ফলে ঋণাত্মক আধানে আহিত হয়। পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি হওয়াকে আহিত হওয়া বলে।

যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ তথা আধান সহজে চলাচল করতে পারে তাদেরকে পরিবাহক বা পরিবাহী বলে, যেমন ধাতব পদার্থ, মাটি, মানবদেহ প্রভৃতি। সাধারণত ধাতব পদার্থ তড়িৎ সুপরিবাহী হয়। তামা, রুপা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি সুপরিবাহী। অপর পক্ষে যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ তথা আধান চলাচল করতে পারে না তাদেরকে অন্তরক বা অপরিবাহী বলে, যেমন কাঠ, কাগজ, কাচ ইত্যাদি।

১০.২ ঘর্ষণ দ্বারা আহিতকরণ
Electrification by friction

পরীক্ষণ: একটি হালকা শোলার বলকে একটি সুতার সাহায্যে কোন স্ট্যান্ড বা হুক থেকে ঝুলিয়ে দাও। এখন একটি শুকনো সিল্কের কাপড়ের টুকরা দিয়ে একটি শুকনো কাচদন্ডের একপ্রান্ত ভালোভাবে ঘষো। কাচদন্ড ও সিল্কের কাপড়ের টুকরা সূর্যের কিরণে শুকিয়ে গরম করে নিলে ভালো হয়। এখন কাচদন্ডের ঘষা প্রান্তটি মুক্তভাবে ঝুলানো হালকা শোলার বলের কাছে আনো। কী দেখতে পেলে? কাঁচদন্ড শোলারবলকে আকর্ষণ করে।

স্বাভাবিক অবস্থায় পদার্থের পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটন সমপরিমাণে থাকে। তবে প্রত্যেক পরমাণুরই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইলেকট্রনের প্রতি আসক্তি থাকে। ইলেকট্রনের প্রতি এই আসক্তি বিভিন্ন

চিত্র : ১০.১

চিত্র : ১০.২

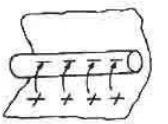

চিত্র : ১০.৩

বস্তুতে বিভিন্ন রকম। তাই দুইটি বস্তুকে যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আনা হয় তখন যে বস্তুর ইলেকট্রন আসক্তি বেশি সে বস্তু অপর বস্তুটি থেকে ইলেকট্রন সংগ্রহ করে ঋণাত্মক আধানে আহিত হয়। একটি কাচদণ্ডকে সিল্ক দ্বারা ঘষলে এরকম ঘটনা ঘটে (চিত্র ১০.১)। সিল্কের ইলেকট্রন আসক্তি কাচের চেয়ে বেশি বলে, এদের যখন পরস্পরের সাথে ঘষা হয়, তখন কাচ থেকে ইলেকট্রন সিল্কে চলে যায়। এর ফলে সিল্ক ঋণাত্মক আধানে এবং কাচদণ্ড ধনাত্মক আধানে আহিত হয়। এজন্য কাচদণ্ড শোলাকণাকে আকর্ষণ করে (চিত্র ১০.২)। আবার ফ্লানেলের কাপড়ের সাথে ইবোনাইট বা পলিথিন দণ্ড ঘষলে, পলিথিন দণ্ড ঋণাত্মক আধানে আহিত এবং ফ্লানেলের কাপড় ধনাত্মক আধানে আহিত হয়। কারণ, পলিথিনের ইলেকট্রন আসক্তি ফ্লানেলের চেয়ে বেশি বলে, পরস্পরের সাথে ঘর্ষণের ফলে ফ্লানেলের কাপড় থেকে ইলেকট্রন পলিথিন দণ্ডে চলে আসে (চিত্র ১০.৩)।

১০.৩ তড়িৎ আবেশ

Electric induction

আমরা দেখেছি যে, দুইটি বস্তুর পারস্পরিক ঘর্ষণের ফলে আধানের উদ্ভব হয়। আবার আহিত বস্তুকে অনাহিত বস্তুর সংস্পর্শে আনলে অনাহিত বস্তুটি আহিত হয়। কিন্তু অনাহিত বস্তুকে আহিত বস্তুর সংস্পর্শে না এনে শুধু কাছাকাছি নিয়ে এলেও এটি আহিত হয়। তড়িৎ আবেশের জন্য এরকম হয়।একটি আহিত বস্তুর কাছে এনে স্পর্শ না করে শুধুমাত্র এর উপস্থিতিতে কোনো অনাহিত বস্তুকে আহিত করার পদ্ধতিকে তড়িৎ আবেশ বলে। নিচের সহজ পরীক্ষার সাহায্যে তড়িৎ আবেশ ব্যাখ্যা করা যায়।

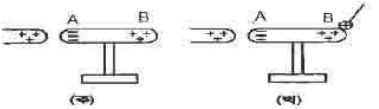

চিত্র : ১০.৪

পরীক্ষণ : রাবারের হাতল বিশিষ্ট একটি শুকনো কাচদণ্ডকে রেশম দিয়ে ভালো করে ঘষে এর এক প্রান্ত হাতে ধরে অপর প্রান্ত একটি অনাহিত পরিবাহী দণ্ড AB এর A প্রান্তের নিকটে আনলে পরিবাহীর মুক্ত ইলেকট্রনগুলো কাচদণ্ডের ধনাত্মক আধান দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে A প্রান্তে সরে আসে (চিত্র ১০.৪ ক)। ফলে B প্রান্তে ইলেকট্রন ঘাটতি সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ B প্রান্ত ধনাত্মক আধানে আহিত হয় এবং A প্রান্ত ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয়। আধান সংগ্রাহক [একটি অপরিবাহী হাতলের প্রান্তে লাগানো ক্ষুদ্র ধাতব পাত বা কলা দিয়ে B প্রান্ত থেকে কিছু আধান সংগ্রহ করে (চিত্র ১০.৪ খ) তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর প্রকৃতি নির্ণয় করলে, উপরিউক্ত বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে।

এখানে নতুন কোনো আধান উৎপন্ন হয় না। আহিত কাচদণ্ডের উপস্থিতির কারণে সমপরিমাণ বিপরীত জাতীয় আধান পৃথক হয়ে পরিবাহীর দুই প্রান্তে সরে গেছে মাত্র। যতক্ষণ কাচদণ্ডটি AB পরিবাহীর কাছে থাকবে ততক্ষণ বিপরীত আধান এভাবে পৃথক হয়ে পরিবাহীর দুই প্রান্তে অবস্থান করবে। উপরের পরীক্ষায় কাচদণ্ডের ধনাত্মক আধান যা AB

পরিবাহীতে আবেশ সৃষ্টি করলে তাকে আবেশী আধান বলে। আর AB পরিবাহীতে যে আধানের সঞ্চার হয় তাকে আবিষ্ট আধান বলে।

> **সম্পূরক কার্যকলাপ** : একটি ফুলানো বেলুনকে তোমার আধার সাথে ঘষ। এরপর এটিকে ঘরের দেওয়ালের সাথে একটু খানি চেপে ধরে ছেড়ে দাও। কি দেখলে ? বেলুনটি দেওয়ালে আটকে আছে।
> **সম্পূরক কার্যকলাপ** : একটি প্লাস্টিকের বলপয়েন্ট আধার সাথে ঘষ। এরপর পানির কল থেকে পড়া একটি সরু পানির ধারার কাছে ধর। পানির ধারা বলপয়েন্ট দিকে বেঁকে আসবে।

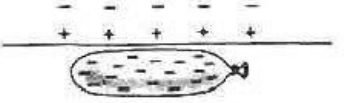

চিত্র ১০.৫

চিত্র : ১০.৬

বেলুনে সৃষ্ট ঋণাত্মক আধান দেওয়ালে আবেশ সৃষ্টি করে। দেওয়ালে আবিষ্ট ধনাত্মক আধান ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট বেলুনকে আকর্ষণ করে রাখে (চিত্র ১০.৫)। একই ঘটনা ঘটে পানির ধারায় ক্ষেত্রেও (চিত্র ১০.৬)।

১০.৪ তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র
Electroscope

গঠন : যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো বস্তুতে আধানের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় তাকে তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র বলে। এই যন্ত্রে একটি পিতল বা অন্য কোনো ধাতব দণ্ড R এর উপরে একটি ধাতব চাকতি বা গোলক আটকানো থাকে (চিত্র ১০.৭)। দণ্ডের নিচের প্রান্তে দুইটি হালকা সোনার পাত সংযুক্ত থাকে। পাত দুইটি সোনার বদলে অ্যালুমিনিয়াম বা অন্য কোনো হালকা ধাতুদ্বারা হতে পারে। পাতসহ দণ্ডের নিচের অংশ অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে তৈরি ত্রিপি C এর মধ্য দিয়ে একটি কাচ পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করানো থাকে। যন্ত্রটি কাচ পাত্রের ভিতরে থাকায় বায়ু প্রবাহ এর ক্ষতি করতে পারে না।

তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রকে আধিতকরণ : একটি কচদণ্ডকে রেশম দিয়ে ঘষলে কচদণ্ডে ধনাত্মক আধানের উদ্ভব হয়। ঐ আধিত কচদণ্ডকে তড়িৎবীক্ষণের চাকতি বা গোলকের গায়ে স্পর্শ করালে দণ্ড হতে খানিকটা আধান চাকতিতে চলে যায়। এই আধান সুপরিবাহী ধাতব দণ্ডের মধ্য দিয়ে সোনার পাতদ্বয়ে পৌঁছে। ফলে সোনার পাত দুইটি একই জাতীয় আধান পেয়ে পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। এই অবস্থায় কচদণ্ড সরিয়ে নিলে যদি পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী ফাঁক না কমে, তাহলে বুঝতে হবে যন্ত্রটি ধনাত্মক আধানে আধিত হয়েছে। কচদণ্ডকে ঋণাত্মক আধানে আধিত করতে হলে একটি ইবোনাইট দণ্ডকে ফ্লানেল দ্বারা ঘষে ঋণাত্মক আধানযুক্ত করে উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় চাকতি স্পর্শ করা হয়। এর ফলে অর্পণপাত দুইটি ঋণাত্মক আধান পেয়ে পরস্পর থেকে দূরে সরে ফাঁক হয়ে যাবে এবং সেই অবস্থায়ই থাকবে। আধান যত বেশি হবে, পাতদুটোও তত বেশি ফাঁক হয়ে যাবে।

চিত্র : ১০.৭

আধানের উপস্থিতি নির্ণয় : কোনো বস্তুতে আধানের অস্তিত্ব অর্থাৎ কোনো বস্তুতে আধান আছে কি না নির্ণয়ের জন্য বস্তুটিকে একটি অনাহিত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের চাকতির কাছে আনতে হবে। এতে যদি পাত দুইটি পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে বুঝতে হবে বস্তুটিতে আধানের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু যদি পাত দুইটি পরস্পর থেকে দূরে সরে না যায়, তাহলে বুঝতে হবে বস্তুটিতে আধান নেই।

আধানের প্রকৃতি নির্ণয় : কোনো তড়িৎগ্রস্ত বস্তুতে কী ধরনের আধান আছে তা জানতে হলে তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রটিকে প্রথমে ধনাত্মক কিংবা ঋণাত্মক আধানে আহিত করতে হবে। ধরা যাক, যন্ত্রটিকে ধনাত্মক আধানে আহিত করা হলো। ঐ অবস্থায় পাতদ্বয়ে ধনাত্মক আধান থাকায় এরা ফাঁক হয়ে যাবে। এখন পরীক্ষণীয় বস্তুটিকে তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের চাকতির সংস্পর্শে আনলে যদি পাত দুটির ফাঁক কমে যায়, তাহলে বুঝতে হবে ঐ বস্তুটি ঋণাত্মক আধানে আহিত। পক্ষান্তরে পরীক্ষণীয় বস্তুটিকে চাকতির সংস্পর্শে আনলে যদি ফাঁক বেড়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে বস্তুটি ধনাত্মক আধানে আহিত।

১০.৫ তড়িৎ বল
Electric force

বলের প্রকৃতি : একটি ধনাত্মক আধানে আহিত প্লাস্টিক দন্ডকে নাইলনের সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো (চিত্র ১০.৮ ক)। এবার একটি ঋণাত্মক আধানে আহিত পলিথিনের দন্ডকে এর নিকটে আনা হলো। কী দেখা যাবে ? প্লাস্টিকের দন্ডটি পলিথিনের দন্ডের দিকে ঘুরে যাবে। এ থেকে বুঝা যায়, দুইটি বিপরীত আধানে আহিত বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

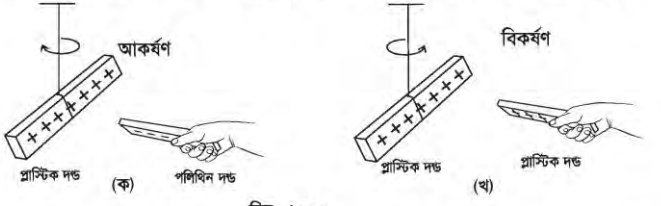

চিত্র : ১০.৮

এবার একটি ধনাত্মক আধানে আহিত প্লাস্টিক দন্ডকে ঝুলন্ত ধনাত্মক আধানে আহিত প্লাস্টিকের দন্ডের দিকে নিয়ে এলে (চিত্র ১০.৮ খ) কী দেখা যাবে? ঝুলন্ত দন্ডটি দ্রুত দূরে সরে যাবে। অর্থাৎ সমজাতীয় আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

কুলম্বের সূত্র : আমরা দেখলাম, দুইটি বিপরীত জাতীয় আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে, দুইটি সমজাতীয় আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। দুইটি আধানের মধ্যবর্তী এই আকর্ষণ বা বিকর্ষণের বলের মান নির্ভর করে,

১. আধান দুইটির পরিমাণের উপর
২. আধান দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর
৩. আধান দুইটি যে মাধ্যমে অবস্থিত তার প্রকৃতির উপর।

দুইটি আধানের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল সম্পর্কে বিজ্ঞানী কুলম্ব একটি সূত্র বিবৃত করেন। একে কুলম্বের সূত্র বলে।

চিত্র : ১০.৯

সূত্র : নির্দিষ্ট মাধ্যমে দুইটি বিন্দু আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান আধানদ্বয়ের গুণফলের সমানুপাতিক, মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই বল এদের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।

ধরা যাক, দুইটি আধানের পরিমাণ যথাক্রমে q_1 ও q_2 এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব d (চিত্র ১০.৯)। এদের মধ্যবর্তী ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল F হলে, কুলম্বের সূত্রানুসারে,

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{d^2}$$

বা, $$F = C\frac{q_1 q_2}{d^2} \qquad (10.1)$$

এখানে C একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। শূন্যস্থানের জন্য এর মান $9\times10^9\ \mathrm{Nm^2\ C^{-2}}$। একে অনেক সময় কুলম্বের ধ্রুবক বলা হয়।

আধানের একক : আধানের একক হচ্ছে কুলম্ব (C)। এটি একটি লব্ধ একক। অ্যাম্পিয়ারের সাহায্যে এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার (1 A) প্রবাহ এক সেকেন্ড (1 s) ধরে চললে এর যেকোনো প্রস্থচ্ছেদ দিয়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাকে এক কুলম্ব (1 C) বলে।

গাণিতিক উদাহরণ ১০.১: একটি 20 C এর আহিত বস্তুকে শূন্যস্থানে অপর একটি 50 C এর আহিত বস্তু থেকে 2 m দূরে রাখা হলো। এদের মধ্যবর্তী বলের মান নির্নয় কর।

আমরা জানি,

$$F = C\frac{q_1 q_2}{d^2}$$
$$= 9\times10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}\times\frac{20\ \mathrm{C}\times50\ \mathrm{C}}{(2\ \mathrm{m})^2}$$
$$= 2.25\times10^{12}\ \mathrm{N}$$

এখানে,
প্রথম আধান, $q_1 = 20$ C
দ্বিতীয় আধান, $q_2 = 50$ C
দূরত্ব, $d = 2$ m
বল, $F = ?$

১০.৬ তড়িৎ ক্ষেত্র
Electric field

ধরা যাক A একটি ধনাত্মক আধানের বস্তু। এখন P বিন্দুতে (চিত্র ১০.১০) যদি একটি আধান $+q$ রাখা হয় তাহলে A বস্তুর আধানের জন্য $+q$ আধানটি একটি বল অনুভব করবে। আমরা বলি P বিন্দুতে একটি তড়িৎ ক্ষেত্র বিরাজ করছে যার উৎস হচ্ছে আহিত বস্তু A। অর্থাৎ, একটি আহিত বস্তুর নিকটে অন্য একটি আহিত বস্তু আনলে সেটি আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল অনুভব করে। আহিত বস্তুর চারদিকে যে অঞ্চল জুড়ে এই প্রভাব বিদ্যমান থাকে সেই অঞ্চলকেই এই বস্তুটির তড়িৎ ক্ষেত্র বলে।

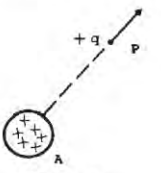

চিত্র : ১০.১০

তড়িৎ তীব্রতা: কুলম্বের সূত্র থেকে দেখা যায় যে, P বিন্দুটি A বস্তুটির যত নিকটবর্তী হয় ঐ বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের সবলতাও তত বৃদ্ধি পায়। তড়িৎ ক্ষেত্রের সবলতাকে তীব্রতা বলা হয় । তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একটি একক ধনাত্মক আধান স্থাপন করলে সেটি যে বল অনুভব করে তাকে ঐ বিন্দুর তড়িৎ তীব্রতা বলে।

যদি P বিন্দুতে স্থাপিত আধানটি F বল লাভ করে তাহলে P বিন্দুর তড়িৎ তীব্রতা,

$$E = \frac{F}{q} \qquad (10.2)$$

তড়িৎ তীব্রতা একটি ভেক্টর রাশি এবং এর দিক হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্রে স্থাপিত ধনাত্মক আধানের উপর ক্রিয়াশীল বলের দিকে।

তড়িৎ তীব্রতার একক হচ্ছে নিউটন / কুলম্ব ($N\,C^{-1}$)।

গাণিতিক উদাহরণ ১০.২ : কোনো তড়িৎ ক্ষেত্রে 5 C এর একটি আহিত বস্তু স্থাপন করলে যদি সেটি 200 N বল লাভ করে তবে ঐ বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের তীব্রতার মান নির্ণয় কর।

আমরা জানি,

$$E = \frac{F}{q}$$
$$= \frac{200\ N}{5\ C}$$
$$= 40\ N\,C^{-1}$$

এখানে,
আধান, $q = 5\ C$
বল, $F = 200\ N$
তড়িৎ তীব্রতা, $E = ?$

উঃ $40\ N\,C^{-1}$

তড়িৎ বলরেখা : তড়িৎ ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য মাইকেল ফ্যারাডে তড়িৎ বলরেখার অবতারণা করেন। কোনো তড়িৎ ক্ষেত্রে একটি ধনাত্মক আধান স্থাপন করলে এটি বল লাভ করবে। যদি আধানটি মুক্ত হয় তবে সেটি এই বল লাভের ফলে স্থির না থেকে একটি নির্দিষ্ট পথে চলবে। তড়িৎ ক্ষেত্রে একটি মুক্ত ধনাত্মক আধান স্থাপন করলে এটি যে পথে পরিভ্রমণ করে তাকে তড়িৎ বলরেখা বলে। বলরেখার বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই। এই রেখাগুলো কাল্পনিক। তড়িৎ বলরেখা তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে তড়িৎ তীব্রতার পরিমাণ ও দিক ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করা হয়।তড়িৎ ক্ষেত্রের বলরেখাগুলো এমন হয় যে, তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে বলরেখার সাথে অঙ্কিত স্পর্শক ঐ বিন্দুতে তড়িৎ তীব্রতার দিক নির্দেশ করে। বলরেখার সাথে লম্বভাবে অবস্থিত একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত বলরেখার সংখ্যা তীব্রতার সমানুপাতিক। কোনো তড়িৎ ক্ষেত্রের বলরেখার চিত্রে বলরেখার মধ্যবর্তী ফাঁক তড়িৎ তীব্রতার মান নির্দেশ করে। তড়িৎ ক্ষেত্রের যে সব এলাকায় বলরেখাগুলো কাছাকাছি অবস্থিত, অর্থাৎ ঘনসন্নিবিষ্ট সেখানে E এর মান বেশি, আর যে সব এলাকায় বলরেখাগুলো দূরে দূরে অবস্থিত সে সব স্থানে E এর মান ছোট বা কম হয়।

আহিত বস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের জন্য তড়িৎ ক্ষেত্রের বলরেখার প্রকৃতি ভিন্ন হয়। নিচে কয়েকটি তড়িৎ ক্ষেত্রের বলরেখা বর্ণনা করা হলো। আলোচনার সুবিধার্থে পরিবাহীগুলোকে গোলাকার ধরা হয়েছে।

১. একটি পৃথক ধনাত্মক আধানের জন্য বলরেখার প্রকৃতি ১০.১১ (ক) চিত্রে দেখানো হলো। এক্ষেত্রে বলরেখাগুলো পরিবাহীর পৃষ্ঠ থেকে লম্ব ভাবার সুষমভাবে বের হয়েছে। বস্তুটির আধানের পরিমাণ বাড়লে বলরেখার সংখ্যাও বাড়বে।

২. দুইটি সমান ও বিপরীত জাতীয় আধান দ্বারা সৃষ্ট তড়িৎ ক্ষেত্রের বলরেখা ১০.১১ (খ) চিত্রে দেখানো হলো। এক্ষেত্রে বলরেখাগুলো ধনাত্মক আধান থেকে বের হয়ে ঋণাত্মক আধানে প্রবেশ করে।

৩. সমান মানের দুইটি ধনাত্মক আধান পাশাপাশি স্থাপন করলে এদের সৃষ্ট তড়িৎ ক্ষেত্রের বলরেখা ১০.১১ (গ) চিত্রে দেখানো হলো। এক্ষেত্রে বলরেখাগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে, ফলে দুই আধানের মাঝখানে কোনো বলরেখা থাকে না। চিত্রে এই স্থানকে X চিহ্ন দিয়ে দেখানো হলো। এই স্থানে কোনো

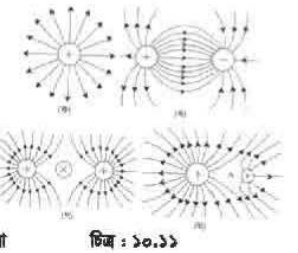

চিত্র : ১০.১১

আধান স্থাপন করলে সেটি কোনো বল লাভ করবে না। এই বিন্দুকে নিরপেক্ষ বিন্দু বলা হয়।

৪. দুইটি অসমান ধনাত্মক আধানের জন্য সৃষ্ট তড়িৎ ক্ষেত্রের বলরেখা ১০.১১ (ঘ) চিত্রে দেখানো হলো। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিন্দু N ক্ষুদ্রতর আধানের নিকটবর্তী হবে।

১০.৭ তড়িৎ বিভব
Electric potential

তড়িৎ ক্ষেত্রের যেমন তীব্রতা থাকে, তেমনি তড়িৎ ক্ষেত্রের বিভবও থাকে। বিভব দ্বারা নির্ধারিত হবে তড়িৎ ক্ষেত্রে একটি আধান কোনো দিকে গতিশীল হবে বা দুইটি পরিবাহী সংযুক্ত করলে কোন পরিবাহী থেকে কোন পরিবাহীতে আধান প্রবাহিত হবে। তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আহিত বস্তুটির আধান ধনাত্মক হলে একটি ধনাত্মক আধানকে বস্তুর দিকে আনতে বিকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। সুতরাং, অসীম থেকে একটি একক ধনাত্মক আধানকে বস্তুর যত নিকটবর্তী কোনো বিন্দুতে আনতে হবে তত বেশি কাজ করতে হবে। তাই ধনাত্মকভাবে আহিত একটি বস্তুর তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে একটি বিন্দু বস্তুটির যত নিকটে হবে তার বিভবও তত বেশি হবে।ধনাত্মকভাবে আহিত একটি বস্তুর তড়িৎ ক্ষেত্রে স্থাপিত একটি ধনাত্মক আধান যদি মুক্তভাবে চলতে পারে, তবে সেটি ধনাত্মকভাবে আহিত বস্তু থেকে দূরে সরে যাবে। সুতরাং বলা চলে ধনাত্মক আধান উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে চলে। অপরপক্ষে ঋণাত্মক আধান ধনাত্মক ভাবে আহিত বস্তুর দিকে চলে। সুতরাং, ঋণাত্মক আধান নিম্নবিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে চলে। ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আহিত বস্তুটি ঋণাত্মকভাবে আহিত হলে একটি একক ধনাত্মক আধানকে ঐ বস্তুর দিকে আনতে আকর্ষণ বল দ্বারা কাজ সম্পন্ন হবে। ঋণাত্মকভাবে আহিত বস্তুর তড়িৎ ক্ষেত্রে অসীম থেকে ধনাত্মক আধান বস্তুর দিকে আসতে নিজেই কাজ করে। ফলে আধানটি শক্তি হারায় এবং তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুর বিভবকে ঋণাত্মক ধরা হয়।

বিভবের পরিমাপ : অসীম দূরত্ব থেকে প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যে পরিমান কাজ সম্পন্ন হয় তাকে ঐ বিন্দুর তড়িৎ বিভব বলে। আবার, অসীম থেকে প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে পরিবাহীর খুব নিকটে আনতে তড়িৎ বল দ্বারা বা তড়িৎ বলের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়, তাকে ঐ পরিবাহীর বিভব বলে।

অসীম থেকে ক্ষুদ্র আধান q কে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে বা পরিবাহীর খুব নিকটে আনতে যদি সম্পন্ন কাজের পরিমাণ W হয়, তবে ঐ বিন্দুর বা ঐ পরিবাহীর বিভব V হবে $V = \frac{W}{q}$ (10.3)

দুইটি আহিত পরিবাহীকে তড়িৎগতভাবে যুক্ত করলে কোন দিক দিয়ে আধান প্রবাহিত হবে তড়িৎ বিভব দ্বারা তা নির্ধারিত হয়।

দুইটি আধানযুক্ত ধাতব গোলককে একটি পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করলে (চিত্র ১০.১২) নিচের যেকোনো একটা ঘটনা ঘটতে পারে।

১. বাম গোলক থেকে কিছু আধান ডান গোলকে যেতে পারে।
২. ডান গোলক থেকে কিছু আধান বাম গোলকে যেতে পারে।
৩. আধান যেমন ছিল তেমনই থাকতে পারে।

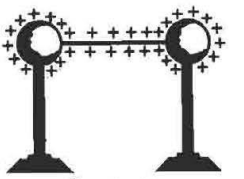

চিত্র : ১০.১২

আধান কোন গোলক থেকে কোন গোলকে যাবে তা কিন্তু গোলকদ্বয়ের আধানের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। এটি নির্ভর করে যে বিষয়টির উপর তাকে তড়িৎ বিভব বলা হয়। যে গোলকের বিভব বেশি তা থেকে কম বিভবের গোলকে ধনাত্মক আধান প্রবাহিত হবে। দুইটি গোলকের বিভব সমান না হওয়া পর্যন্ত আধানের এই প্রবাহ চলবে।

সুতরাং, বিভব হচ্ছে আহিত পরিবাহীর তড়িৎ অবস্থা যা নির্ধারণ করে ঐ পরিবাহীটি অন্যকোনো পরিবাহীর সাথে তড়িৎগতভাবে যুক্ত করলে আধান দেবে না নেবে।

তাপমাত্রা ও তরলের মুক্ততলের সাথে বিভবের সাদৃশ্য : তাপবিজ্ঞান ও ভূমিস্থিতিবিদ্যায় যথাক্রমে তাপমাত্রা ও তরলের মুক্ততল যে ভূমিকা পালন করে থাকে স্থির তড়িৎবিদ্যায় বিভবও সেই একই ভূমিকা পালন করে থাকে। আমরা জানি, দুইটি বস্তুকে তাপীয়ভাবে সংযুক্ত করলে তাদের মধ্যে তাপের আদান প্রদান হতে পারে। তাপের প্রবাহ বস্তুর ভর তথা তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না –তাপের প্রবাহ নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর। অত্যন্ত উত্তপ্ত একটি বস্তুকে তার চেয়ে অনেকগুণ ভারী কিন্তু কম তাপমাত্রা বিশিষ্ট অপর বস্তুর সাথে সংযুক্ত করলে তাপ ছোট বস্তু থেকে বড় বস্তুতে প্রবাহিত হবে, যদিও বড় বস্তুর তাপের পরিমাণ ছোট বস্তুর মধ্যস্থ তাপের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি।

একই অনুভূমিক তলে স্থাপিত দুইটি পাত্র A ও B একটি নল দ্বারা স্টপ-কর্ক S এর মাধ্যমে যুক্ত আছে (চিত্র ১০.১৩)। স্টপ-কর্ক বন্ধ করে A ও B তে পানি ঢালা হলো যাতে A ও B উভয় নলে পানির উচ্চতা সমান হয়। B নলের ব্যাস A নলের ব্যাসের চেয়ে অনেক বড় হওয়ায় একই উচ্চতা পর্যন্ত পানি পূর্ণ করতে B নলের জন্য অনেক বেশি পানির প্রয়োজন হবে। এখন যদি স্টপ-কর্ক খুলে দেওয়া হয় তবে দেখা যাবে তাদের উচ্চতার কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ পানির প্রবাহ ঘটে না। দুই নলের মধ্যে পানির পরিমাণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উচ্চতা সমান থাকার জন্য পানির প্রবাহ হচ্ছে না। এখন যদি

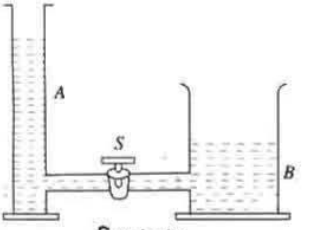

চিত্র : ১০.১৩

পুনরায় স্টপ-কর্ক বন্ধ করে A নলে সামান্য পরিমাণ পানি ঢালা হয় তবে A তে পানির পরিমাণ B এর চেয়ে কমই থাকবে কিন্তু এর উচ্চতা জল বৃদ্ধি পাবে। এরপর স্টপ-কর্ক খুলে দেখা যায় যে A থেকে পানি B তে প্রবাহিত হয় এবং পুনরায় A ও B এর পানির সতলের উচ্চতা সমান হয়। এ থেকে বুঝা যায়, পানির প্রবাহ অর্থাৎ আদানপ্রদান পানির পরিমাণের উপর নির্ভর করে না উচ্চতার উপর নির্ভর করে।

ধরা যাক, দুইটি পরিবাহী ধনাত্মকভাবে আহিত। প্রথম পরিবাহীর আধানের পরিমাণ দ্বিতীয় পরিবাহীর আধানের চেয়ে বেশি, কিন্তু প্রথমটির বিভব দ্বিতীয়টির চেয়ে কম। এখন পরিবাহী দুইটিকে একটি পরিবাহী তার দিয়ে সংযুক্ত করলে দ্বিতীয় পরিবাহী থেকে প্রথম পরিবাহীতে ধনাত্মক আধান প্রবাহিত হবে। আধানের পরিমাণ প্রথম পরিবাহীতে বেশি হওয়া সত্ত্বেও বিভব কম হওয়ায় এটি আধান গ্রহণ করে। আধানের প্রবাহের ফলে যখন পরিবাহী দুইটির বিভব সমান হবে তখন আধানের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে।

সুতরাং, বলা যায়, তাপবিজ্ঞানে তাপমাত্রার ভূমিকা, ভূমিস্থিতিবিদ্যায় তরলের মুক্ততলের ভূমিকা আর স্থির তড়িৎবিদ্যার বিভবের ভূমিকা একই।

পৃথিবী বা ভূমির বিভব শূন্য : পৃথিবী একটি তড়িৎ পরিবাহী। কোনো আহিত বস্তুকে পৃথিবীর সাথে যুক্ত করলে বস্তুটি নিস্তড়িত হয়। ধনাত্মকভাবে আহিত বস্তুকে ভূসংযুক্ত করলে পৃথিবী থেকে ইলেকট্রন এসে বস্তুকে নিস্তড়িত করে। আর ঋণাত্মকভাবে আহিত বস্তুকে পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত করলে বস্তু থেকে ইলেকট্রন ভূমিতে প্রবাহিত হয়, ফলে বস্তুটি নিস্তড়িত হয়। পৃথিবী এত বিরাট যে, এতে আধান যোগ-বিয়োগ করলে এর বিভবের পরিবর্তন হয় না। যেমন, সমুদ্র থেকে পানি তুলে নিলে বা সমুদ্রে পানি ঢালা হলে এর পানি তলের কোনো পার্থক্য হয় না। পৃথিবী বিভিন্ন বস্তু থেকে প্রতিনিয়ত আধান গ্রহণ করে আবার সাথে সাথে অন্য বস্তুকে আধান সরবরাহও করে, ফলে পৃথিবীকে আধানহীন মনে করা হয়। কোনো স্থানের উচ্চতা নির্ণয়ের সময় সমুদ্রের উপরিতলের উচ্চতাকে যেমন শূন্য ধরা হয় তেমনি বিভব নির্ণয়ের সময় পৃথিবীর বিভবকেও শূন্য ধরা হয়।

শূন্য, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিভব : কোনো আধানহীন পরিবাহীর বিভবকে শূন্য ধরা হয়। কোনো আহিত পরিবাহীকে পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত করলে তার বিভবও শূন্য হয়। কেননা, সংযুক্ত অবস্থায় পৃথিবী ও পরিবাহী একত্রে একটি পরিবাহীতে পরিণত হয়। ধনাত্মক আধানে আহিত পরিবাহীর বিভব ধনাত্মক আর ঋণাত্মক আধানে আহিত পরিবাহীর বিভব ঋণাত্মক ।

বিভবের একক ভোল্ট : অসীম থেকে প্রতি কুলম্ব (1C) ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যদি এক জুল (1J) কাজ সম্পন্ন হয়, তবে ঐ বিন্দুর বিভবকে এক ভোল্ট (1V) বলে।

তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুর বিভব 20 V বলতে বুঝায় অসীম থেকে প্রতি কুলম্ব ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের ঐ বিন্দুতে আনতে 20 J কাজ সম্পন্ন হয়।

বিভব পার্থক্য : ধরা যাক, তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত A ও B দুইটি বিন্দু যাদের বিভব যথাক্রমে V_A ও V_B (চিত্র ১০.১৪)। অসীম থেকে প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে A বিন্দুতে আনতে কাজের পরিমাণ V_A এবং B বিন্দুতে আনতে কাজের পরিমাণ V_B। অতএব প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে B বিন্দু থেকে A বিন্দুতে আনতে কাজের পরিমাণ $V_A - V_B$ অর্থাৎ এই দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য।

চিত্র : ১০.১৪

প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তর করতে সম্পন্ন কাজের পরিমাণকে এই দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য বলে। বিভব পাথক্যের একক অবশ্যই ভোল্ট।

১০.৮ তড়িৎ ধারক
Electric capacitor

তড়িৎ আধানরূপে শক্তি সঞ্চয় করার সামর্থ্যকে ধারকত্ব বলা হয়। ধারকত্ব বজায় রাখার জন্য উদ্ভাবিত যান্ত্রিক কৌশলই ধারক। কোনো উৎস থেকে যেমন, তড়িৎ কোষ থেকে ধারক শক্তি সঞ্চয় করে তা পুনরায় ব্যবহার করা হয়। যেকোনো আকৃতির দুইটি পরিবাহীর মধ্যবর্তী স্থানে কোনো অন্তরক পদার্থ যেমন– বায়ু, কাচ, প্লাস্টিক ইত্যাদি স্থাপন করে ধারক তৈরি করা হয়। সুতরাং, কাছাকাছি স্থাপিত দুইটি পরিবাহীর মধ্যবর্তী স্থানে অন্তরক পদার্থ রেখে তড়িৎ আধানরূপে শক্তি সঞ্চয় করে রাখার যান্ত্রিক কৌশলকেই ধারক বলে।

চিত্র : ১০.১৫

একটি সরল ধারক তৈরি করা হয় দুইটি অন্তরিত ধাতবপাতকে পরস্পর সমান্তরালভাবে রেখে। যখন একটি ব্যাটারিকে এর দুইটি পাতের সাথে সংযুক্ত করা হয় (চিত্র ১০.১৫), তখন ব্যাটারির ঋণাত্মক দণ্ড থেকে ইলেকট্রন একটি পাতে প্রবাহিত হয় এবং এটি ঋণাত্মক আধানে আহিত হয়। ধারকের অন্য পাত থেকে ইলেকট্রন ব্যাটারির ধনাত্মক দণ্ডে প্রবাহিত হয়, ফলে ঐ পাত ধনাত্মকভাবে আহিত হয়। পাতগুলোতে কত আধান জমা হবে তা ব্যাটারির ভোল্টেজের উপর নির্ভর করে।

ধারক রেডিও, টেলিভিশন, রেকর্ড প্লেয়ার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত বর্তনীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

১০.৯ স্থির তড়িতের ব্যবহার ও বিপদ
Uses and dangers of static electricity

চিত্র : ১০.১৬

১। **স্থির বৈদ্যুতিক রং স্প্রে :** গাড়ি, সাইকেল আলমারি বা অন্যান্য জিনিস রং করার জন্য ইদানিং রং এর স্প্রে ব্যবহার করা হয়। এটি করা হয় স্থির তড়িৎ ব্যবহার করে। স্প্রে গান এমনভাবে তৈরি করা হয় যে এটি রং এর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আহিত কণা তৈরি করে। রং স্প্রে পানের সূচালো প্রান্তটি একটি স্থির তড়িৎ জেনারেটর এর এক প্রান্তের সাথে সংযুক্ত করা হয়। জেনারেটরের অপর প্রান্তটি যে ধাতব পাতটি রং করতে হবে তার সাথে সংযুক্ত করা হয় যা অবশ্যই ভূসংযুক্ত থাকে। একটি গাড়ি রং করার ক্ষেত্রে স্প্রে গান থেকে নির্গত আহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা গাড়ির বাইরের কাঠামো দ্বারা আকৃষ্ট হয়। ফলে গাড়ির বহিরাবরণের উপর রং এর একটি সুষম আস্তরণ পড়ে। এছাড়াও এই ক্ষুদ্র কণাগুলো তড়িৎ ক্ষেত্রের বল রেখা বরাবর চলে কাঠামোর অপ্রকাশ্য স্থানে পৌঁছে সেখানেও রং করে।

২। **ইঙ্কজেট প্রিন্টার :** এটি হচ্ছে সবচেয়ে সাধারণ ধরনের প্রিন্টার যা কম্পিউটারের সাথে সংযোগ দেওয়া থাকে। একটি ইঙ্কগান তার সূচালো মুখ দিয়ে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালির কণা নিক্ষেপ করে। এই ক্ষুদ্র কণাগুলো ধনাত্মক (+) ভাবে আহিত। এই কালির কণাগুলো দুইটি পাতের মধ্যস্থল দিয়ে চলে (চিত্র ১০.১৭)। এই ধনাত্মক কালির কণাগুলোকে ধনাত্মক পাত বিকর্ষণ করে এবং এগুলো ঋণাত্মক পাতে আকৃষ্ট হয়।

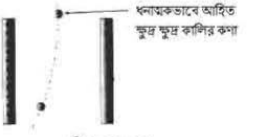

চিত্র : ১০.১৭

একটি কম্পিউটার পাতগুলোর ভোল্টেজ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে পাতগুলো কখনো ধনাত্মক, কখনো ঋণাত্মক আধানে আহিত হয় এবং কালির কণাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে চলমান কাগজের উপর বিভিন্ন স্থানে পড়ে এবং প্রয়োজনমত অক্ষর বা ছবির আকৃতি ছাপে। রঙিন ছাপার জন্য চার রকমের রঙিন কালি ব্যবহার করা হয়।

৩। **ফটোকপিয়ার :** আজকাল ফটোকপিয়ার বা ফটোকপি মেশিন খুবই প্রয়োজনীয় এবং জনপ্রিয় একটি যন্ত্র। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিবিধ অফিস ছাড়াও সাধারণ জনগণ যেকোনো প্রয়োজনীয় দলিল বা কাগজপত্রের এক বা একাধিক অবিকল কপির জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। এই যন্ত্রেও স্থির তড়িৎ ব্যবহার করা হয়। ফটোকপিয়ারের ভিতরে অন্ধকারে একটি ঘূর্ণায়মান ড্রাম থাকে। এই ড্রামের উপর ধনাত্মক আধান স্প্রে করা হয়। যে পৃষ্ঠা ফটোকপি করতে হবে একটি উজ্জ্বল আলো তাকে আলোকিত করে। পৃষ্ঠার সাদা অংশ আলো প্রতিফলিত করে, কিন্তু অন্ধকার বা ছাপানো অংশ কোনো আলো প্রতিফলিত করে না। প্রতিফলিত আলো ড্রামের উপর কেন্দ্রিভূত হয়। ড্রামের যে স্থানটি সাদা কাগজ দ্বারা প্রতিফলিত আলো পড়ে উজ্জ্বল হয়, সেই অংশ থেকে আধান ক্ষয় হয়ে যায়। ড্রামের কেবল অন্ধকার অংশই ধনাত্মক আধানে আহিত থাকে। ঋণাত্মকভাবে আহিত কার্বনের পাউডার কালি (টোনার) ড্রামের উপর স্প্রে করা হয়। ঋণাত্মকভাবে আহিত এই কালির কণাগুলো ড্রামের ধনাত্মকভাবে আহিত অংশের সাথে আঠালোভাবে লেগে থাকে। এক টুকরা সাদা কাগজকে ধনাত্মকভাবে আহিত করা হয়। এটিকে ড্রামের সাথে চেপে রাখা হয়। এই কাগজটি ড্রাম থেকে কার্বন পাউডারের প্যাটার্ন তার গায়ে তুলে আনে। টোনার (–) টি কাগজ (+) কর্তৃক আকৃষ্ট হবে। কাগজখানা উত্তপ্ত রোলারের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। এতে টোনারের কালি গলে যায় এবং কাগজের সাথে মিশে যায়, ফলে একটি স্থায়ী কপি তৈরি হয়।

স্থির তড়িতের বিপদ

অনেক ক্ষেত্রে স্থির তড়িতের উপস্থিতি অসুবিধাজনক এবং বিপদ ডেকে আনতে পারে।

বিমানে জ্বালানি ভরা : আকাশে যখন বিমান উড়ে তখন বায়ুর সাথে ঘর্ষণের ফলে এটি তড়িতাহিত হতে পারে। বিমানের আধান বাড়তে থাকলে বিমান ও ভূপৃষ্ঠের মধ্যে বিভব পার্থক্য বাড়তে থাকে। এত উচ্চ বিভব পার্থক্যের কারণে বিমানে যখন জ্বালানি ভরা হয় তখন কিছু আধান ভূমিতে চলে যাওয়ার সময় স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা বিরাট বিস্ফোরণের কারণ হতে পারে। এই জন্য বিমানের চাকা পরিবাহী রাবার দ্বারা তৈরি করা থাকে, যাতে বিমান ভূমি স্পর্শ করলে বিমানে জমা হওয়া আধান নিরাপদে ভূমিতে চলে যেতে পারে। এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে বিমান ভূমিতে অবতরণের পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এবং জ্বালানি ভরা শুরু করার আগেই একটি পরিবাহী দ্বারা ভূসংযুক্ত করা।

ট্যাংকারে জ্বালানি ভরা : যে সকল ট্যাংকার লরি পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি জ্বালানি নিয়ে রাস্তা দিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে তাদের বেলায়ও স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি ও বিস্ফোরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জ্বালানি স্থানান্তরের আগে ভূসংযুক্ত করে নিতে হয়।

টেলিভিশন ও কম্পিউটারের মনিটর : ব্যবহারকালে টেলিভিশনের পর্দা ও কম্পিউটারের মনিটর স্থির তড়িতে আহিত হয়। এই আধানগুলো অনাহিত কণা যেমন ধুলোবালি ইত্যাদি আকর্ষণ করে, ফলে এগুলো তাড়াতাড়ি ময়লা হয়ে যায়।

কাপড় পাল্টানো : আমাদের পরিধেয় কাপড় চোপড় অনেক সময় নিজেদের মধ্যকার ঘর্ষণের ফলে আহিত হয়ে যেতে পারে। যখন আমরা কাপড় বদলাই তখন আধান ভূমিতে চলে যাওয়ার সময় আমাদের অল্প শক্ খাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে।

অপারেশন থিয়েটার : যেহেতু ধুলোবালি ও জীবাণু আহিত বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কাজেই হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে সাবধনতা অবলম্বন করা হয় যেন সার্জন, সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ এবং চিকিৎসাসামগ্রী আধানমুক্ত থাকে। এ জন্য তাদেরকে ভূসংযুক্ত রাখার জন্য পরিবাহী রাবারের জুতা পরতে হয় এবং হাতে রাবারের গ্লাভস ব্যবহার করতে হয়, যাতে ভূমি থেকে সহজে ইলেকট্রন আসা যাওয়া করতে পারে।

পেট্রোলবাহী ট্রাকের সাথে ধাতব শিকল ঝুলানো থাকে : পেট্রোল, ডিজেল বা অন্য তরল জ্বালানিবাহী ট্যাংকার বা ট্রাকের সাথে একটি ধাতব শিকল লাগানো থাকে যা ট্রাক চলার সময় রাস্তা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। যখন রাস্তা দিয়ে ট্রাক চলে তখন পেট্রোল ট্যাংকের গায়ে বারবার ধাক্কা খায় এবং এদিক ওদিক দুলতে থাকে। ট্যাংকের সাথে পেট্রোলের এই ঘর্ষণের ফলে আধান সঞ্চিত হয়। যদি ট্যাংকের কিনারা থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয় তাহলে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং পেট্রোলে আগুন ধরে যাবে। কাজেই পেট্রোল আধানের জন্য নিরাপদ স্থান নয়। ট্যাংকের পেছনে শিকল লাগিয়ে এই তড়িৎ ভূমিতে চলে যাবার পথ তৈরি করা হয়। যেহেতু ধাতু খুব ভালো পরিবাহী, তাই তড়িৎ ধীরে ধীরে ধাতব শিকলের মধ্য দিয়ে মাটিতে চলে যায়।

বিদ্যুৎ লাইনের সাথে ধাতব খুটির সরাসরি সংযোগ থাকে না : রাস্তায় বিদ্যুৎ লাইনের তার খাটাবার সময় ধাতব খুটির সাথে সরাসরি সংযুক্ত করা হয় না। ধাতু তড়িতের সুপরিবাহী। ধাতব খুটির সাথে সরাসরি সংযোগ করা হলে তারের তড়িৎ খুটির মধ্য দিয়ে মাটিতে চলে যেত। কেউ ঐ খুটি স্পর্শ করলে সাথে সাথে তড়িৎস্পৃষ্ট হতো এবং মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতো। তাই অপরিবাহী পোর্সেলিনের কাপের মধ্য দিয়ে তারকে খুটির সাথে সংযোগ দেওয়া হয়।

বজ্রপাত ও বজ্র নিরোধক : আমরা জানি বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প থাকে। এই জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলের আহিত আয়নগুলোর উপর ঘনীভূত হয়ে পানি কণার সৃষ্টি করে এবং তড়িতাহিত হয়। এই ধরনের পানির কণাগুলো একত্রিত হলেই মেঘের উৎপত্তি হয়। মেঘ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যেকোনো ভাবেই আহিত হতে পারে। তড়িতাহিত দুইটি মেঘ কাছাকাছি এলে তাদের মধ্যে তড়িৎক্ষরণ হয়, তখন বিরাট অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়। একে বিদ্যুচ্চমক বলা হয়। বিদ্যুচ্চমকের সময় মেঘের চারপাশের বায়ুমণ্ডল হঠাৎ তাপ পেয়ে প্রসারিত হয়। হঠাৎ প্রসারণের ফলে বায়ুমণ্ডলের চাপ

কমে যায়। তখন আশেপাশের বেশি চাপের বায়ু এসে এই প্রসারিত বায়ুকে সংকুচিত করে। খুব তাড়াতাড়ি এ ধরনের সংকোচন ও প্রসারণ হয় বলে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি হয়। একেই মেঘ গর্জন বলে। তড়িতাহিত মেঘে যদি তড়িতের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে তা তড়িৎক্ষরণের মাধ্যমে পৃথিবীতে চলে আসে। একে বলে বজ্রপাত। বজ্রপাতের সাথে সাথে যে শব্দ শোনা যায় তাকে বলে বজ্রনাদ।

বজ্র নিরোধক : বজ্রপাতের ফলে যাতে বাড়িঘরের ক্ষতি না হয় তার জন্য বজ্র নিরোধক ব্যবহার করা হয়। একটি ধাতব দণ্ড R কে (চিত্র ১০.১৮) বাড়ির গা ঘেঁষে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যেন এর উপরিভাগ ছাদের চেয়েও বেশি উঁচুতে থাকে এবং এর নিম্নভাগ ভালোভাবে মাটিতে পুতে রাখা হয়। দণ্ডের উপরিভাগে কয়েকটি সূচিমুখ থাকে।

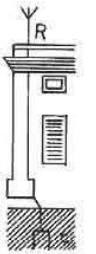

চিত্র : ১০.১৮

যখন তড়িৎক্ষয় মেঘ বাড়ির উপরে আসে, তখন এটি R দণ্ডে বিপরীত আধান আবিষ্ট করে। কিন্তু দণ্ডের উপরি প্রান্ত তীক্ষ্ণাগ্র বিশিষ্ট হওয়ায় ঐ তীক্ষ্ণাগ্রগুলোতে বেশি আধান জমা হয় এবং সূচিমুখ দিয়ে তড়িৎক্ষরণ হয়। ঝাঁকগুলো এই আধান নিয়ে আহিত হয় এবং মেঘের বিপরীত আধান কর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে মেঘের দিকে চলে যায় এবং মেঘকে নিস্তড়িত করে। ফলে বজ্রপাতের সম্ভাবনা কম থাকে।

তড়িৎ সবসময় পরিবাহীর মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ততম পথে চলে। মেঘে মেঘে সৃষ্ট তড়িৎ উঁচু কস্তুর ভিতর দিয়ে পৃথিবীতে আসতে চায়। ঝড় বৃষ্টির সময় তাই ছাতার নিচে, কোনো গাছের নিচে, তড়িৎ পরিবাহী যন্ত্রের কাছে, লোহার তৈরি পুল কিংবা কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ালের কাছাকাছি দাঁড়ানোর চেয়ে বৃষ্টিতে ভেজা অনেক ভালো।

অনুসন্ধান–১০.১

ঘর্ষণ ও আবেশ প্রক্রিয়ায় আধান সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য : ঘর্ষন ও আবেশ প্রক্রিয়ায় আধান সৃষ্টি করে তা প্রদর্শন।

যন্ত্রপাতি : শোলার বল, কাচ দণ্ড, সিল্কের কাপড়, রাবারের টুকরা এবং একটি পরিবাহী দণ্ড।

কাজের ধারা

১. একটি হালকা শোলার বলকে একটি সুতার সাহায্যে কোনো স্ট্যান্ড বা হুক থেকে ঝুলিয়ে দাও।
২. একটি শুকনো কাচদণ্ড নাও।
৩. এক টুকরা রাবারের সাহায্যে কাচের এক প্রান্ত আবৃত করে সেই প্রান্ত হাত দিয়ে ধরো।
৪. একটি শুকনো সিল্কের কাপড়ের টুকরা দিয়ে কাচদণ্ডের অপর প্রান্ত ভালোভাবে ঘষো।
৫. এখন কাচদণ্ডের যষা প্রান্তটি মুক্তভাবে ঝুলানো শোলার বলের কাছে আনো।
৬. কাচ দণ্ড শোলার বলকে তার দিকে আকর্ষণ করছে অর্থাৎ ঘর্ষণের ফলে কাচদণ্ডটি আহিত হয়েছে।
৭. কাচ দণ্ডটি ধনাত্মকভাবে আহিত হয়েছে। (তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে তাই পাওয়া যাবে।)
৮. এখন আহিত কাচ দণ্ডটি একটি অনাহিত পরিবাহীর এক প্রান্তের নিকট আনো।
৯. আবেশের ফলে অনাহিত পরিবাহীটি আহিত হবে।কাচ দণ্ডের নিকট প্রান্তে ঋণাত্মক এবং দূরবর্তী প্রান্তে ধনাত্মক আধান আবিষ্ট হবে।
১০. কাচ দণ্ডটি না সরিয়ে আবিষ্ট দণ্ডটির দূরবর্তী প্রান্ত ভূসংযুক্ত করলে (একটি তার দিয়ে বা মাটিতে খালি পায়ে দাড়িয়ে দণ্ডটিকে স্পর্শ করে) ভূমি থেকে ইলেক্ট্রন এসে ধনাত্মক আধানকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে। ফলে দণ্ডটিতে কেবল ঋণাত্মক আধান থাকবে।
১১. এখন সেই দণ্ডটিকে শোলার বলের কাছে নিলে শোলার বলকে আকর্ষণ করবে।
১২. পরিবাহীটি আবেশ প্রক্রিয়ায় আহিত হয়েছে।

অনুশীলনী

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

১। কোনো বস্তুতে আধানের অস্তিত্ব নির্ণয়ের যন্ত্র হলো–

(ক) অ্যামিটার (খ) ভোল্টমিটার

(গ) অণুবীক্ষণ যন্ত্র (ঘ) তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র

২। দুইটি আধানের মধ্যকার তড়িৎ বল নিচের কোনটির উপর নির্ভর করে না ?

i. আধান দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর।

ii আধান দুইটি যে মাধ্যমে অবস্থিত তার প্রকৃতির উপর ।

iii আধান দুইটির ভরের উপর।

কোনটি সঠিক

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

৩। তড়িৎ তীব্রতার একক হচ্ছে

(ক) N (খ) N m (গ) $N\,m^{-1}$ (ঘ) $N\,C^{-1}$

৪। ভোল্ট কিসের একক ?

(ক) তড়িৎ ক্ষেত্র (খ) তড়িৎ বিভব (গ) তড়িৎ আধান (ঘ) তড়িৎ প্রবাহ

৫। নিচের চিত্রে

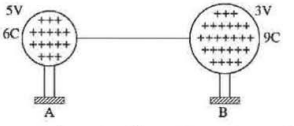

(i) A গোলক থেকে কিছু আধান B গোলকে যাবে

(ii) B গোলক থেকে কিছু আধান A গোলকে যাবে

(iii) আধান পার্থক্য সর্বদা সমান থাকে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i,ii ও iii

খ. সৃজনশীল

১। রিমা চুল আচড়ানোর পর দেখতে পেল তার চিরুনী ছোট ছোট কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করছে। সীমা বলল চিরুনীটি ধনাত্মকভাবে আহিত হয়েছে, যার জন্য এটা ঘটেছে। রিমার বক্তব্য চিরুনীটি ঋণাত্মক আধানে আহিত হয়েছে। বিষয়টির সুরাহার জন্য দুইজন তাদের পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষককে খুঁজতে গিয়ে তাকে পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারে পেল। তিনি সব শুনে তাদেরকে তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে চিরুনীর আধানের প্রকৃতি নির্ণয় করতে বললেন।

(ক) আধান বলতে কী বুঝ ?

(খ) ঘর্ষণে কেন বস্তু আহিত হয় বুঝিয়ে দাও।

(গ) চিরুনীটি আহিত হওয়ার কারণ বর্ণনা কর।

(ঘ) যন্ত্রটির সাহায্যে কিভাবে চিরুনীটির আধানের প্রকৃতি নির্ণয় করা যাবে ব্যাখ্যা কর।

২।

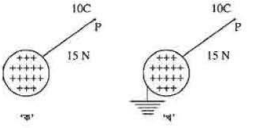

(ক) তড়িৎ ক্ষেত্র কি ?

(খ) P বিন্দুতে স্থাপিত বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন করলে এটির উপর অনুভূত বলের কিরূপ পরিবর্তন ঘটবে ?

(গ) 'ক' চিত্রে P বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্য নির্ণয় কর।

(ঘ) চিত্র 'ক' অপেক্ষা চিত্র 'খ' এ অনুভূত বলের পরিবর্তন বিশ্লেষণ কর।

গ. সাধারণ প্রশ্ন

১। পরমাণুর গঠনের ভিত্তিতে কোনো বস্তুর আহিত হওয়ার ঘটনা ব্যাখ্যা কর।

২। কোনো বস্তুকে ঘর্ষণ পদ্ধতিতে কীভাবে আহিত করা যায় বর্ণনা কর।

৩। তড়িৎ আবেশ কী?

৪। আবেশি আধান ও আবিষ্ট আধান বলতে কী বোঝ?

৫। কোনো বস্তুকে আবেশ পদ্ধতিতে কীভাবে আহিত করা যায় বর্ণনা কর।

৬। একটি স্বর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন বর্ণনা কর।

৭। একটি স্বর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রকে কীভাবে ধনাত্মক আধানে আহিত করা যায় বর্ণনা কর।

৮। একটি স্বর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কীভাবে কোনো আহিত বস্তুর আধানের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় বর্ণনা কর।

৯। দুইটি আধানের মধ্যবর্তী তড়িৎ বল কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

একাদশ অধ্যায়

চল তড়িৎ

CURRENT ELECTRICITY

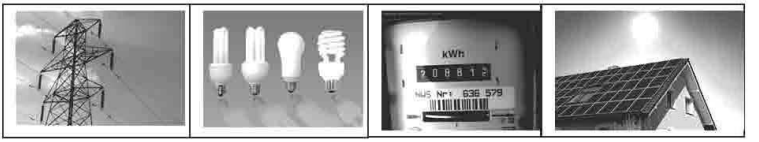

[আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা তড়িৎ বা বিদ্যুতের উপর নির্ভর করে থাকি। আধুনিক যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামের প্রায় সবই তড়িতের সাহায্যে চলে। আমরা তড়িতের উপর এতটাই নির্ভরশীল যে, তড়িৎ ছাড়া আমাদের জীবন কেমন হবে তা কল্পনাও করতে পারি না। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা স্থির তড়িৎ নিয়ে আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা চল তড়িতের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক রাশি যেমন–তড়িৎ প্রবাহমাত্রা, রোধ, তড়িচ্চালক শক্তি এবং বিভব পার্থক্য সম্পর্কে জানতে পারব। এছাড়াও তড়িৎ প্রবাহের দিক, পরিবাহী, অপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহী, তড়িৎ বর্তনী, ও'মের সূত্র, স্থির এবং পরিবর্তনশীল রোধ, রোধের নির্ভরশীলতা, রোধের শ্রেণি ও সমান্তরাল সমবায়, তড়িৎ ক্ষমতার হিসাব, তড়িতের সিস্টেম লস এবং লোডশেডিং, তড়িতের নিরাপদ ও কার্যকর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব।]

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১. স্থির তড়িৎ হতে চল তড়িৎ সৃষ্টি প্রদর্শন করতে পারব।
২. তড়িৎ প্রবাহের দিক এবং ইলেকট্রন প্রবাহের দিক ব্যাখ্যা করতে পারব।
৩. তড়িৎ যন্ত্র ও উপকরণের প্রতীক ব্যবহার করে বর্তনী অঙ্কন করতে পারব।
৪. পরিবাহী,অপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহী ব্যাখ্যা করতে পারব।
৫. লেখচিত্রের সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহ এবং বিভব পার্থক্য এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব।
৬. স্থির রোধ এবং পরিবর্তনশীল রোধ ব্যাখ্যা করতে পারব।
৭. তড়িচ্চালক শক্তি এবং বিভব পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
৮. রোধের নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
৯. আপেক্ষিক রোধ ও পরিবাহকত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
১০. শ্রেণি ও সমান্তরাল বর্তনী ব্যবহার করতে পারব।
১১. বর্তনীতে তুল্য রোধ ব্যবহার করতে পারব।
১২. তড়িৎ ক্ষমতার হিসাব করতে পারব।
১৩. তড়িতের সিস্টেম লস এবং লোডশেডিং ব্যাখ্যা করতে পারব।
১৪. তড়িতের নিরাপদ ও কার্যকর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
১৫. বাসা বাড়িতে ব্যবহার উপযোগী বর্তনীর নকশা প্রণয়ন করে এর বিভিন্ন অংশে এসি উৎস–এর ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারব।
১৬. তড়িতের নিরাপদ ও কার্যকর ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।
১৭. তড়িৎ শক্তির অপচয় রোধ ও সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।

১১.১ স্থির তড়িৎ হতে চল তড়িৎ সৃষ্টি
Production of current electricity from static electricity

তড়িৎ প্রবাহ

দুইটি ভিন্ন বিভবের বস্তুকে যখন পরিবাহী তার দ্বারা সংযুক্ত করা হয়, তখন নিম্ন বিভবের বস্তু থেকে উচ্চ বিভবের বস্তুতে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে বিভব পার্থক্য শূন্য না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রবাহ বজায় থাকে। কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি বস্তুদ্বয়ের মধ্যে বিভব পার্থক্য বজায় রাখা যায় তখন এই ইলেকট্রন প্রবাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। ইলেকট্রনের এই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহই হলো তড়িৎ প্রবাহ।

কোনো পরিবাহীর যেকোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাকে তড়িৎ প্রবাহ বলে।

কোনো পরিবাহীর যেকোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে t সময়ে যদি Q পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয়, তাহলে তড়িৎ প্রবাহ I হবে, $I = \frac{Q}{t}$

একক : তড়িৎ প্রবাহের একক হলো অ্যাম্পিয়ার।

কোনো বিচ্ছিন্ন আহিত পরিবাহীতে আধান এর পৃষ্ঠে অবস্থান করে এবং চলাচল করতে পারে না। এ ধরনের আধানকে বলা হয় স্থির তড়িৎ আধান। যদি এই আধানের চলাচলের জন্য পরিবহন পথের ব্যবস্থা করা হয় তখন এই আধান পরিবাহীতে আবদ্ধ না থেকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। যখন এমনটি ঘটে, তখন আমরা বলি যে, তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে।

একে A দ্বারা সূচিত করা হয়। কোনো পরিবাহীর যেকোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে 1s -এ 1 C আধান প্রবাহিত হলে 1 A তড়িৎ প্রবাহ চলে। অ্যাম্পিয়ারের সংজ্ঞা প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া আছে।

$$\therefore \quad I = \frac{1\,\text{C}}{1\,\text{s}} = 1\,\text{Cs}^{-1} = 1\,\text{A}$$

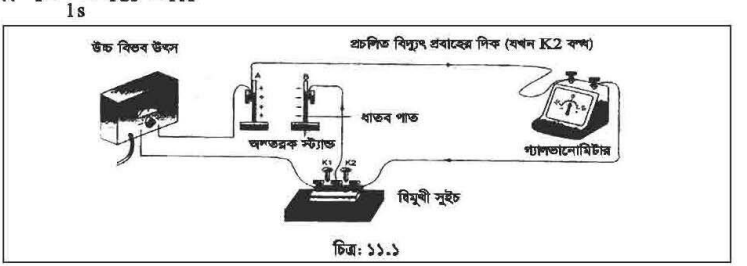

চিত্র: ১১.১

গতিশীল আধান কর্তৃক কীভাবে চল তড়িৎ উৎপন্ন হয় তা উপরের ১১.১ চিত্রের বর্তনীর আলোকে বর্ণনা করা হলো। শুরুতেই দুইটি প্লাগ চাবি K_1 এবং K_2 উঠিয়ে ফেলা হয় এবং ধাতব পাত A এবং B কে ভূসংযুক্ত করে (খালি পায়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করে) স্পর্শ করে অনাহিত করা হয়। এবার চাবি K_1 বন্ধ করে দিলে উচ্চ বিভব উৎসটি ধাতব পাত দুইটির সাথে সংযুক্ত হবে।

এরপর উচ্চ বিভব উৎসের সুইচটি অন্ করে ধাতব পাত দুইটিকে সমপরিমাণ ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আধানে আহিত করা হয়। এই চার্জ বা আধান পাত দুইটিতে স্থির তড়িতের সৃষ্টি করে। এবার চাবি K_1 খুলে ফেলে এবং K_2 চাবি প্লাগে প্রবেশ করালে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আধানে আহিত পাত দুইটি গ্যালভানোমিটারের সাথে সংযুক্ত হবে ফলে একটি অবিচ্ছিন্ন পরিবহন পথের সৃষ্টি হবে এবং এ পথে তড়িৎ প্রবাহ চলবে। এ বর্তনীতে গ্যালভানোমিটার হলো এমন একটি যন্ত্র যা তড়িৎ

প্রবাহের অস্তিত্ব নির্ণয় করতে পারে। দেখা যাবে গ্যালভানোমিটারের কাঁটাটি ক্ষণিকের জন্য একদিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং পরক্ষণেই তা পূর্বের অবস্থানে ফিরে এসেছে।

গ্যালভানোমিটারের বিক্ষেপ নির্দেশ করে যে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে। এই তড়িৎ প্রবাহ কীভাবে সৃষ্টি হলো? ঋণাত্মক আধানে আহিত পাত B থেকে ইলেকট্রন গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ধনাত্মক আধানে আহিত পাত A এ পৌঁছায় এবং এর ফলে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

A পাতের ধনাত্মক আধান, B পাত থেকে আগত ইলেকট্রনের ঋণাত্মক আধানদ্বারা নিষ্ক্রিয় হয়। যার ফলে ধাতব পাত দুইটির আধান ক্ষরণের মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী প্রবাহের সৃষ্টি হয়, যা গ্যালভানোমিটারের বিক্ষেপ দ্বারা সনাক্ত করা যায়।

১১.২ তড়িৎ প্রবাহের দিক এবং ইলেকট্রন প্রবাহের দিক
Direction of electricity and direction of electron flow

প্রথম যখন চল তড়িৎ আবিষ্কৃত হয়, তখন মনে করা হতো যে ধনাত্মক আধানের প্রবাহের ফলে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং এই ধনাত্মক আধান উচ্চতর বিভব থেকে নিম্নতর বিভবের দিকে প্রবাহিত হয়। তাই তড়িৎ প্রবাহের প্রচলিত দিক ধরা হয় উচ্চতর বিভব থেকে নিম্নতর বিভবের দিকে অথবা তড়িৎ কোষের ধনাত্মক পাত থেকে ঋণাত্মক পাতের দিকে। কিন্তু আমরা জানি যে, প্রকৃতপক্ষে তড়িৎ প্রবাহ হলো ঋণাত্মক আধান তথা ইলেকট্রনের প্রবাহের জন্য ফলে তড়িৎ প্রবাহের প্রকৃত দিক হলো নিম্নতর বিভব থেকে উচ্চতর বিভবের দিকে অর্থাৎ তড়িৎ কোষের ঋণাত্মক পাত থেকে ধনাত্মক পাতের দিকে। সুতরাং তড়িৎ প্রবাহের প্রকৃত দিক প্রচলিত দিকের বিপরীত। চিত্রে প্রদর্শিত তীর চিহ্ন তড়িৎ প্রবাহের প্রচলিত দিক নির্দেশ করছে।

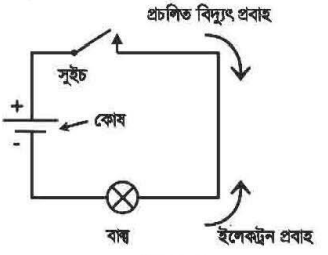

চিত্র ১১.২

বর্তনী চিত্র অঙ্কন করার সময় আমরা তড়িৎ প্রবাহের প্রচলিত দিককেই অনুসরণ করব।

১১.৩ তড়িৎ প্রতীক
Electric symbols

তড়িৎ প্রবাহ চলার সম্পূর্ণ পথকে তড়িৎ বর্তনী বলে। যখন কোনো কোষের পাত দুইটিকে কোনো রোধকের দুই প্রান্ত বা তড়িৎ উপকরণের দুই প্রান্তের সাথে সংযুক্ত করা হয়, তখন একটি তড়িৎ বর্তনী তৈরি হয়।

চল তড়িৎ পাঠের সময় আমাদেরকে সহজ এবং পরিষ্কার বর্তনী চিত্র আঁকতে হয়। নিচের সারণিতে কিছু বৈদ্যুতিক উপকরণের প্রতীক দেখানো হলো যেগুলো সাধারণত তড়িৎ বর্তনী আঁকতে ব্যবহৃত হয়।

১১.১: বর্তনীর প্রতীকসমূহ

উপকরণ	প্রতীক	উপকরণ	প্রতীক
সুইচ		অ্যামিটার	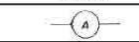
দ্বিমুখী সুইচ		ভোল্টমিটার	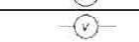
ডিসি উৎস –কোষ		গ্যালভানোমিটার	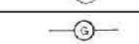
ডিসি উৎস–ব্যাটারি		ভূসংযোগ	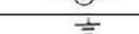
এ সি উৎস		আড়াআড়ি তার	
স্থির রোধ		সংযোগবিহীন তার	
পরিবর্তনশীল রোধ		প্যাচানো তার বা কুন্ডলী	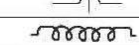
ফিউজ		বাল্ব	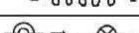
		ধারক	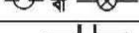

নিজে করঃ
একটি সুইচ, তড়িৎ কোষ, স্থির মানের রোধ এবং অ্যামিটার পরপর ব্যবহার করে একটি বর্তনী অঙ্কন কর। এবার একটি ভোল্টমিটারকে স্থির মানের রোধের দুই প্রান্তে সমান্তরালে যুক্ত কর।

১১.৪ পরিবাহী, অপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহী
Conductor, insulator and semiconductor

আমরা জানি, তড়িৎ প্রবাহ হলো কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে আধানের প্রবাহ। এই তড়িৎ প্রবাহ কোনো কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই চলাচল করতে পারে। আবার এমন কিছু পদার্থ আছে যেগুলোর মধ্য দিয়ে তড়িৎ আদৌ চলাচল করতে পারে না। তড়িৎ পরিবাহিতা ধর্মের উপর ভিত্তি করে কঠিন পদার্থকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা– (১) পরিবাহী (২) অপরিবাহী (৩) অর্ধপরিবাহী।

১. পরিবাহীঃ যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই তড়িৎ প্রবাহ চলতে পারে তাদেরকে পরিবাহী বলে। এসকল পদার্থের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে। ধাতব তারের মধ্য দিয়ে আধান ইলেকট্রন দ্বারা পরিবাহিত হয়। এ কারণে ধাতব পদার্থগুলো তড়িৎ সুপরিবাহী। তামা, রুপা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি সুপরিবাহী পদার্থ। যে কারণে বৈদ্যুতিক সংযোজকে ধাতব তার ব্যবহার করা হয়।

২. অপরিবাহীঃ যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চলতে পারে না তাদেরকে অপরিবাহী বা অন্তরক পদার্থ বলে। অর্থাৎ যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন চলাচল করতে পারে না সেগুলো হলো অপরিবাহী পদার্থ। যেমন– প্লাস্টিক, রাবার, কাঠ, কাচ ইত্যাদি। অপরিবাহী পদার্থের মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না। প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে সহজে ইলেকট্রন প্রবাহিত হতে পারে না। যার ফলে প্লাস্টিক হলো বিদ্যুতের জন্য অপরিবাহী পদার্থ। এ কারণেই বৈদ্যুতিক মিস্ত্রিগণ যে সকল স্ক্রু ড্রাইভার এবং প্লায়ার ব্যবহার করেন তাদের হাতল প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ দ্বারা মোড়ানো থাকে। এ ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে যে সকল তামার বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করি সেগুলো প্লাস্টিক দ্বারা আবৃত থাকে।

৩. অর্ধপরিবাহীঃ যে সকল পদার্থের তড়িৎ পরিবহন ক্ষমতা সাধারণ তাপমাত্রায় পরিবাহী এবং অপরিবাহী পদার্থের মাঝামাঝি, সে সকল পদার্থকে অর্ধপরিবাহী বলে। যেমন– জার্মেনিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি। সুবিধামত অপদ্রব্য মিশিয়ে অর্ধপরিবাহী পদার্থের তড়িৎ পরিবাহকত্ব বৃদ্ধি করা যায়।

১১.৫ তড়িচ্চালক শক্তি এবং বিভব পার্থক্য
Electromotive force and potential difference

তড়িচ্চালক শক্তি

কোনো বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করার জন্য তড়িৎশক্তির প্রয়োজন হয়। যে সকল যন্ত্র অন্যকোনো ধরনের শক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে তাদেরই কেবল তড়িচ্চালক শক্তি আছে। যেমন– কোষ, জেনারেটর ইত্যাদি। তড়িৎকোষ রাসায়নিক শক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং জেনারেটর যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে। কোনো তড়িৎ উৎস একক ধনাত্মক আধানকে বর্তনীর এক বিন্দু থেকে উৎসসহ সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে আবার ঐ বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করে, তথা উৎস যে তড়িৎশক্তি ব্যয় করে, তাকে ঐ উৎসের তড়িচ্চালক শক্তি বলে। যদি Q আধানকে সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে আনতে W পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়, তাহলে একক আধানকে সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে আনতে কাজের পরিমাণ হবে $\frac{W}{Q}$। অতএব উৎসের তড়িচ্চালক শক্তি,

$$E = \frac{W}{Q}$$

একক: তড়িচ্চালক শক্তির SI একক হলো JC^{-1} যাকে ভোল্ট (V) বলা হয়।

বিভব পার্থক্য

পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের কারণে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। একক ধনাত্মক আধানকে বর্তনীর এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে স্থানান্তর করতে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয় তাকে ঐ দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য বলে। ড্রাইসেল দিয়ে টর্চ জ্বালালে সেল যে তড়িৎ শক্তি সরবরাহ করে তা আলো ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

শক্তির এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় শক্তির নিত্যতা সংরক্ষিত হয়। বাল্বের মধ্য দিয়ে একক আধান স্থানান্তরের ফলে যে পরিমাণ শক্তি রূপান্তরিত হয় তার পরিমাণই হলো বাল্বের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য।

সুতরাং বৈদ্যুতিক বর্তনীর দুইটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে একক ধনাত্মক আধান স্থানান্তরিত হলে যে পরিমাণ তড়িৎশক্তি অন্য কোনো ধরনের শক্তিতে (যেমন– তাপ ও আলো) রূপান্তরিত হয়, তার পরিমাণই ঐ দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য। Q আধান স্থানান্তরের জন্য রূপান্তরিত তড়িৎশক্তির পরিমাণ W হলে, ঐ দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য হলো

$$V = \frac{W}{Q}$$

বিভব পার্থক্য এবং তড়িচ্চালক শক্তির SI একক অভিন্ন। অর্থাৎ ভোল্ট (V)। দুইটি বিন্দুর বিভব পার্থক্য 1 ভোল্ট হবে যদি 1 কুলম্ব ধনাত্মক আধান বর্তনীর ঐ দুই বিন্দুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার ফলে 1 জুল তড়িৎশক্তি অন্যকোনো ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

পরীক্ষণ : ভোল্টমিটারের সাহায্যে একটি ড্রাইসেলের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য পরিমাপ কর। এটিই কোষের তড়িচ্চালক শক্তি E। এবার কোষটি দিয়ে টর্চের বাল্ব জ্বালানো অবস্থায় কোষের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য পরিমাপ কর।

প্রবাহ চলাকালীন ভোল্টমিটারের পাঠই হলো বাল্বের বা রোধের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য V। এবার পরিমাপকৃত তড়িচ্চালকশক্তি এবং বিভব পার্থক্যের মানের তুলনা কর। তুমি দেখতে পাবে E এর মান V এর মানের চেয়ে বড়। কোনো কোষের তড়িচ্চালক শক্তি কোষসহ বর্তনীর বিভিন্ন অংশে যে সকল বিভব পার্থক্যের সৃষ্টি হয় তাদের যোগফলের সমান।

১১.৬ বিভব পার্থক্য এবং তড়িৎ প্রবাহের মধ্যে সম্পর্ক: ও'মের সূত্র
Relationship between potential difference and electricity- Ohm's law

আমরা জানি কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকলে তার মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। এই তড়িৎ প্রবাহের মান নির্ভর করে পরিবাহীর দুই প্রান্তে কী পরিমাণ বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা হয়েছে তার উপর, পরিবাহী এবং তার তাপমাত্রার উপর। জর্জ সাইমন ও'ম কোনো পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহমাত্রা এবং এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সূত্র প্রদান করেন যা ও'মের সূত্র নামে পরিচিত।

ও'মের সূত্র

তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ প্রবাহ চলে তা ঐ পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক। সমানুপাতিক বলতে বুঝায় যদি পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য দ্বিগুণ করা হয়, তবে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ দ্বিগুণ হবে। আবার, যদি পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এক-তৃতীয়াংশ করা হয়, তবে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহও এক-তৃতীয়াংশ হবে।

মনে করি, AB একটি পরিবাহী তার। এর দুই প্রান্তের বিভব যথাক্রমে V_A এবং V_B [চিত্র ১১.৩]। যদি $V_A > V_B$ হয়, তাহলে পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য হবে $V = V_A - V_B$।

চিত্র: ১১.৩

এখন স্থির তাপমাত্রায় পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ I হলে, ও'মের সূত্রানুসারে,

$$I \propto V$$

$$\Rightarrow \frac{V}{I} = R = \text{ধ্রুবক}$$

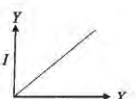

চিত্র : ১১.৪

এই ধ্রুবককে ঐ তাপমাত্রায় ঐ পরিবাহীর রোধ বলে।

অথবা $I = \frac{V}{R}$

একটি ছক কাগজের X অক্ষ বরাবর পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য V এবং Y অক্ষ বরাবর তড়িৎ প্রবাহ I স্থাপন করে লেখচিত্র অঙ্কন করলে এটি মূলবিন্দুগামী একটি সরলরেখা হবে [চিত্র : ১১.৪]।

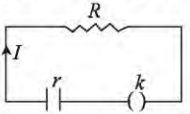

চিত্র : ১১.৫

১১.৫ চিত্রে একটি সরলবর্তনী দেখানো হলো। E তড়িৎ চালকশক্তি ও r অভ্যন্তরীণ রোধের একটি কোষকে R স্থির মানের রোধের সাথে সংযুক্ত করা হলো। ও'মের সূত্র প্রয়োগ করে এ বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ I পাওয়া যায়,

$$I = \frac{E}{R+r}$$

গাণিতিক উদাহরণ ১১.১ : একটি মোটর গাড়ির হেডলাইটের ফিলামেন্টের মধ্যদিয়ে 4 A তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। ফিলামেন্টের প্রান্তদ্বয়ের বিভব পার্থক্য 12 V হলে এর রোধ কত?

আমরা জানি,

$$I = \frac{V}{R}$$

বা $R = \frac{V}{I}$

$$= \frac{12V}{4A}$$

$= 3\,\Omega$ উ: $3\,\Omega$

এখানে,
তড়িৎ প্রবাহ, $I = 4$ A
বিভব পার্থক্য, $V = 12$ V
রোধ, $R = ?$

১১.৭ রোধ: স্থির এবং পরিবর্তী রোধ

Resistance : constant and variable resistance

আমরা জানি, তড়িৎ প্রবাহ হলো ইলেকট্রনের প্রবাহ। ইলেকট্রন কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে চলার সময় এর অভ্যন্তরের অণু পরমাণুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে এদের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তড়িৎ প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। পরিবাহীর এই ধর্মকে রোধ বলে। ও'মের সূত্র থেকে আমরা পাই,

$$\text{নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়, রোধ } R = \frac{V}{I}$$

$$= \frac{\text{তারের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য}}{\text{তারের তড়িৎপ্রবাহ}}$$

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এবং তড়িৎপ্রবাহ I এর অনুপাত দ্বারা ঐ তাপমাত্রায় ঐ পরিবাহীর রোধ পরিমাপ করা হয়।

রোধের SI একক হলো ও'ম। একে বড় হরফের ওমেগা (Ω) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য 1V হলে তার মধ্য দিয়ে যদি 1A তড়িৎ প্রবাহ চলে তবে তার রোধকে 1Ω বলে।

রোধক: নির্দিষ্ট মানের রোধবিশিষ্ট যে পরিবাহী তার কোনো বর্তনীতে ব্যবহার করা হয় তাকে রোধক বলে। রোধক ব্যবহারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বর্তনীতে প্রবাহিত তড়িতের মান নিয়ন্ত্রণ করা। বর্তনীতে ব্যবহৃত রোধক দুই প্রকার। যথা–

১. স্থির মানের রোধক
২. পরিবর্তী রোধক

১. স্থির মানের রোধক: যে সকল রোধকের রোধের মান নির্দিষ্ট তাদেরকে স্থির মানের রোধক বলে। সাধারণত ল্যাবরেটরিতে যে সকল স্থির মানের রোধক ব্যবহার করা হয় সেগুলো ১১.৬ নং চিত্রে দেখানো হলো:

চিত্র: ১১.৬

২. পরিবর্তী রোধক: পরিবর্তী রোধক হলো সেই সকল রোধক যাদের রোধের মান প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়। এদেরকে রিওস্টেটও বলা হয়। কোনো বর্তনীতে যখন তড়িৎ প্রবাহের মানের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখনই কেবল বর্তনীতে রিওস্টেট অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

চিত্র: ১১.৭

১১.৭ নং চিত্রে ল্যাবরেটরিতে সাধারণত যে ধরনের রিওস্টেট ব্যবহার করা তা দেখানো হয়েছে।

১১.৮ রোধের নির্ভরশীলতা
Dependence of resistance

আমরা জানি, যখন তাপমাত্রা এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা (যেমন– দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদ, উপাদান) অপরিবর্তিত থাকে তখন পরিবাহীর রোধ স্থির থাকে।

কোনো পরিবাহীর রোধ নিম্নের চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

১. পরিবাহীর দৈর্ঘ্য
২. পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল
৩. পরিবাহীর উপাদান এবং
৪. পরিবাহীর তাপমাত্রা

তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো পরিবাহীর রোধ শুধুমাত্র এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এবং উপাদানের উপর নির্ভর করে। রোধের এই নির্ভরশীলতা দুইটি সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

১১.৮ চিত্রে একই প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এবং একই উপাদান দ্বারা তৈরি দুইটি পরিবাহী তার P এবং Q দেখানো হয়েছে। P তারের দৈর্ঘ্য Q তারের চেয়ে বেশি হওয়ায় তার রোধও বেশি।

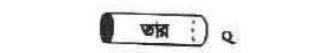

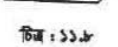

চিত্র : ১১.৮

দৈর্ঘ্যের সূত্র: নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট উপাদানের পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল স্থির থাকলে পরিবাহীর রোধ এর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক।

পরিবাহির দৈর্ঘ্য L, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A এবং রোধ R হলে, এই সূত্রানুসারে

$$R \propto L \quad \text{যখন তাপমাত্রা, উপাদান এবং } A \text{ ধ্রুব থাকে।} \qquad (11.1)$$

১১.৯ চিত্রে একই দৈর্ঘ্যের এবং একই উপাদান দ্বারা তৈরি দুইটি পরিবাহী তার S এবং T দেখানো হয়েছে। S তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল T তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা বেশি। যে তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বেশি তার রোধ কম।

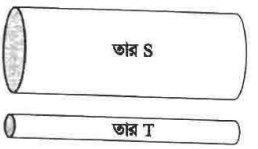

চিত্র ১১.৯

প্রস্থচ্ছেদের সূত্র: নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট উপাদানের পরিবাহীর দৈর্ঘ্য স্থির থাকলে পরিবাহীর রোধ এর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ব্যস্তানুপাতিক।

$$\text{অর্থাৎ} \quad R \propto \frac{1}{A} \text{ যখন তাপমাত্রা, উপাদান এবং } L \text{ ধ্রুব থাকে} \qquad (11.2)$$

তাপমাত্রা বাড়লে পরিবাহীর রোধ বাড়ে কিন্তু রোধ তাপমাত্রার সমানুপাতিক নয়। দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল সমান থাকলেও বিভিন্ন পরিবাহীর রোধ বিভিন্ন হয়। যেমন, একই দৈর্ঘ্য ও একই প্রস্থচ্ছেদের এবং একই তাপমাত্রায় রুপার তারের রোধের চেয়ে টাংস্টেনের তারের রোধ বেশি।

১১.৯ আপেক্ষিক রোধ এবং পরিবাহকত্ব
Resistivity and conductivity

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট উপাদানের পরিবাহীর রোধ তার দৈর্ঘ্যের সমানুপাতে এবং প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং রোধের সূত্র থেকে পাই,

$$R \propto \frac{L}{A}, \text{ যখন তাপমাত্রা ও উপাদান ধ্রুব থাকে।}$$

$$\text{অথবা} \quad R = \rho \frac{L}{A} \qquad (11.3)$$

এখানে ρ একটি ধ্রুবক, যার মান পরিবাহীর উপাদান এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। একে ঐ তাপমাত্রায় পরিবাহীর উপাদানের আপেক্ষিক রোধ বা রোধকত্ব বলে।

(11.3) সমীকরণে $L = 1$ একক এবং $A = 1$ একক হলে, $\rho = R$ হয়।

অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একক দৈর্ঘ্য ও একক প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কোনো পরিবাহীর রোধকে ঐ তাপমাত্রায় এর উপাদানের আপেক্ষিক রোধ বলে।

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর রোধ এর ভৌত অবস্থার (যেমন দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদ ইত্যাদি) উপর নির্ভর করে। কিন্তু এর আপেক্ষিক রোধ শুধুমাত্র এর উপাদানের উপর নির্ভরশীল।

আপেক্ষিক রোধের একক: (11.3) সমীকরণকে সাজিয়ে লেখা যায়,

$$\rho = R \frac{A}{L} \qquad (11.4)$$

সমীকরণের ডানপাশের রাশিগুলোর একক বসিয়ে আপেক্ষিক রোধক ρ –এর একক পাওয়া যায়, $\frac{\Omega m^2}{m} = \Omega m$

তাৎপর্য: 20 °C তাপমাত্রায় রুপার আপেক্ষিক রোধ $1.6\times10^{-8}\ \Omega$ m। অর্থাৎ 20 °C তাপমাত্রায় 1m দৈর্ঘ্য ও $1m^2$ প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট রুপার তারের রোধ হবে $1.6\times10^{-8}\ \Omega$। ডান পাশের সারণিতে কিছু সাধারণ পদার্থের আপেক্ষিক রোধ দেখানো হয়েছে।

সারণি ১১.২: বিভিন্ন পদার্থের আপেক্ষিক রোধ

পদার্থ	আপেক্ষিক রোধ (Ω m)
রুপা	1.6×10^{-8}
তামা	1.7×10^{-8}
টাংস্টেন	5.5×10^{-8}
নাইক্রোম	100×10^{-8}

উপরের সারণি থেকে আমরা দেখতে পাই, যে সকল পদার্থের আপেক্ষিক রোধ কম সেগুলো তড়িতের জন্য সুপরিবাহক হিসেবে কাজ করে। যেমন, তামা নাইক্রোমের তুলনায় তড়িৎ সুপরিবাহী। এ কারণেই বৈদ্যুতিক বর্তনীতে সংযোগ তার হিসেবে তামার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

এছাড়া যে সকল পদার্থের আপেক্ষিক রোধের মান তুলনামূলকভাবে বেশি তাদেরও বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে নাইক্রোম তারের কথাই ধরা যাক। নাইক্রোমের আপেক্ষিক রোধ এবং গলনাঙ্ক তামার তুলনায় অনেক বেশি। উচ্চ আপেক্ষিক রোধের কারণেই নাইক্রোম তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। নাইক্রোমের এ ধর্মের কারণেই বৈদ্যুতিক কেটলিতে পানি খুব দ্রুত গরম হয়। আমরা বাড়িতে যে সকল বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যবহার করি তাদের ফিলামেন্ট টাংস্টেন দ্বারা তৈরি হয়। টাংস্টেনের উচ্চ আপেক্ষিক রোধ ও গলনাঙ্কের কারণে এটি বৈদ্যুতিক শক্তিকে খুব সহজে আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে।

পরিবাহকত্ব

রোধের বিপরীত রাশি হলো পরিবাহিতা, তেমনি আপেক্ষিক রোধের বিপরীত রাশিকে পরিবাহকত্ব বলে। পরিবাহকত্বকে σ অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর মান পরিবাহীর উপাদান ও তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

মনে করি, একটি পরিবাহীর উপাদানের আপেক্ষিক রোধ ρ

সুতরাং, ঐ পরিবাহীর উপাদানের পরিবাহকত্ব σ হবে–

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

যেহেতু ρ –এর একক Ω m, সুতরাং σ–এর একক হলো $(\Omega\ m)^{-1}$।

গাণিতিক উদাহরণ ১১.৪। একটি বৈদ্যুতিক হিটারে ব্যবহৃত নাইক্রোম তারের আপেক্ষিক রোধ $100 \times 10^{-8}\ \Omega$ m। 15 m লম্বা এবং $2.0 \times 10^{-7}\ m^2$ প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট তারের রোধ কত হবে ?

আমরা জানি,

$$R = \rho\frac{L}{A}$$
$$= \frac{(100\times10^{-8}\ \Omega\ m)(15\ m)}{2.0\times10^{-7}\ m^2}$$
$$= 75\ \Omega$$

উত্তর : রোধ $75\ \Omega$।

এখানে,
আপেক্ষিক রোধ, $\rho = 100 \times 10^{-8}\ \Omega$ m
তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, $A = 2.0 \times 10^{-7}\ m^2$
তারের দৈর্ঘ্য, $L = 15$ m
রোধ, $R = ?$

১১.১০ শ্রেণি এবং সমান্তরাল বর্তনী তৈরি ও ব্যবহার
Series and parallel circuits and their uses

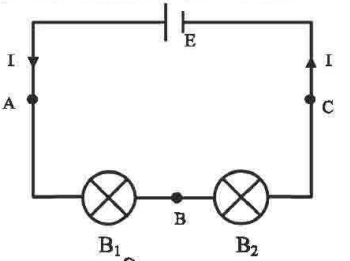

চিত্র : ১১.১০

শ্রেণি বর্তনী

যে বর্তনীতে তড়িৎ উপকরণগুলো পরপর সাজানো থাকে তাকে শ্রেণি বর্তনী বলে। ১১.১০ চিত্রে কোষ E, দুইটি বাল্ব B_1, B_2 পরপর সাজিয়ে শ্রেণি বর্তনী তৈরি করা হয়েছে। যেহেতু এই বর্তনীতে একটি মাত্র পথ রয়েছে, তাই এর সর্বত্র একই প্রবাহ চলবে। এখন যদি একটি অ্যামিটারকে A, B, বা C বিন্দুতেও সংযোগ দেওয়া যায় তাহলেও তড়িৎ প্রবাহের একই মান পাওয়া যাবে।

বিয়ে বাড়িতে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আলোকসজ্জায় যে সকল ছোট ছোট বাতি ব্যবহার করা হয় এগুলো শ্রেণিবদ্ধভাবে সংযুক্ত করা হয়। আমরা টর্চ লাইটে একাধিক ব্যাটারিকে শ্রেণিতে সংযুক্ত করে ভোল্টেজ বৃদ্ধি করে থাকি। তড়িৎ প্রবাহ পরিমাপের জন্য অ্যামিটারকে বর্তনীতে শ্রেণিতে যুক্ত করা হয়।

সমান্তরাল বর্তনী

যে বর্তনীতে তড়িৎ উপকরণগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে প্রত্যেকটির এক প্রান্তগুলো একটি সাধারণ বিন্দুতে এবং অপরপ্রান্তগুলো অন্য একটি সাধারণ বিন্দুতে সংযুক্ত থাকে তবে তাকে সমান্তরাল বর্তনী বলে। ১১.১১ চিত্রে বাল্ব B_1 ও B_2 এর একপ্রান্ত a বিন্দুতে এবং অপর প্রান্ত b বিন্দুতে সংযুক্ত থাকায় এগুলো একটি সমান্তরাল বর্তনী তৈরি করে। সমান্তরাল বর্তনীতে একাধিক পথ থাকায় প্রত্যেক পথ দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চলে।

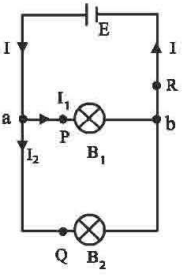

ধরা যাক বর্তনীর মোট প্রবাহ I। এই প্রবাহ a বিন্দুতে এসে দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়। তড়িৎ প্রবাহের একটি অংশ I_1 যায় প্রথম বাল্ব B_1 দিয়ে এবং বাকী অংশ I_2 যায় দ্বিতীয় বাল্ব B_2 দিয়ে। b বিন্দুতে এসে প্রবাহ দুইটি একত্রিত হয়ে পুনরায় I প্রবাহ গঠন করে। P, Q এবং R বিন্দুতে অ্যামিটারের সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহ পরিমাপ করলে দেখা যাবে,

$I = I_1 + I_2$

এখানে বর্তনীর মূল তড়িৎপ্রবাহ I

অর্থাৎ, সমান্তরাল বর্তনীতে প্রত্যেক সমান্তরাল শাখায় প্রবাহিত স্বতন্ত্র তড়িৎ প্রবাহসমূহের যোগফল বর্তনীর মূল প্রবাহের সমান।

আমরা বাড়িতে বা অফিসে যে সকল বৈদ্যুতিক উপকরণ যেমন– বাতি, ফ্যান ইত্যাদি ব্যবহার করি এগুলো এসি মেইন লাইনের সাথে সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করা হয়। সমান্তরালভাবে সংযোগের ফলে প্রত্যেকটি উপকরণ একই ভোল্টেজ সরবরাহ পায়। কিন্তু উপকরণগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহ গ্রহণ করে।

১১.১১ তুল্যরোধ এবং বর্তনীতে তুল্যরোধ নির্ণয়
Equivalent resistance and determination of equivalent resistance in circuit

অনেক সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে একাধিক রোধকে একত্রে ব্যবহার করতে হয়। একাধিক রোধকে একত্রে সংযোগ করাকেই রোধের সন্নিবেশ বলে।

তুল্যরোধ: রোধের কোনো সন্নিবেশের পরিবর্তে যে একটি মাত্র রোধ ব্যবহার করলে বর্তনীর প্রবাহমাত্রা ও বিভব পার্থক্যের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে ঐ সন্নিবেশের তুল্য রোধ বলে।

রোধের সন্নিবেশ দুই ধরনের হতে পারে, যথা– শ্রেণি সন্নিবেশ ও সমান্তরাল সন্নিবেশ।

রোধের শ্রেণি সন্নিবেশ

১১.১২ চিত্রে রোধক R_1, R_2 এবং R_3 শ্রেণিবদ্ধভাবে সংযুক্ত আছে। রোধগুলো পর্যায়ক্রমে একটির পর অন্যটি সংযুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি রোধের মধ্য দিয়ে একই মানের তড়িৎ প্রবাহ I প্রবাহিত হচ্ছে। এখন আমরা শ্রেণি সন্নিবেশে সংযুক্ত এই তিনটি রোধের তুল্য রোধ নির্ণয় করবো।

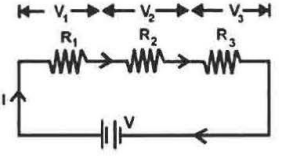

চিত্র : ১১.১২

ও'মের সূত্র থেকে আমরা জানি,

R_1 রোধের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য, $V_1 = IR_1$

R_2 রোধের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য, $V_2 = IR_2$

R_3 রোধের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য, $V_3 = IR_3$

সবগুলো রোধের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য অর্থাৎ সন্নিবেশের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য V হলে

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$
$$= IR_1 + IR_2 + IR_3$$
$$= I(R_1 + R_2 + R_3) \quad (11.5)$$

এখন R_1, R_2 ও R_3 মানের রোধ তিনটিকে যদি R_s মানের এমন একটি রোধ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয় যে, এতে বর্তনীতে একই প্রবাহ I চলে এবং রোধগুলোর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য V অপরিবর্তিত থাকে তাহলে R_s ই হবে এই সন্নিবেশের তুল্য রোধ।

তুল্যরোধের ক্ষেত্রে $V = IR_s$ (11.6)

সমীকরণ তুলনা করে পাই,

$$IR_s = I(R_1 + R_2 + R_3)$$
$$R_S = R_1 + R_2 + R_3$$

তিনটি রোধের পরিবর্তে যদি n সংখ্যক রোধ শ্রেণি সন্নিবেশে যুক্ত থাকে, তা হলে তুল্য রোধ R_s হবে

$$R_S = R_1 + R_2 + R_3 + ... + R_n$$

অর্থাৎ শ্রেণি সন্নিবেশে সংযুক্ত রোধগুলোর তুল্যরোধের মান সন্নিবেশে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রোধের মানের যোগফলের সমান। শ্রেণি সন্নিবেশে তুল্যরোধের মান আলাদা আলাদা প্রত্যেকটি রোধের মানের চেয়ে বড়।

সমান্তরাল সন্নিবেশ: কতকগুলো রোধ যদি এমনভাবে সংযুক্ত করা হয় যে, সবকয়টি রোধের একপ্রান্ত একটি সাধারণ বিন্দু A-তে এবং অপর প্রান্তগুলো অন্য একটি সাধারণ বিন্দু B-তে সংযুক্ত থাকে এবং প্রত্যেকটি রোধের দুই প্রান্তে একই বিভব পার্থক্য বজায় থাকে, তবে রোধগুলোর এই সন্নিবেশকে সমান্তরাল সন্নিবেশ বলা হয়।

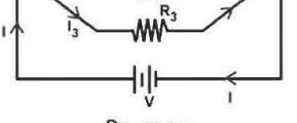

চিত্র : ১১.১৩

১১.১৩ চিত্রে তিনটি রোধক R_1, R_2 এবং R_3 সমান্তরাল সন্নিবেশে সংযুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনটি রোধের দুই প্রান্তে একই বিভব পার্থক্য V বজায় আছে। রোধের মানের বিভিন্নতার জন্য তাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়ে আলাদা মানের তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে বর্তনীর মূল প্রবাহ I, A -সংযোগ বিন্দুতে এসে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয় এবং পুনরায় B বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। ধরা যাক, R_1, R_2 এবং R_3 রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের মান যথাক্রমে I_1, I_2 এবং I_3। সুতরাং সমান্তরাল পথগুলোর প্রবাহ I_1, I_2 এবং I_3 –এর যোগফল সংযোগ বিন্দু A -এর প্রবাহ I এর সমান। অর্থাৎ

$$\therefore I = I_1 + I_2 + I_3 \quad (11.7)$$

এক্ষেত্রে, প্রত্যেকটি রোধের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য V হওয়ায় ও'মের সূত্র প্রয়োগ করে আমরা পাই,

$$I_1 = \frac{V}{R_1},\ I_2 = \frac{V}{R_2} \text{ এবং } I_3 = \frac{V}{R_3}$$

(11.7) নং সমীকরণে I_1, I_2 এবং I_3 –এর মান বসিয়ে পাই,

$$I = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

$$= V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) \qquad (11.8)$$

এখন R_1, R_2 ও R_3 মানের রোধ তিনটিকে যদি R_P মানের এমন একটি রোধ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয় যে, এতে বর্তনীতে একই প্রবাহ I চলে এবং রোধগুলোর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য V অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে R_P ই হবে ঐ সন্নিবেশের তুল্য রোধ।

$$\therefore \quad I = \frac{V}{R_P} \qquad (11.9)$$

(11.8) ও (11.9) সমীকরণ তুলনা করে পাওয়া যায়,

$$\frac{V}{R_P} = V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

$$\frac{1}{R_P} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

তিনটি রোধের পরিবর্তে যদি n সংখ্যক রোধ সমান্তরাল সন্নিবেশে যুক্ত থাকে, তাহলে তুল্যরোধ R_P কে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায়।

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \ldots + \frac{1}{R_n} \qquad (11.10)$$

অর্থাৎ সমান্তরাল সন্নিবেশে সংযুক্ত প্রত্যেকটি রোধের বিপরীত রাশির সমষ্টি তুল্যরোধের বিপরীত রাশির সমান।

গাণিতিক উদাহরণ ১১.৬ : $5\ \Omega$ এবং $10\ \Omega$ মানের দুইটি রোধ আলাদাভাবে শ্রেণি এবং সমান্তরাল সন্নিবেশে সংযুক্ত করলে উভয় ক্ষেত্রে তুল্য রোধের মান নির্ণয় কর।

আমরা জানি,

এখানে,
প্রথম রোধ, $R_1 = 5\ \Omega$
দ্বিতীয় রোধ, $R_2 = 10\ \Omega$
শ্রেণি সমবায়ে তুল্য রোধ, $R_S = ?$
সমান্তলাল সমবায়ে তুল্য রোধ, $R_P = ?$

$$R_S = R_1 + R_2$$
$$= 5\ \Omega + 10\ \Omega$$
$$= 15\ \Omega$$

আবার,

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{5\Omega} + \frac{1}{10\Omega}$$

$$= \frac{2+1}{10}\Omega^{-1}$$

$$= \frac{3}{10}\Omega^{-1}$$

$$R_P = 3.33\ \Omega$$

উ: $R_S = 15\ \Omega$ এবং $R_P = 3.33\ \Omega$

১১.১২ তড়িৎ ক্ষমতা
Electric power

যখন কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা হয়, তখন ঐ পরিবাহীতে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এর ফলে কাজ সম্পন্ন হয় এবং ইলেকট্রনগুলো শক্তি অর্জন করে। এই তড়িৎশক্তি বর্তনীর প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার শক্তিতে যেমন– তাপ, আলো, যান্ত্রিকশক্তি ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

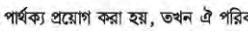

চিত্র : ১১.১৪

ধরা যাক, AB, R রোধের একটি পরিবাহী এর মধ্য দিয়ে t সময়ে Q পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় এবং A ও B বিন্দুর বিভব পার্থক্য V। আমরা জানি যদি, কোনো পরিবাহির দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য 1 ভোল্ট হয় এবং এর মধ্য দিয়ে 1 কুলম্ব আধান প্রবাহিত হয়, তখন কৃত কাজের পরিমাণ হয় তথা ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ হয় 1 জুল। সুতরাং পরিবাহীর মধ্য দিয়ে Q কুলম্ব আধান পরিবাহিত হলে কৃত কাজ VQ জুল।

সুতরাং, ব্যয়িত শক্তি তথা রূপান্তরিত মোট শক্তির পরিমাণ

$$W = VQ$$

আবার তড়িৎপ্রবাহ, $$I = \frac{Q}{t}$$

বা, $$Q = It$$

$$\therefore \quad W = VIt \tag{11.11}$$

ও'মের সূত্র ব্যবহার করে এ সম্পর্ককে নিম্নোক্তভাবেও প্রকাশ করা যায়।

$$\therefore \quad W = VIt = I^2Rt = \frac{V^2}{R}t \text{ জুল} \tag{11.12}$$

তড়িৎ ক্ষমতা

আমরা বাড়ি ও কলকারখানায় যে সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি তাদের প্রত্যেকটির গায়ে সাধারণত কী পরিমাণ ভোল্টেজে এটি চলে তা এবং এর তড়িৎ ক্ষমতা ওয়াট লেখা থাকে। আমরা জানি কাজ সম্পাদনের হার তথা শক্তি রূপান্তরের হারকে ক্ষমতা বলে। সুতরাং, কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রে তড়িৎশক্তি অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তাই হলো এ যন্ত্রের ক্ষমতা P।

$$\text{অর্থাৎ, ক্ষমতা} = \frac{\text{কৃত কাজ}}{\text{সময়}} = \frac{\text{রূপান্তরিত শক্তি}}{\text{সময়}}$$

$$\therefore \quad P = \frac{W}{t} \tag{11.13}$$

সমীকরণ (11.11) থেকে W –এর মান বসিয়ে পাই,

$$P = VI \tag{11.14}$$

ও'মের সূত্র প্রয়োগ করে P কে V, I এবং R –এর সাহায্যে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়–

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R} \tag{11.15}$$

আমরা জানি ক্ষমতার একক হল ওয়াট (W)। তড়িৎ শক্তি হিসাবের সময় সাধারণত ওয়াটের পরিবর্তে kW, MW ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। $1\text{kW} = 10^3\text{W}$ এবং $1\text{MW} = 10^6\text{W}$।

আমরা বাসাবাড়িতে যে সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি তার মধ্যে কয়েকটির ক্ষমতা উল্লেখ করা হলো। বৈদ্যুতিক বাল্বের ক্ষমতা 40, 60, 100 W হয়ে থাকে। বৈদ্যুতিক পাখার ক্ষমতা সাধারণত 65-75 W হয়।

টেলিভিশনের ক্ষমতা সাধারণত 60-70 W। আজকাল আমরা যে সকল এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করি এগুলোর ক্ষমতা সাধারণত 11-30 W হয়।

এছাড়াও আমরা বাসায় ফ্রিজ, হিটার, ইস্ত্রি, ব্যবহার করি এদের ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই পিক আওয়ারে এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করা ভালো।

তড়িৎশক্তি ব্যয়ের হিসাব

আমরা বাসাবাড়ি, দোকান, কলকারখানায় যে তড়িৎ শক্তি ব্যবহার করি তার জন্য মূল্য পরিশোধ করতে হয়। তড়িৎ শক্তি ব্যবহার করে এমন প্রত্যেক বাড়িতে একটি বৈদ্যুতিক মিটার থাকে যা বাড়িতে ব্যয়িত তড়িৎ শক্তির হিসাব রাখে। বিশ্বব্যাপী তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কিলোওয়াট–ঘণ্টা (kWh) এককে ব্যয়িত তড়িৎশক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করে। আমরা এই কিলোওয়াট–ঘন্টা এককে বোর্ড অব ট্রেড ইউনিট বা সংক্ষেপে ইউনিট বলে থাকি। বৈদ্যুতিক মিটারে দুই সময়ের রিডিং–এর পার্থক্য থেকে ঐ সময়ের ব্যবহৃত তড়িৎ–শক্তির পরিমাণ পাওয়া যায়।

যেহেতু ক্ষমতা $P = \frac{\text{কৃত কাজ}}{\text{সময়}} = \frac{\text{রূপান্তরিত শক্তি}}{\text{সময়}}$, $P = \frac{W}{t}$

$$\therefore W = Pt$$

যদি P=1 kW এবং t =1h হয়, তখন W=1 kW × 1h=1 kWh হয়।

অর্থাৎ এক কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো তড়িৎ যন্ত্র এক ঘণ্টা ধরে কাজ করলে যে পরিমাণ তড়িৎশক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করে বা ব্যয় করে তাকে এক কিলোওয়াট–ঘণ্টা বা এক ইউনিট বলে।

নিজে কর : 1kWh কে জুলে প্রকাশ কর।

$1\ \text{kWh} = 3.6 \times 10^6\ \text{J}$

ক্ষমতাকে ওয়াটে এবং সময়কে ঘণ্টায় প্রকাশ করলে, ব্যয়িত তড়িৎশক্তি W –কে লেখা যায়–

$$W = Pt\ \text{Wh}$$

একে 1000 দিয়ে ভাগ করলে ব্যয়িত শক্তি kWh এ পাওয়া যাবে।

নিজে কর: তুমি যে ঘরে বাস করো, সেই ঘরে যদি বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকে, তাহলে ঐ ঘরে কী কী বৈদ্যুতিক উপকরণ আছে, তার একটি তালিকা তৈরি কর। এর থেকে ঐ ঘরের জন্য এক মাসের সম্ভাব্য ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় কর।

গাণিতিক উদাহরণ ১১.৭ : একটি বাল্বের গায়ে 100 W- 220 V লিখা আছে। এর ফিলামেন্টের রোধ কত ? এর মধ্যদিয়ে কী পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হবে ?

আমরা জানি,

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$R = \frac{V^2}{P}$$

$$= \frac{220\text{V} \times 220\text{ V}}{100\text{W}}$$

$$= 484\ \Omega$$

এখানে
বিভব পার্থক্য, $V = 220$ V
ক্ষমতা, $P = 100$ W
রোধ, $R = ?$
তড়িৎ প্রবাহ, $I = ?$

আবার, $P = VI$

$$I = \frac{P}{V}$$

$$= \frac{100\text{W}}{220\text{V}}$$

$$= 0.455\ \text{A}$$

উ: 484 Ω এবং 0.455 A

১১.১৩ তড়িতের সিস্টেম লস এবং লোড শেডিং

System loss and load sheding

আমরা জানি, দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিদ্যুৎ পাওয়ার প্লান্টগুলোতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হয়। উৎপন্ন এই বিদ্যুৎকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে সঞ্চালন করতে হয়। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তিকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিদ্যুৎ সাবস্টেশনে স্থানান্তর করা হয়। এরপর বিভিন্ন সাবস্টেশন থেকে পুনরায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তিকে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ শক্তি নিম্ন ভোল্টেজে উৎপাদন করা হয়। পরে এই ভোল্টেজকে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে উচ্চ ভোল্টেজে রূপান্তরিত করা হয়। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য যে সকল পরিবাহী তার ব্যবহার করা হয় তাদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রোধ থাকে। ফলে এই রোধকে অতিক্রমের জন্য তড়িৎশক্তির একটি অংশ তাপে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ শক্তির লস বা ক্ষয় হয়। এই লসই হলো তড়িতের সিস্টেম লস। উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ফলে বিদ্যুৎ গ্রিড তথা পরিবাহীর রোধের কারণে যে লস হয় তা অনেকাংশে কমে যায়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তির জন্য, উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ফলে তড়িৎ প্রবাহের মান কম হয়। এর ফলে রোধজনিত লসের পরিমাণও কমে যায়। উদাহারণ হিসেবে বলা যায়– যদি সঞ্চালন লাইন ভোল্টেজকে দশ গুণ বৃদ্ধি করা হয়, তখন তড়িৎ প্রবাহের মান এক দশমাংশ হয়। যার ফলে বিদ্যুৎ গ্রিডের I^2R লসের পরিমাণ একশত ভাগের এক ভাগ হয়। অর্থাৎ সঞ্চালন লাইনের ভোল্টেজকে বৃদ্ধি করে সিস্টেম লস কমানো যেতে পারে।

লোড শেডিং

প্রত্যেকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে। সবগুলো বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়। বিভিন্ন এলাকার চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র জাতীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র গ্রাহক পর্যায়ে এ বিদ্যুৎকে পৌঁছে দেয় বা বিতরণ করে। কোনো নির্দিষ্ট এলাকার বিদ্যুতের চাহিদা উৎপাদন বা সরবরাহের তুলনায় বেশি হলে তখন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের পক্ষে চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়ে উঠে না। তখন বাধ্য হয়ে উপকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বিতরণ ব্যবস্থার নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ বিতরণ বন্ধ করে দেয় বা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। একে লোড শেডিং বলে। আবার উপকেন্দ্র যখন প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ পায় তখন পুনরায় ঐ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।

যদি লোড শেডিং এক নাগাড়ে কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হয় তখন গ্রাহক পর্যায়ে লোডশেডিংকে সহনীয় করতে কর্তৃপক্ষ চক্রাকারে বিভিন্ন এলাকায় লোড শেডিং করে থাকে।

১১.১৪ তড়িতের নিরাপদ ও কার্যকর ব্যবহার
Safe and effective use of electricity

তড়িতের বিপজ্জনক দিকসমূহ: তড়িৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তড়িৎ আমাদের যেমন অনেক উপকারে আসে তেমনি এর অসতর্ক ব্যবহার অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং বর্তনীতে যেকোনো ধরনের ত্রুটি বৈদ্যুতিক শক্ দিতে পারে এবং অগ্নিকান্ড ঘটাতে পারে। শরীরের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে মানুষের মৃত্যুরও ঝুঁকি রয়েছে। তড়িৎশক্তির ব্যবহার নিম্নবর্ণিত তিনটি কারণে বিপজ্জনক হতে পারে।

১. অন্তরকের ক্ষতিসাধন;

২. ক্যাবলের অতি উত্তপ্ত হওয়া;

৩. আর্দ্র অবস্থা।

১.অন্তরকের ক্ষতিসাধন : বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে কাজ করতে হলে তাদেরকে ভোল্টেজ উৎসের সাথে দুইটি পরিবাহী তার দ্বারা সংযুক্ত করে বর্তনী সম্পূর্ণ করতে হয়। এই দুইটি তারকে আমরা বলি জীবন্ত (Live) এবং নিরপেক্ষ (Neutral) তার। এ সকল পরিবাহী তার সাধারণত রাবার দ্বারা অন্তরিত অবস্থায় থাকে। দুইটি তারকে পরে একত্রিত অবস্থায় পিভিসি বা রাবার দ্বারা আবৃত করে ক্যাবল তৈরি করা হয়।

সময় এবং ব্যবহার এর সাথে সাথে এ সকল অন্তরক পদার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন আমরা বাড়িতে যে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ব্যবহার করি এর ক্যাবল ব্যবহারের সময় বেঁকে যায় এবং মোচড় খায়। এতে করে অভ্যন্তরস্থ অন্তরক ব্যবস্থা ফেটে এবং ভেঙে যেতে পারে। ফলে পরিবাহী তার উন্মুক্ত হয়ে যায়। এখন কোনোভাবে যদি জীবন্ত তার শরীরের সংস্পর্শে আসে তখন মারাত্মক বৈদ্যুতিক শক্ দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়। এছাড়া অন্তরক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে জীবন্ত তার এবং নিরপেক্ষ তার পরস্পরের সংস্পর্শে আসলে শর্ট সার্কিটের সৃষ্টি হবে এবং অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে।

চিত্র ১১.১৫: বিপজ্জনক অবস্থায় হেয়ার ড্রায়ার

২. ক্যাবলের অতি উত্তপ্ত হওয়া: যখন অস্বাভাবিকভাবে বেশি পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ বৈদ্যুতিক ক্যাবল বা পরিবাহী তার দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন এটি উত্তপ্ত হয়। যেমন– যখন বৈদ্যুতিক পাখার মোটর অতি উত্তপ্ত হয় এবং গলে যায়, ফলশ্রুতিতে জীবন্ত তার এবং নিরপেক্ষ তার একত্রিত হয়ে যায় এবং অস্বাভাবিকভাবে উচ্চমানের তড়িৎ প্রবাহিত হয়। এছাড়া অনেক সময় আমরা সকেটে মাল্টিপ্লাগ ব্যবহার করে অনেকগুলো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে একসঙ্গে সংযোগ দেই। এর ফলে সকেটের অভ্যন্তরস্থ পরিবাহী তার মেইন লাইন থেকে যে পরিমাণ তড়িৎ গ্রহণ করে তা এই পরিবাহী তার নিরাপদে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ গ্রহণ করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি হয়। এর ফলে ক্যাবল তার অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে উঠে, অন্তরক ব্যবস্থা গলে যায় এবং অগ্নিকান্ড ঘটায়।

৩. আর্দ্র অবস্থা: আর্দ্র অবস্থায় অনেক বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। আমরা জানি, পানির মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে। এ কারণে কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের যে সকল অংশ অন্তরিত অবস্থায় থাকে না সেগুলো সবসময় শুষ্ক রাখতে হবে। অন্যথায় বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট এবং শক্ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো হেয়ার ড্রায়ারকে ভেজা সিঙ্কে রেখে দেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। যদি হেয়ার ড্রায়ারের তার উন্মুক্ত থাকে কিংবা তারের অন্তরক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তখন যিনি সিঙ্ক ব্যবহার করছেন তিনি বৈদ্যুতিক শক্ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। এছাড়াও ভেজা হাত দ্বারা কোনো বৈদ্যুতিক সুইচ অন্ বা অফ্ করাও বিপজ্জনক।

তড়িতের নিরাপদ ব্যবহার

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে তোমরা তড়িৎ ব্যবহারের বিপজ্জনক দিক সম্পর্কে অবহিত হয়েছ। বর্তমান অনুচ্ছেদে আমরা বাড়িতে তড়িতের নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে জানব।

বাড়িতে তড়িৎ ব্যবহারের সময় যে সকল নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন এগুলো হলো:

১. সার্কিট ব্রেকার
২. ফিউজ
৩. সুইচের সঠিক সংযোগ
৪. ভূসংযোগ তার

১. সার্কিট ব্রেকার: নিরাপত্তামূলক কৌশল হিসাবে সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত বাড়ির সন্মুখ দরজার আশেপাশে স্থাপন করা হয়। যখন কোনো বর্তনীতে নির্দিষ্ট মানের অধিক তড়িৎ প্রবাহিত হয় তখন সার্কিট ব্রেকার বর্তনীর তড়িৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। সার্কিট ব্রেকার বাড়ির কোনো নির্দিষ্ট অংশের তড়িৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে। বর্তনীতে সার্কিট ব্রেকার না থাকলে অতিরিক্ত তড়িৎ প্রবাহের জন্য বাড়ির তড়িৎ সরঞ্জাম বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমনকি অগ্নিকাণ্ডও ঘটতে পারে।

২. ফিউজ: ফিউজ হলো একটি নিরাপত্তামূলক কৌশল। বৈদ্যুতিক বর্তনীতে অধিক তড়িৎপ্রবাহ প্রতিরোধের জন্য ফিউজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফিউজটিকে সবসময় বৈদ্যুতিক ক্যাবলের জীবন্ত তারে সংযোগ দেওয়া হয়। একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিকন তার ফিউজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট মানের তড়িৎপ্রবাহ অপেক্ষা বেশি তড়িৎ প্রবাহিত হলে ফিউজটি উত্তপ্ত হয় এবং গলে যায়। এতে বর্তনী বিচ্ছিন্ন হয় এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। ফিউজের গায়ে নির্দিষ্ট মানের তড়িৎপ্রবাহের উল্লেখ থাকে। কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা সরঞ্জাম সর্বোচ্চ যে মানের তড়িৎপ্রবাহ বহন করতে পারে তার চেয়ে সামান্য বেশি তড়িৎপ্রবাহ বহনে সক্ষম এমন ফিউজ ব্যবহার করতে হবে। এতে করে ফিউজ পুড়ে গেলেও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামটি তড়িতায়িত হবে না। এছাড়াও ফিউজ পরিবর্তনের সময় বিদ্যুৎ সরবরাহের মেইন সুইচ্ বন্ধ করতে হবে।

৩. সুইচের সঠিক সংযোগ: সুইচের কাজ হলো কোনো বৈদ্যুতিক বর্তনীকে সম্পূর্ণ করা অথবা বর্তনীকে বিচ্ছিন্ন করা। বর্তনীতে সুইচ লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে, এটি যেন জীবন্ত তারে সংযোগ দেওয়া হয়। এতে করে সুইচ বন্ধ করা মাত্র উচ্চ বিভব উৎস থেকে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিচ্ছিন্ন হবে [চিত্র ১১.১৬]। সুইচটিকে যদি ভুলবশত নিরপেক্ষ তারে সংযোগ দেওয়া হয়, তখন সুইচ বন্ধ করার পরও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামটি জীবন্ত থাকবে [চিত্র ১১.১৭] এবং বৈদ্যুতিক শকের ঝুঁকি বাড়বে।

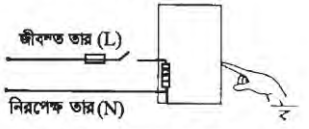

চিত্র : ১১.১৬: সুইচের সঠিক সংযোগ

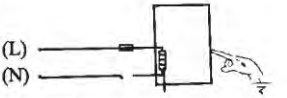

চিত্র ১১.১৭: সুইচের ভুল সংযোগ

৩. ভূসংযোগ তার: সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বা উপকরণের বৈদ্যুতিক বর্তনী সম্পূর্ণ করার জন্য কমপক্ষে দুইটি তারের দরকার। এগুলো হলো জীবন্ত (*L*) ও নিরপেক্ষ (*N*) তার। জীবন্ত তার বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করে। অপরদিকে নিরপেক্ষ তারের মাধ্যমে তড়িৎপ্রবাহ উৎসে ফিরে আসে এবং বর্তনী সম্পূর্ণ করে। নিরপেক্ষ তারের বিভব শূন্য। ভূসংযোগ তার হলো নিম্নরোধের তার। এটি সাধারণত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ধাতব ঢাকনার (Casing) সাথে সংযুক্ত থাকে। বিভিন্ন কারণে বর্তনী ত্রুটিযুক্ত থাকতে পারে। যেমন– যদি জীবন্ত তার সঠিকভাবে সংযুক্ত না থাকে এবং তা যদি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ধাতব ঢাকনাকে স্পর্শ করে তবে ব্যবহারকারী বৈদ্যুতিক শক দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। ধাতব ঢাকনাটি ভূসংযুক্ত অবস্থায় থাকলে এমনটি ঘটবে না। এক্ষেত্রে জীবন্ত তার থেকে উচ্চমানের তড়িৎপ্রবাহ ধাতব ঢাকনা হয়ে ভূসংযোগ তার দিয়ে মাটিতে চলে যাবে। ফলে ফিউজটি পুড়ে যাবে এবং তড়িৎযন্ত্রের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। বাড়িতে ব্যবহৃত ফ্রিজের নিরাপদ ব্যবহারের জন্য অবশ্যই ভূসংযোগ বা আর্থিং দেওয়া উচিৎ। ১১.১৮ চিত্রে ভূসংযোগ তারবিহীন ওয়াশিং মেশিন কীভাবে বিপজ্জনক হতে পারে তা তুলে ধরা হয়েছে। ১১.১৯ চিত্রে ভূসংযোগ তার কীভাবে নিরপত্তামূলক সতর্কতা হিসেবে কাজ করে তা দেখানো হয়েছে।

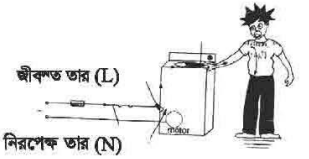

চিত্র ১১.১৮: ভূসংযোগহীন ওয়াশিং মেশিন

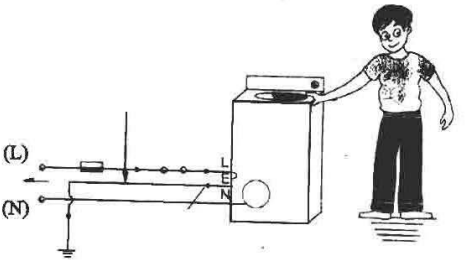

চিত্র ১১.১৯ ভূসংযোগসহ ওয়াশিং মেশিন

এ ছাড়াও আজকাল বিভিন্ন বহনযোগ্য যন্ত্রপাতিতে থ্রি পিন প্লাগ ব্যবহার করা হয়। এগুলোতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ফিউজ সংযুক্ত থাকে। ফিউজটি তড়িৎ যন্ত্রটিকে নিরাপদ রাখে।

অনুসন্ধান- ১১.১

বাসা বাড়ি উপযোগী তড়িৎ বর্তনী নকশা প্রণয়ন এবং ব্যবহার প্রদর্শন।

উদ্দেশ্য: শিক্ষার্থীরা বাসা বাড়িতে ব্যবহার উপযোগী তড়িৎ বর্তনীর নকশা প্রণয়ন করে এর বিভিন্ন অংশে এসি উৎসের ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারবে।

কাজের ধারা :

১. কাজের শুরুতেই বৈদ্যুতিক ক্যাবলের জীবন্ত (L)এবং নিরপেক্ষ (N) তার অক্কন কর।

২. এবার এ দুইটি তারকে প্রধান ফিউজ বক্স, বৈদ্যুতিক মিটার এবং ডিস্ট্রিবিউশন বক্সের সঙ্গে পরপর সংযোগ দাও।

৩. ডিস্ট্রিবিউশন বক্সে মেইন সুইচ অক্কন কর।

৪. ডিস্ট্রিবিউশন বক্সে দুইটি ফিউজ অক্কন কর। ফিউজগুলোকে অবশ্যই L তারে সংযোগ দিতে হবে।

৫. এবার একটি ফিউজের সঙ্গে দুইটি বাতি, একটি ফ্যান সমান্তরালভাবে সংযোগ দিয়ে বর্তনী সম্পূর্ণ কর। প্রত্যেক বাতি ও ফ্যানের জন্য Lতারে আলাদা সুইচ অক্কন কর।

৬. অন্য ফিউজটি ব্যবহার করে টেলিভিশন সেট, ইস্ত্রি ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদা পাওয়ার সকেটে সংযোগ দাও।

নিজে কর:

তড়িৎ শক্তির অপচয় রোধ ও সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার অক্কন।

১. দোকান থেকে পোস্টার তৈরির জন্য পোস্টার পেপার সংগ্রহ কর।

২. বিভিন্ন রঙের কলম ব্যবহার করে তড়িৎ শক্তির অপচয় রোধ ও সংরক্ষণে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ তা পোস্টারে লিখ।

৩. শিক্ষক সেরা পোস্টারটি নির্বাচন করবেন এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

১। যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই তড়িৎ প্রবাহ চলতে পারে তাদেরকে কী বলে?

(ক) অপরিবাহী (খ) কুপরিবাহী

(ঘ) অর্ধপরিবাহী (ঘ) পরিবাহী

২। $2\ \Omega$, $3\ \Omega$ ও $4\ \Omega$ মানের তিনটি রোধ শ্রেণি সমবায়ের সংযুক্ত থাকলে তুল্য রোধের মান হবে–

(ক) $8\ \Omega$ (খ) $7\ \Omega$

(গ) $9\ \Omega$ (ঘ) $20\ \Omega$

৩। কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য 100 V এবং তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা 10 A হলে এর রোধ কত?

(ক) $1000\ \Omega$ (খ) $0.1\ \Omega$

(গ) $10\ \Omega$ (ঘ) কোনটিই নয়

৪। বর্তনীতে বৈদ্যুতিক অবস্থা পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় –

i. ভোল্টমিটার

ii. অ্যামিটার

iii. জেনারেটর

কোনটি সঠিক

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। একটি বৈদ্যুতিক হিটারে ব্যবহৃত নাইক্রোম তারের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে 30 m এবং $2\times10^{-7}\ m^2$। নাইক্রোমের আপেক্ষিক রোধ $100\times10^{-8}\ \Omega\ m$। নাইক্রোম তারটিকে একই দৈর্ঘ্যের এবং প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট তামার তার দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হলো। তামার তারের আপেক্ষিক রোধ $1.7\times10^{-8}\ \Omega\ m$।

(ক) রোধ কাকে বলে?

(খ) বৈদ্যুতিক হিটারে নাইক্রোম তার ব্যবহার করা হয় কেন?

(গ) ব্যবহৃত তামার তারের রোধ নির্ণয় কর।

(ঘ) তামার তার ব্যবহারের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

২। পড়ার সময় আলভি 220V–100 W এর একটি বাতি দৈনিক 3 ঘণ্টা করে অন্যদিকে তার ভাই আলিফ 220V – 40 W একটি টেবিল ল্যাম্প দৈনিক 4 ঘণ্টা করে ব্যবহার করে। প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তির মূল্য 3.5 টাকা।

ক. ও'মের সূত্রটি লিখ।

খ. নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, উপাদান ও প্রস্থচ্ছেদের পরিবাহকের দৈর্ঘ্য ৫ গুণ বড় করলে রোধের কী পরিবর্তন হবে ব্যাখ্যা কর।

গ. আলিফের বাতির প্রবাহমাত্রা নির্ণয় কর।

ঘ. আর্থিক দিক বিবেচনায় আলভি ও আলিফের মধ্যে কে মিতব্যয়ী? গাণিতিক যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

গ. সাধারণ প্রশ্ন

১। তড়িৎ প্রবাহ কাকে বলে?

২। তড়িৎ প্রবাহের প্রচলিত দিক এবং ইলেকট্রন প্রবাহের দিক কোনটি?

৩। পরিবাহী, অপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহী পদার্থ কাকে বলে?

৪। ও'মের সূত্রটি বিবৃত কর।

৫। দেখাও যে, $V = IR$।

৬। একটি ছক কাগজে I বনাম V লেখচিত্র অঙ্কন কর।

৭। আপেক্ষিক রোধের সংজ্ঞা দাও।

৮। দেখাও যে, শ্রেণি সমবায়ে সংযুক্ত রোধগুলোর তুল্যরোধের মান সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রোধের মানের যোগ ফলের সমান।

৯। কী কী কারণে তড়িৎশক্তি ব্যবহার বিপজ্জনক হতে পারে?

১০। একটি বাসের হেড লাইটের ফিলামেন্টের $2.5\ A$ তড়িৎ প্রবাহিত হয়। ফিলামেন্টের প্রান্তদ্বয়ের বিভব পার্থক্য $12\ V$ হলে এর রোধ কত?

১১। একটি শুষ্ক কোষের তড়িচ্চালক শক্তি 1.5 V। 0.5 C আধানকে সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে আনতে কোষের ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় কর।

১২। স্থির এবং পরিবর্তী রোধ কাকে বলে?

১৩। তড়িচ্চালক শক্তি এবং বিভব পার্থক্য বলতে কী বোঝ?

দ্বাদশ অধ্যায়

তড়িতের চৌম্বক ক্রিয়া

MAGNETIC EFFECT OF CURRENT

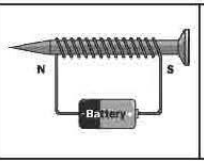

[তড়িতের চৌম্বক প্রভাব যেমন আছে তেমনি চুম্বকের তড়িৎ প্রভাব আছে। এই দুই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে অনেক তড়িৎ যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়েছে। এই সব যন্ত্রপাতি আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান করেছে, জীবনে অনেক আরাম আয়েস এনে দিয়েছে, আমাদের জীবনমান উন্নত করেছে। এই অধ্যায়ে আমরা তাড়িতচুম্বক, তাড়িতচৌম্বক আবেশ, আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ ও আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি, তড়িৎ মোটর, জেনারেটর, ট্রান্সফর্মার ইত্যাদির কার্যপ্রণালি ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব।]

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১। তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।

২। তাড়িতচৌম্বক আবেশ ব্যাখ্যা করতে পারব।

৩। আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ ও আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি ব্যাখ্যা করতে পারব।

৪। মটর ও জেনারেটরের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।

৫। ট্রান্সফর্মারের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।

৬। স্টেপ আপ ও স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মারের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করতে পারব।

৭। আমাদের জীবনে তড়িতের নানারূপের ব্যবহার ও এর অবদানকে প্রশংসা করতে পারব।

১২.১ তড়িতের চৌম্বক ক্রিয়া
Magnetic effect of current

ওয়েরস্টেড তড়িতের চৌম্বক ক্রিয়া বা প্রভাব আবিষ্কার করেন।

নিজে কর : পাশের চিত্রের মতো করে একটি বর্তনী তৈরি কর। তারের নিচে একটি কম্পাসকে এমনভাবে রাখ যেন এর কাঁটা উত্তর–দক্ষিণে মুখ করে থাকে। এবার সুইচ অন কর। কম্পাস কাঁটাটির কী ঘটছে?

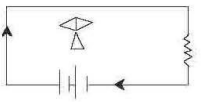

চিত্র ১২.১

সুইচ অন করে বর্তনীতে প্রবাহ চালনা করার সাথে সাথে কম্পাস কাঁটাটি একদিকে সরে যাচ্ছে। তড়িৎপ্রবাহের দিক পরিবর্তন করলে কম্পাস কাঁটাটি উল্টা দিকে সরে যায়। এর থেকে বোঝা যায় তড়িৎপ্রবাহ চুম্বকশলাকার উপর একটি প্রভাব সৃষ্টি করে। অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহের একটি চৌম্বকক্রিয়া আছে।

পরীক্ষণ : একটি শক্ত কাগজে একটি পরিবাহী তার ঢুকিয়ে এই তারসহ একটি তড়িৎ বর্তনী তৈরি কর। কাগজটি অনুভূমিক করে রেখে তারটির চারপাশে কিছু লোহার গুঁড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও। এবার বর্তনী তথা পরিবাহী দিয়ে তড়িৎ চালনা কর এবং শক্ত কাগজে আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে টোকা দিতে থাক।

দেখা যাবে লোহার গুঁড়াগুলো চিত্র ১২.২ এর মতো নিজেদেরকে সাজিয়ে নেবে। যে রেখায় লোহার গুড়াগুলো নিজেদের সজ্জিত করে তাকে আমরা চুম্বক বলরেখা বলি। সুতরাং তড়িৎ প্রবাহ এর চারদিকে চৌম্বক প্রভাব ক্ষেত্র তথা চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে।

চিত্র ১২.২

১২.২ সলিনয়েড
Solenoid

উপরে বর্ণিত তারটিকে পেঁচিয়ে কয়েল বা কুণ্ডলী তৈরি করে আমরা চৌম্বক ক্ষেত্রকে ঘনীভূত করতে পারি (চিত্র ১২.৩ দেখ)। পেঁচানো বা কুণ্ডলী পাঁকানো তার দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করা হলে অধিকাংশ চুম্বক বলরেখা কুণ্ডলীর কেন্দ্রে ঘনীভূত হবে। চৌম্বকক্ষেত্রটি দেখতে অনেকটা দন্ড চুম্বকের ক্ষেত্রের মতো হবে। এরকম কুণ্ডলীকে বলা হয় সলিনয়েড। এর ভিতর যদি আমরা কোনো লোহার দন্ড বা লোহার পেরেক ঢুকাই তাহলে লোহার দন্ড বা পেরেকটি চুম্বকে পরিণত হবে। তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিলে লোহার দন্ডটি বা পেরেকটি আর চুম্বক থাকবে না। প্রবাহের দিক বিপরীত করা হলে, চুম্বকের মেরু বিপরীত হয়ে যাবে। এভাবে লোহার দন্ডটি বা পেরেকটি যে চুম্বকে পরিণত হলো তাকে বলা হয় তাড়িতচুম্বক।

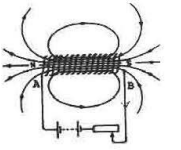

চিত্র ১২.৩

১২.৩ তাড়িতচুম্বক
Electromagnet

সলিনয়েডের ভিতর কোনো লোহার দন্ড বা পেরেককে ঢুকালে সলিনয়েডের নিজের যে চৌম্বকক্ষেত্র রয়েছে তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে ফলে

চিত্র ১২.৩ (ক)

সলিনয়েড থেকে বেশি চৌম্বকক্ষেত্র পাওয়া যায়। তড়িৎ প্রবাহ চলাকালীন এটি বেশ শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়। একে বলা হয় তাড়িতচুম্বক।এই চুম্বকের সবলতা নিম্নোক্তভাবে আরও বাড়ানো যায়–

- তড়িৎ প্রবাহ বাড়িয়ে
- সলিনয়েডের পাকের সংখ্যা বাড়িয়ে
- ইংরেজি U অক্ষরের মতো বাঁকিয়ে চুম্বক মেরু দুইটিকে আরও কাছাকাছি এনে।

বিভিন্ন তড়িৎ প্রবাহের ফলে বা সলিনয়েডের পাকের সংখ্যা বাড়ালে সলিনয়েড দ্বারা চুম্বকায়িত দণ্ড বা পেরেকটি কী পরিমাণ আলপিন বা পেপার ক্লিপ আকর্ষণ করতে পারে তা তোমাদের শিক্ষককের সাহায্য নিয়ে পরীক্ষা করে দেখ। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা তৈরি, লোহা বা ইস্পাতের ভারী জিনিস উঠানামা করা বা আবর্জনা সরানোর ক্রেন তৈরিতে তাড়িতচুম্বক ব্যবহার করা হয়। চোখের ভিতর লোহা বা ইস্পাতের গুঁড়া ঢুকলে তা বের করার কাজে এই চুম্বক ব্যবহার কর হয় এছাড়া টেলিফোনের ইয়ারপিস ও দরজার তাড়িতচৌম্বক তালায় তাড়িতচুম্বক ব্যবহার করা হয়।

১২.৪ তাড়িতচৌম্বক আবেশ
Electromagnetic induction

বিজ্ঞানী ওয়েরস্টেডের তড়িতের চৌম্বক ক্রিয়া আবিষ্কারের পর অনেক বিজ্ঞানী চেষ্টা করতে থাকেন চৌম্বকক্ষেত্র থেকে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করা যায় কিনা। এই নিয়ে যারা কাজ করছিলেন তাদের মধ্যে ইংল্যান্ডে মাইকেল ফ্যারাডে, আমেরিকায় জোসেফ হেনরি এবং রাশিয়াতে এইচ.এফ.ই.লেঞ্জ তিনজনই পৃথক পৃথকভাবে সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু ১৮৩১ সালে মাইকেল ফ্যারাডে তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি দেখান যে, একটি পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্র তড়িচ্চালকশক্তি সৃষ্টি করতে পারে যা একটি আবদ্ধ বর্তনী দিয়ে একটি আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ চালাতে পারে। পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্রের দ্বারা কোনো বর্তনীতে তড়িচ্চালকশক্তি বা তড়িত প্রবাহ সৃষ্টির এই ঘটনাকে তাড়িতচৌম্বক আবেশ বলে। তাড়িতচৌম্বক আবেশ আবিষ্কারের জন্য ফ্যারাডে দুইটি পরীক্ষা করেছিলেন। পরীক্ষাগুলো তোমরাও করতে পার।

পরীক্ষা–১ : কার্ড বোর্ডের একটি চোঙের গায়ে অন্তরীত তার পেঁচিয়ে একটি কুণ্ডলী তৈরি কর। এই কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহের উপস্থিতি বোঝার জন্য এর দুই প্রান্তের সাথে একটি গ্যালভানোমিটার যুক্ত কর। সংযোগ দেওয়ার সময় তারের প্রান্তের অপরিবাহী আবরণ খুলে ফেলতে হবে।এখন একটি দণ্ড চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে দ্রুত চোঙের ভিতর ঢুকাও। কী ঘটছে? কুণ্ডলী দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চলছে। গ্যালভানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ ঘটছে। এবার চুম্বকটি বের করে নাও। কী ঘটছে? চুম্বক প্রবেশ করানোর সময় গ্যালভানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ যে দিকে হয়েছিল চুম্বককে বের করানোর সময় বিক্ষেপ হয়েছে তার বিপরীত দিকে। চুম্বকটিকে স্থির রেখে এবার যদি গ্যালভানোমিটারসহ কুণ্ডলীটিকে চুম্বকের দিকে দ্রুত নেওয়া হয় তাহলেও গ্যালভানোমিটারে ক্ষণিক বিক্ষেপ দেখা যাবে। কুণ্ডলীটিকে চুম্বক থেকে দূরে সরিয়ে নিলে বিক্ষেপ বিপরীত দিকে দেখা যাবে।

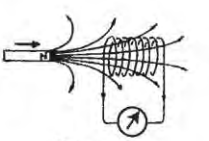

চিত্র : ১২.৪

পরীক্ষা–২ : এই পরীক্ষার জন্য অন্তরীত তামার তারের দুইটি বন্ধ কুণ্ডলী নিতে হবে। একটি কুণ্ডলীতে তড়িচ্চালক শক্তির উৎসরূপে একটি ব্যাটারি, একটি পরিবর্তনশীল রোধ ও একটি টেপা চাবি সংযুক্ত করতে হবে (চিত্র ১২.৫ ক)। এ কুণ্ডলীকে মুখ্য কুণ্ডলী বলা হয়। মুখ্য কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ চালালে অপর কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ আবিষ্ট হয়। এ কুণ্ডলীতে গ্যালভানোমিটার সংযুক্ত করলে ক্ষণিক বিক্ষেপ দেখা যায়। একে গৌণ কুণ্ডলী বলা হয়। (চিত্র : ১২.৫ খ)। আবার তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করার সময়ও গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ দেখা যাবে। তবে এবার বিক্ষেপ বিপরীত দিকে হয়।

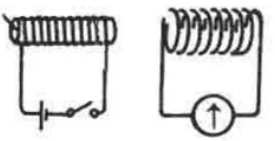

চিত্র : ১২.৫ ক

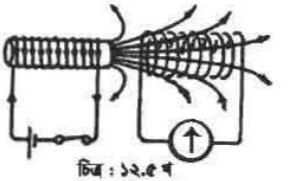

চিত্র : ১২.৫ খ

১২.৫ আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহ ও আবিষ্ট ভোল্টেজ বা বিভব পার্থক্য
Induced current and induced voltage

পরীক্ষা দুইটি থেকে গ্যালভানোমিটারের বিক্ষেপ বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। সুতরাং কোনো তার কুণ্ডলীর কাছে আমরা যদি কোনো চুম্বককে নাড়াচাড়া করি বা আনা নেওয়া করি বা কোনো চুম্বকের নিকট কোনো তার কুণ্ডলীকে আনা নেওয়া করি তাহলে তার কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। একে তাড়িতচৌম্বক আবেশ বলে। কোনো তড়িৎবাহী তার বা বর্তনীর নিকট কোনো তার কুণ্ডলী আনা নেওয়া করলেও তার কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। একেও তাড়িতচৌম্বক আবেশ বলে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, একটি গতিশীল চুম্বক বা তড়িৎবাহী বর্তনীর দূরত্ব বা তড়িৎপ্রবাহের পরিবর্তনের সাহায্যে অন্য একটি সংবদ্ধ বর্তনীতে ক্ষণস্থায়ী ভোল্টেজ ও তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হওয়ার পদ্ধতিকে তাড়িতচৌম্বক আবেশ বলে। এই ভোল্টেজকে আবিষ্ট ভোল্টেজ এবং প্রবাহকে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ বলে।

চুম্বক ও কুণ্ডলীর মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতি না থাকলে গ্যালভানোমিটারে কোনো বিক্ষেপ দেখা যায় না। আপেক্ষিক গতি যত বেশি হয় বিক্ষেপের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বলা যায়, চুম্বক ও কুণ্ডলীর মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতি যতক্ষণ থাকে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহও ততক্ষণ স্থায়ী হয়। চুম্বকের মেরু পরিবর্তন করলে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের দিকও পরিবর্তিত হয়। আবিষ্ট ভোল্টেজ বা তড়িৎপ্রবাহ নিম্নোক্তভাবে বৃদ্ধি করা যায়–

- শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করে
- চুম্বককে বা তারকুণ্ডলীকে দ্রুত আসা নেওয়া করে
- তারকুণ্ডলীর পাক সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

১২.৬ তড়িৎ প্রবাহী তারের উপর চুম্বকের প্রভাব
Effect of magnet on a current carrying wire

আমরা জানি যে, তড়িৎবাহী তার নিজস্ব একটি চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। শক্তিশালী চুম্বকের বিপরীত মেরুদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র এবং তড়িৎবাহী তারের চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে।

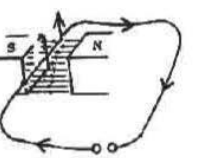

চিত্র : ১২.৬: লিঙ্ক ভোল্টেজ তড়িৎ উৎস

তোমাদের শিক্ষক এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তোমাদের দেখাতে পারেন। তোমরা নিজেরা বা শিক্ষকের সহায়তায় এটা করে দেখতে পার। চিত্রের মত করে একটি শক্তিশালী চুম্বকের দুই প্রান্তের মধ্যে একটি তড়িৎবাহী তারকে রাখ। এই তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত কর। দেখবে এটি উপরের দিকে লাফিয়ে উঠবে। এর ফলে বোঝা যায় যে, একটি বল এর উপর কাজ করছে। এই বল কোথা থেকে এল?

তুমি যদি চিত্র : ১২.৭ (ক) এর দিকে তাকাও তাহলে চুম্বকের মেরুদ্বয়ের মধ্যবর্তী বলরেখাগুলো দেখতে পাবে। তড়িৎপ্রবাহের দরুণ সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রটিও দেখানো হয়েছে। দুইটি ক্ষেত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট বলরেখাগুলোও ১২.৭ (খ)-তে দেখানো হয়েছে। তারের নিচে তারের উপরের চেয়ে বলরেখা বেশি। এর কারণ হলো উভয় ক্ষেত্র একই অভিমুখে ক্রিয়া করছে। [চিত্র ১২.৭ (ক) আবার দেখ]। তারের উপরে ক্ষেত্রদ্বয় পরস্পরের বিরোধিতা করছে, ফলে কয়েকটি বলরেখা একে অপরকে বাতিল করে দিচ্ছে ফলে সেখানে রেখার সংখ্যা কম। যেহেতু রেখাগুলো পরস্পরকে টান টান রাখতে চায় তাই (স্থিতিস্থাপক রবার ব্যান্ডের মত) তারা তারের উপর ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে । ফলে তারটি মুক্ত অবস্থায়

চিত্র ১২.৭ (ক)

চিত্র ১২.৭ (খ)

থাকলে উপরের দিকে লাফিয়ে উঠে। তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ বিপরীত করা হলে সে ক্ষেত্রে তারটি নিচের দিকে যাবে।

১২.৭ তড়িৎ মোটর

Electric motor

ধরা যাক, চুম্বকের মেরুদ্বয়ের মধ্যে একটি টান টান তার ব্যবহার না করে চিত্র ১২.৮ (ক) এর মতো তারের একটি লুপ বা কুণ্ডলী ব্যবহার করা হলো। যেহেতু লুপটি A থেকে বেঁকে B তে বিপরীত অভিমুখী হয়ে ফিরে এসেছে তাই লুপের দুই অর্ধেকের মধ্যে পরস্পরের বিপরীতমুখী তড়িৎ প্রবাহিত হবে। সুতরাং A তে তারটি উপরের দিকে উঠবে এবং B তে তারটি নিচের দিকে নামবে। এর ফলে তারটি তড়িৎ কাটায় গতির দিকে ঘুরবে। চিত্র : ১২.৮ (খ) এর মতো তারটি যখন খাঁড়া অবস্থায় থাকবে তখন এর উপর কোনো বল ক্রিয়া করবে না। ফলে এটি থেমে যাবে। লুপটিকে ঘূর্ণায়মান রাখার জন্য আমরা কম্যুটেটর নামক একটি উপকরণ ব্যবহার করব। এটি সমান দুই অংশে বিভক্ত একটি তামার বলয় বা আংটি (চিত্র ১২.৯ দেখ)। এর প্রত্যেক অর্ধাংশ কুণ্ডলীর একটি প্রান্তের সাথে সংযুক্ত থাকে (যথাক্রমে A ও B তে)। বিভক্ত বলয়ের বাইরের প্রান্তটি একটি সুদৃঢ় কার্বন ব্রাশের দ্বারা তড়িৎ উৎসের সাথে সংস্পর্শ স্থাপন করে। বিভক্ত বলয়টি কুণ্ডলীর সাথে যুক্ত এবং যখন এর দুই অর্ধেকের মধ্যকার ফাঁক কার্বন ব্রাশের বিপরীতে থাকে তখন কোনো তড়িৎ প্রবাহিত হবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘূর্ণন গতির জড়তার কারণে ঘূর্ণন অব্যাহত থাকবে এবং পুনরায় ব্রাশের সংস্পর্শে এলে ঘূর্ণনের জন্য নতুনভাবে বল লাভ করবে। এভাবে ঘূর্ণন অবিরত চলতে থাকবে।

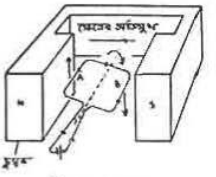

চিত্র ১২.৮ (ক)

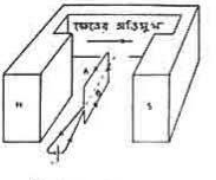

চিত্র ১২.৮ (খ)

১। **এসি জেনারেটর :** এসি জেনারেটর অধিক প্রচলিত বিধায় এর গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

গঠন : এতে একটি চুম্বক থাকে। চুম্বকের মধ্যবর্তী স্থানে একটি কাচা লোহার পাতের উপর একটি তারের আয়তকার কুণ্ডলী (চিত্রে *AB*) থাকে। কাচা লোহার পাতটিকে আর্মেচার বলে। আর্মেচারটিকে চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে যান্ত্রিক উপায়ে সমদ্রুতিতে ঘুরানো হয়। আয়তকার কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত দুইটি স্লিপ রিং এর সাথে সংযুক্ত থাকে। স্লিপ রিং দুইটি আর্মেচারের একই অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে। দুইটি কার্বন নির্মিত ব্রাশ এমনভাবে স্থাপন করা হয় যেন তারা যখন আর্মেচার ঘুরতে থাকে তখন স্লিপ রিং দুইটিকে স্পর্শ করে থাকে। ব্রাশ দুইটির সাথে বহির্বর্তনীর রোধ *R* সংযুক্ত থাকে।

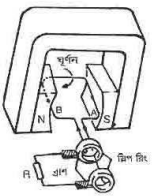

চিত্র : ১২.১১

কার্যপ্রণালি : যখন আর্মেচারটিকে ঘুরানো হয় তখন আর্মেচার কুণ্ডলী চৌম্বকক্ষেত্রের বলরেখাগুলোকে ছেদ করে এবং তাড়িতচৌম্বক আবেশের নিয়মানুযায়ী কুণ্ডলীতে তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হয়। কুণ্ডলীর একবার ঘূর্ণনের মধ্যে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখও একবার পরিবর্তিত হয়। এখন কুণ্ডলীটির দুই প্রান্ত বর্হিবর্তনীর সাথে সংযুক্ত থাকায় বর্তনীতে পর্যায়বৃত্ত তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। আবিস্ট তড়িৎপ্রবাহের মান প্রধানত চৌম্বকক্ষেত্রের সবলতা ও ঘূর্ণনের বেগের উপর নির্ভর করে। এভাবে যান্ত্রিক শক্তি থেকে পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

১২.৯ ট্রান্সফর্মার
Transformer

যে যন্ত্রের সাহায্যে পর্যায়বৃত্ত উচ্চ বিভবকে নিম্ন বিভবে বা পর্যায়বৃত্ত নিম্ন বিভবকে উচ্চ বিভবে রূপান্তরিত করা যায় তাকে ট্রান্সফর্মার বলে। তাড়িতচৌম্বক আবেশের উপর ভিত্তি করে এই যন্ত্র তৈরি করা হয়। এই যন্ত্রে একটি কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ পরিবর্তন করে অন্য কুণ্ডলীতে আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি বা তড়িৎ উৎপাদন করা হয়। ট্রান্সফর্মার সাধারণত দুই প্রকারের হয়। যথা–

১. আরোহী বা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার (Step up transformer) : যে ট্রান্সফর্মার অল্প বিভবের অধিক তড়িৎ প্রবাহকে অধিক বিভবের অল্প তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করে তাকে আরোহী বা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার বলে।

২. অবরোহী বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার (Step down transformer) : যে ট্রান্সফর্মার অধিক বিভবের অল্প তড়িৎপ্রবাহকে অল্প বিভবের অধিক তড়িৎ প্রবাহে রূপান্তরিত করে তাকে অবরোহী বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার বলে।

ট্রান্সফর্মারের গঠন ও কার্যপ্রণালি : একটি কাচা লোহার আয়তাকার মজ্জা বা কোর নেওয়া হয়। এর পরস্পর বিপরীত দুই বাহুতে অন্তরীত তার পেঁচিয়ে ট্রান্সফর্মার তৈরি করা হয় [চিত্র ১২.১২]। আয়তাকার মজ্জার এক বাহুর কুণ্ডলীতে পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ বা বিভব প্রয়োগ করা হয়, একে মুখ্য কুণ্ডলী বলে। অপর যে বিপরীত বাহুর কুণ্ডলীতে পর্যায়বৃত্ত বিভব আবিষ্ট হয় তাকে গৌণ কুণ্ডলী বলে। আরোহী বা স্টেপআপ ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর চেয়ে গৌণ কুণ্ডলীতে তারের পাক সংখ্যা বেশি থাকে। অবরোহী বা স্টেপডাউন ট্রান্সফর্মারে মুখ্য কুণ্ডলীর চেয়ে গৌণ কুণ্ডলীর তারের পাক সংখ্যা কম থাকে।

১। **এসি জেনারেটর :** এসি জেনারেটর অধিক প্রচলিত বিধায় এর গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

গঠন : এতে একটি চুম্বক থাকে। চুম্বকের মধ্যবর্তী স্থানে একটি কাচা লোহার পাতের উপর একটি তারের আয়তকার কুণ্ডলী (চিত্রে *AB*) থাকে। কাচা লোহার পাতটিকে আর্মেচার বলে। আর্মেচারটিকে চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে যান্ত্রিক উপায়ে সমদ্রুতিতে ঘুরানো হয়। আয়তকার কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত দুইটি স্লিপ রিং এর সাথে সংযুক্ত থাকে। স্লিপ রিং দুইটি আর্মেচারের একই অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে। দুইটি কার্বন নির্মিত ব্রাশ এমনভাবে স্থাপন করা হয় যেন তারা যখন আর্মেচার ঘুরতে থাকে তখন স্লিপ রিং দুইটিকে স্পর্শ করে থাকে। ব্রাশ দুইটির সাথে বহির্বর্তনীর রোধ *R* সংযুক্ত থাকে।

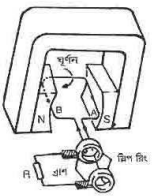

চিত্র : ১২.১১

কার্যপ্রণালি : যখন আর্মেচারটিকে ঘুরানো হয় তখন আর্মেচার কুণ্ডলী চৌম্বকক্ষেত্রের বলরেখাগুলোকে ছেদ করে এবং তাড়িতচৌম্বক আবেশের নিয়মানুযায়ী কুণ্ডলীতে তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হয়। কুণ্ডলীর একবার ঘূর্ণনের মধ্যে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখও একবার পরিবর্তিত হয়। এখন কুণ্ডলীটির দুই প্রান্ত বর্হিবর্তনীর সাথে সংযুক্ত থাকায় বর্তনীতে পর্যায়বৃত্ত তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। আবিস্ট তড়িৎপ্রবাহের মান প্রধানত চৌম্বকক্ষেত্রের সবলতা ও ঘূর্ণনের বেগের উপর নির্ভর করে। এভাবে যান্ত্রিক শক্তি থেকে পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

১২.৯ ট্রান্সফর্মার
Transformer

যে যন্ত্রের সাহায্যে পর্যায়বৃত্ত উচ্চ বিভবকে নিম্ন বিভবে বা পর্যায়বৃত্ত নিম্ন বিভবকে উচ্চ বিভবে রূপান্তরিত করা যায় তাকে ট্রান্সফর্মার বলে। তাড়িতচৌম্বক আবেশের উপর ভিত্তি করে এই যন্ত্র তৈরি করা হয়। এই যন্ত্রে একটি কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ পরিবর্তন করে অন্য কুণ্ডলীতে আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি বা তড়িৎ উৎপাদন করা হয়। ট্রান্সফর্মার সাধারণত দুই প্রকারের হয়। যথা–

১. আরোহী বা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার (Step up transformer) : যে ট্রান্সফর্মার অল্প বিভবের অধিক তড়িৎ প্রবাহকে অধিক বিভবের অল্প তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করে তাকে আরোহী বা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার বলে।

২. অবরোহী বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার (Step down transformer) : যে ট্রান্সফর্মার অধিক বিভবের অল্প তড়িৎপ্রবাহকে অল্প বিভবের অধিক তড়িৎ প্রবাহে রূপান্তরিত করে তাকে অবরোহী বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার বলে।

ট্রান্সফর্মারের গঠন ও কার্যপ্রণালি : একটি কাচা লোহার আয়তাকার মজ্জা বা কোর নেওয়া হয়। এর পরস্পর বিপরীত দুই বাহুতে অন্তরীত তার পেঁচিয়ে ট্রান্সফর্মার তৈরি করা হয় [চিত্র ১২.১২]। আয়তাকার মজ্জার এক বাহুর কুণ্ডলীতে পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ বা বিভব প্রয়োগ করা হয়, একে মুখ্য কুণ্ডলী বলে। অপর যে বিপরীত বাহুর কুণ্ডলীতে পর্যায়বৃত্ত বিভব আবিষ্ট হয় তাকে গৌণ কুণ্ডলী বলে। আরোহী বা স্টেপআপ ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর চেয়ে গৌণ কুণ্ডলীতে তারের পাক সংখ্যা বেশি থাকে। অবরোহী বা স্টেপডাউন ট্রান্সফর্মারে মুখ্য কুণ্ডলীর চেয়ে গৌণ কুণ্ডলীর তারের পাক সংখ্যা কম থাকে।

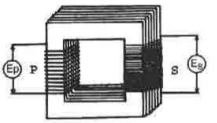

চিত্র : ১২.১২ (ক) উচ্চধাপী ট্রান্সফর্মার

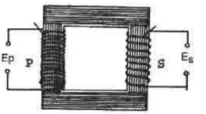

চিত্র : ১২.১২ (খ) নিম্নধাপী ট্রান্সফর্মার

মনে কর কোনো ট্রান্সফর্মারে n_p পাকবিশিষ্ট মুখ্য কুণ্ডলীতে E_p পর্যায়বৃত্ত বিভব প্রয়োগ করার ফলে এই কুণ্ডলীতে I_p প্রবাহ পাওয়া গেল। এই প্রবাহ মজ্জাটিকে চুম্বকিত করে চৌম্বক বলরেখা উৎপন্ন করে যা মুখ্য কুণ্ডলীতে একটি আবিষ্ট ভোল্টেজ বা তড়িচ্চালক শক্তি উৎপন্ন করে। চৌম্বক বলরেখার যদি কোনো ক্ষরণ না হয় তাহলে গৌণ কুণ্ডলীর প্রতি পাকেও একই সংখ্যক বলরেখা সংযুক্ত হবে। ফলে গৌণ কুণ্ডলীতেও ভোল্টেজ বা তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হবে। গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা n_s এবং গৌণ কুণ্ডলীতে আবিষ্ট ভোল্টেজ বা তড়িচ্চালক শক্তি E_s হলে মুখ্য ও গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ ও তারের পাকসংখ্যার সম্পর্ক হবে,

$$\frac{E_P}{E_S} = \frac{n_P}{n_S} \qquad (12.1)$$

যখন $n_s > n_p$ তখন ট্রান্সফর্মারটি আরোহী বা স্টেপআপ ট্রান্সফর্মার এবং যখন $n_s < n_p$ তখন ট্রান্সফর্মারটি অবরোহী বা স্টেপডাউন ট্রান্সফর্মার। কোনো ক্ষমতার অপচয় না ঘটলে মুখ্য কুণ্ডলীর প্রযুক্ত সকল ক্ষমতা গৌণ কুণ্ডলীতে সরবরাহ হবে। সুতরাং, মুখ্য কুণ্ডলীর ভোল্টেজ × মুখ্য কুণ্ডলীর তড়িৎপ্রবাহ = গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ × গৌণ কুণ্ডলীর তড়িৎপ্রবাহ অর্থাৎ $E_P I_P = E_S I_S$

$$\text{বা, } \frac{E_P}{E_S} = \frac{I_S}{I_P} \qquad (12.2)$$

এর অর্থ এই যে, কোনো ট্রান্সফর্মার যে হারে ভোল্টেজ কমায় ঠিক সে হারে তড়িৎ প্রবাহ বৃদ্ধি করে যাতে ক্ষমতার পরিমাণ সমান বা ধ্রুব থাকে। সুতরাং ট্রান্সফর্মার ভোল্টেজ ও তড়িৎ প্রবাহ উভয়কেই রূপান্তর করে।

দূরদূরান্তে তড়িৎ প্রেরণের জন্য আরোহী বা স্টেপআপ ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়। নিম্ন ভোল্টেজ ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতি যেমন রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, ভিসিআর, ভিসিপি, ইলেকট্রিক ঘড়ি ইত্যাদিতে অবরোহী বা স্টেপডাউন ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়।

গাণিতিক উদাহরণ : ১২.১। একটি ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীতে ভোল্টেজ 10V এবং প্রবাহ 6A। গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ 20Vহলে, গৌণ কুণ্ডলীর প্রবাহ নির্ণয় কর।

আমরা জানি :

$$\frac{E_P}{E_S} = \frac{I_S}{I_P}$$

$$\text{বা, } I_S = \frac{E_P}{E_S} \times I_P = \frac{10V \times 6A}{20V} = 3A$$

উত্তর : $3A$

এখানে,

মুখ্য কুণ্ডলীর ভোল্টেজ, $E_p = 10V$

গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ, $E_S = 20V$

মুখ্য কুণ্ডলীর প্রবাহ, $I_P = 6A$

গৌণ কুণ্ডলীর প্রবাহ, $I_s = ?$

গাণিতিক উদাহরণ : ১২.২। একটি ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা 50, ভোল্টেজ 210V। এর গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা 100 হলে ভোল্টেজ কত ?

আমরা জানি :

$$\frac{E_p}{E_s} = \frac{n_p}{n_s}$$

বা, $E_s = \frac{n_s}{n_p} \times E_p$

$= \frac{100}{50} \times 210V = 420V$

উত্তর : 420V

এখানে,

মুখ্য কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা $n_P = 50$

মুখ্য কুণ্ডলীর ভোল্টেজ, $E_P = 210V$

গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা, $n_S = 100$

গৌণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ, $E_S = ?$

গাণিতিক উদাহরণ : ১২.৩। একটি ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা 18 এবং গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা 90, মুখ্য কুণ্ডলীর তড়িৎ প্রবাহ 7A হলে গৌণ কুণ্ডলীর প্রবাহ কত ?

আমরা জানি :

$$\frac{I_S}{I_P} = \frac{n_P}{n_S}$$

বা, $I_S = \frac{n_P}{n_S} \times I_P$

$\therefore I_S = \frac{18}{90} \times 7A = \frac{7}{5}A = 1.4A$

উত্তর : 1.4A

এখানে,

মুখ্য কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা $n_p = 18$

মুখ্য কুণ্ডলীর তড়িৎপ্রবাহ $I_p = 7A$

গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা, $n_s = 90$

গৌণ কুণ্ডলীর তড়িৎপ্রবাহ $I_s = ?$

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

১। কোনো চোঙের উপর অন্তরীত তার পেঁচিয়ে সলিনয়েড তৈরি করে তাতে তড়িৎপ্রবাহ চালালে চৌম্বকক্ষেত্রের কী ঘটবে?

(ক) ঘনীভূত ও দুর্বল হবে

(খ) ঘনীভূত ও শক্তিশালী হবে

(গ) কম ঘনীভূত ও দুর্বল হবে

(ঘ) কম ঘনীভূত কিন্তু শক্তিশালী হবে

২। কোনটির কার্যপ্রণালিতে তাড়িতচৌম্বক আবেশকে ব্যবহার করা হয় ?

(ক) ট্রানজিস্টর (খ) মোটর

(গ) অ্যাম্প্লিফায়ার (ঘ) ট্রান্সফর্মার

৩। কোন প্রক্রিয়া বা কার্যধারায় তড়িচ্চালকশক্তি উৎপন্ন হয় –

(i) কোনো তারকুণ্ডলীর ভিতর কোনো চুম্বক স্থির অবস্থায় রাখলে

(ii) কোনো চৌম্বকক্ষেত্রে কোনো তারকুণ্ডলী ঘুরালে

(iii) কোনো স্থির তারকুণ্ডলীর চারদিকে কোনো চুম্বক ঘুরালে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

কোনো তারকুণ্ডলীর ভিতর একটি দণ্ড চুম্বক আনানেওয়া করা হচ্ছে। এতে তারকুণ্ডলীতে ভোল্টেজ আবিষ্ট হচ্ছে। আবিষ্ট ভোল্টেজ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এবার নিচের ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের জবাব দাও।

৪। তাড়িতচৌম্বক আবেশের বেলায় আবিষ্ট ভোল্টেজ কোনটির উপর নির্ভর করে ?

(i) তারকুণ্ডলীর সাথে সংশ্লিষ্ট চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য

(ii) চৌম্বকক্ষেত্রে আনানেওয়া করা তারকুণ্ডলীর রোধ

(iii) চৌম্বকক্ষেত্রে আনানেওয়া করা তারকুণ্ডলীর দ্রুতি

নিচের কোনোটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) i ও ii (ঘ) i ও iii

৫। তারকুণ্ডলীর পাকের সংখ্যা বাড়ালে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহের কী ঘটবে?

(ক) তড়িৎপ্রবাহ কমে যাবে (খ) তড়িৎপ্রবাহ বেড়ে যাবে

(গ) তড়িৎপ্রবাহের মান শূন্য হবে (ঘ) তড়িৎপ্রবাহের মান সমান হবে

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। চিত্রটি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

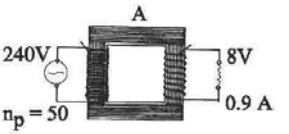

(ক) *A* চিহ্নিত বস্তুটির নাম কী?

(খ) যন্ত্রটি যে নীতি বা ঘটনার উপর তৈরি তা ব্যাখ্যা কর।

(গ) এই যন্ত্রের মুখ্য কুণ্ডলীতে প্রবাহ মাত্রা নির্ণয় কর।

(ঘ) উপাত্তের আলোকে যন্ত্রটির ক্রিয়া গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

গ. সাধারণ প্রশ্ন

১। তড়িৎপ্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া কী ?

২। তাড়িতচুম্বক কাকে বলে? এই চুম্বক কী কী কাজে লাগে?

৩। জেনারেটর কাকে বলে? জেনারেটর দিয়ে কী কাজ করা হয়?

৪। জেনারেটর ও তড়িৎ মোটরের মধ্যে পার্থক্য কী ?

৫। স্টেপআপ ও স্টেপডাউন ট্রান্সফর্মার দ্বারা কী কাজ করা হয় ?

৬। তাড়িতচুম্বকের প্রাবল্য কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় লিখ।

৭। কোনো ট্রান্সফর্মার 240V এসি উৎসের সাথে সংযুক্ত আছে। এর মুখ্য ও গৌণকুণ্ডলীর পাক সংখ্যা যথাক্রমে 1000 ও 50। এর গৌণকুণ্ডলীর ভোল্টেজ কত?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স

MODERN PHYSICS AND ELECTRONICS

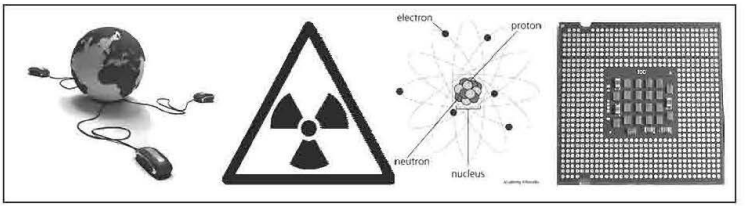

[বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পদার্থবিজ্ঞানের জগতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই সময় কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। অতি উচ্চ গতিসম্পন্ন কণার গতি এবং নিউক্লীয় ও পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যার জন্য তত্ত্ব দুইটি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ছাড়া ইলেকট্রনিক্স নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক উন্নততর অবস্থায় পৌঁছায় ফলে আমরা তথ্য ও যোগাযোগের নানানরকম উন্নত যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও ব্যবহারে সক্ষম হই। এভাবে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান বিকাশ লাভ করে। এই অধ্যায়ে আমরা তেজস্ক্রিয়তা, তেজস্ক্রিয়কণা ও রশ্মি, ইলেকট্রনিক্স এর ক্রমবিকাশ, অর্ধপরিবাহী ও সমন্বিত বর্তনী, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস, মাইক্রোফোন, স্পীকার, রেডিও, টেলিভিশন, ফোন,ফ্যাক্সমেশিন, ইন্টারনেট ও ইমেইল নিয়ে আলোচনা করব।]

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১. তেজস্ক্রিয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব

২. আলফা, বিটা ও গামারশ্মির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব

৩. ইলেকট্রনিক্স এর ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারব।

৪. এনালগ ও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের পার্থক্য করতে পারব।

৫. অর্ধপরিবাহী ও সমন্বিত বর্তনী ব্যাখ্যা করতে পারব।

৬. মাইক্রোফোন ও স্পীকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।

৭. নির্বাচিত যোগাযোগ প্রযুক্তি ডিভাইসের কার্যক্রমের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।

৮. ইন্টারনেট এবং ই মেইলের সাহায্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।

৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত ডিভাইস কীভাবে আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে তা অনুসন্ধান করতে পারব।

১০. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ডিভাইস সঠিক ও কার্যকর ব্যবহারে নিজে সচেতন হবো এবং অন্যদের সচেতন করব।

১৩.১ তেজস্ক্রিয়তা
Radioactivity

ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী বেকরেল (Henry Becquerel) ১৮৯৬ সালে দেখতে পান যে, ইউরেনিয়াম ধাতুর নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশেষ ভেদনশক্তিসম্পন্ন বিকিরণ অবিরত নির্গত হয়। বেকরেল আরো লক্ষ করেন, যে মৌল থেকে এই বিকিরণ নির্গত হয় তা একটি সম্পূর্ণ নতুন মৌলে রূপান্তরিত হয়। এটি একটি নিউক্লীয় ঘটনা। ঘটনাটি স্বতঃস্ফূর্ত ও অবিরাম ঘটনা এবং সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত। মানব সৃষ্ট কোনো বাহ্যিক প্রভাব যেমন চাপ, তাপ, বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র এই রশ্মির নির্গমণ রুদ্ধ করতে বা হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। পরবর্তীকালে মাদাম কুরি (Madame Marie Curie, 1867-1934) ও তাঁর স্বামী পিয়ারে কুরি (Pierre Curie, 1859-1906) একই রকম ঘটনা লক্ষ করেন। তাঁরা দেখতে পান যে, রেডিয়াম, পোলোনিয়াম, থোরিয়াম, অ্যাকটিনিয়াম, প্রভৃতি ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস থেকেও একই ধরনের বিকিরণ নির্গত হয়। এই বিকিরণ এখন তেজস্ক্রিয় রশ্মি (Radioactive rays) নামে পরিচিত। কোনো মৌল থেকে তেজস্ক্রিয় কণা বা রশ্মি নির্গমণের ঘটনাকে তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity) বলে। তেজস্ক্রিয় মৌল আলফা, বিটা ও গামা নামে তিন ধরনের শক্তিশালী রশ্মি নির্গমণ করে। ফলে এরা ভেঙে অন্যান্য লঘুতর মৌলে রূপান্তরিত হয়। যেমন রেডিয়াম ধাতু তেজস্ক্রিয় ভাঙনের ফলে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে সীসায় পরিণত হয়। তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের জন্য যে একক ব্যবহার করা হয় তার নাম বেকরেল।

১৩.২ আলফা কণা, বিটা কণা ও গামা রশ্মির বৈশিষ্ট্য
Properties of alpha, beta and gamma rays

আলফা কণা : আলফা কণা হলো একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। এর নিউক্লিয়াসে রয়েছে দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন। আলফা কণার ভেদন ক্ষমতা কম, 6 cm বাতাস ভেদ করে যেতে পারে না। এই কণা চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই কণা তীব্র আয়নায়ন সৃষ্টি করতে পারে এবং মারাত্মক ক্ষতিকর ও বিপদজনক। এর ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর চার গুণ এবং আধান 3.2×10^{-19}C। ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, ক্লাউড চেম্বার, স্বর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। এই কণা জিঙ্ক সালফাইড পর্দায় প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে। এর বেগ আলোর বেগের শতকরা ১০ ভাগ।

বিটা কণা: এই কণা ঋণাত্মক আধানযুক্ত এবং চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা অনেক বেশি বিক্ষিপ্ত হয়। এর দ্রুতি আলোর দ্রুতির শতকরা ৫০ ভাগ তবে শতকরা ৯৮ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। এর ভর ইলেকট্রনের সমান অর্থাৎ 9.11×10^{-31} kg। ফটোগ্রাফিক ফিল্ম ও ক্লাউড চেম্বার দিয়ে এর উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। এই কণা প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে। এর ভেদন ক্ষমতা আলফা কণার চেয়ে বেশি। এর গতি 3 mm পুরু অ্যালুমিনিয়াম পাত দ্বারা থামিয়ে দেওয়া যায়। বিটা কণা গ্যাসে যথেষ্ট আয়নায়ন সৃষ্টি করতে পারে।

গামা রশ্মি: এই রশ্মি আধান নিরপেক্ষ। একটি তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ। স্বল্প তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। এর কোনো ভর নেই। এই রশ্মি তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয় না। এর দ্রুতি আলোর সমান অর্থাৎ 3×10^{8} m s^{-1}।এই রশ্মির ভেদন ক্ষমতা অনেক বেশি। এটি বেশ কয়েক সেন্টিমিটার পুরু সীসার পাত ভেদ করে যেতে পারে। দুর্বল আয়নায়ন ক্ষমতা সম্পন্নহলেও এই রশ্মি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে। ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, ক্লাউড চেম্বার ও গাইগার মুলার কাউন্টার দিয়ে এর উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

১৩.৩ তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু

Half life of a radioactive element

একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের কোন পরমাণুটি কখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু কতগুলো পরমাণু কোন সময়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে তা আমরা হিসাব করে বের করতে পারি। পরমাণুর ক্ষয় বিবেচনার জন্য এক গুচ্ছ পরমাণু বিবেচনা করা হয়। যে সময়ে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের মোট পরমাণুর ঠিক অর্ধেক পরিমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাকে ঐ পদার্থের অর্ধায়ু বলে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোনো মৌলে ৮০০০০০ টি তেজস্ক্রিয় পরমাণু আছে। এর অর্ধেক অর্থাৎ ৪০০০০০ টি পরমাণু ক্ষয় হয়ে কোনো নতুন মৌলে রূপান্তরিত হতে যে সময় লাগে তাকে ঐ পদার্থের অর্ধায়ু বলে। পরবর্তী অর্ধায়ুর পর এতে অবশিষ্ট থাকবে ২০০০০০টি পরমাণু। আর একটি অর্ধায়ুর পর এই পরমাণুর সংখ্যা দাঁড়াবে ১০০০০০টিতে, এভাবে চলতে থাকবে।

এখানে একটি সম্ভাবনার নিয়ম কাজ করে কোন পরমাণুটি কখন ভেঙে যাবে তা কেউ বলতে পারে না।

১৩.৪ তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার

Uses of radioactivity

তেজস্ক্রিয়তার বহুল ব্যবহার রয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে, কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্প কারখানাতে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ করে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগ নিরাময়ে তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার আজ বহুল প্রচলিত। এছাড়া বিভিন্ন রোগ যেমন কিডনির ব্লকেড, থাইরয়েডের সমস্যা নির্ণয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তেজস্ক্রিয় ট্রেসার (tracer) বা প্রদর্শক বা সন্ধায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ করে উন্নত জাতের বীজ তৈরি ও গাছের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ধরনের সার উৎপাদনের গবেষণায় তেজস্ক্রিয় ট্রেসার সফলতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্প কারখানাতেও তেজস্ক্রিয়তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করতে, কাগজকলে কাগজের পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণে, আগুনের ধোঁয়ার উপস্থিতি নির্ণয়ে, ধাতব ঝালাই যাচাইয়ে তেজস্ক্রিয়তা ব্যবহৃত হচ্ছে। খনিজ পদার্থে বিভিন্ন ধাতুর পরিমাণ নির্ণয়েও এর ব্যবহার রয়েছে। এমনকি রোগ নির্ণয়ের কাজেও তেজস্ক্রিয় সন্ধায়ক সফলতার সাথে কাজে লাগানো হচ্ছে।

অনেক ঘড়ির কাঁটা ও নম্বর অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করতে দেখা যায়। এর কারণ হলো তেজস্ক্রিয় থোরিয়ামের সাথে জিঙ্ক সালফাইড মিশিয়ে ঘড়ির কাঁটা ও নম্বরে প্রলেপ দেওয়া হয় ফলে এরা অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। লক্ষ লক্ষ বছরের পুরোনো জিনিসের বয়স বা কাল নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয়তা ব্যবহার করা হয়।

১৩.৫ তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে সচেতনতা

Awarness of radioactivity

তেজস্ক্রিয়তা আমাদের অনেক উপকারে লাগে কিন্তু এ থেকে মারাত্মক বিপদও ঘটতে পারে। উচ্চ মাত্রার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মানবদেহে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি করে। এই বিকিরণ থেকে জীবনঘাতি ক্যানসার হতে পারে। দীর্ঘ দিন মাত্রাতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সংস্পর্শে থাকলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। মানুষ মানসিক বিকারগ্রস্ত হতে পারে। এমন কি বিকলাঙ্গতাও সৃষ্টি হতে পারে। তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব বশে পরম্পরায়ও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং যারা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিয়ে কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে। মাত্রাতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৩.৬ ইলেকট্রনিক্সের ক্রমবিকাশ
Development of electronics

বর্তমান যুগ হলো ইলেকট্রনিক্সের যুগ। রেডিও, টেলিভিশন, ফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, ক্যামেরা, ঘড়ি ইত্যাদি সকল ডিভাইস ইলেকট্রনিক্সের অবদান। ভ্যাকুয়াম টিউব, বিশেষ ধরনের কেসাস ও টিপসের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ হলো ইলেকট্রনিক্স। ইলেকট্রনিক্সের ইতিহাস প্রায় একশত বছরেরও বেশি পুরানো। ইলেকট্রনিক্সের প্রকৃত যাত্রা শুরু ১৮৭৩ সালে এডিসন ক্রিয়া আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এডিসন যখন তড়িৎ বাতি নিয়ে কাজ করছিলেন তখন একটি জিনিস তাকে খুব বিব্রত করছিল। তার বাতির কার্বন ফিলামেন্টের ধনাত্মক প্রান্ত বার বার পুড়ে যাচ্ছিল। এ অসুবিধা দূর করার জন্য তিনি ফিলামেন্টের সাথে একটি প্লেট সিল করে ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি দেখতে পান ফিলামেন্ট সাপেক্ষে প্লেটকে যখন ধনাত্মক বিভব দেওয়া হচ্ছে ভ্যাকুয়াম টিউবের মধ্য দিয়ে একটি তড়িৎপ্রবাহ চলে।কিন্তু প্লেটকে ঋণাত্মক বিভব দিলে তড়িৎপ্রবাহ চলে না। এডিসন বিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবে দেন, যেহেতু উত্তপ্ত ফিলামেন্ট থেকে নিঃসৃত আধান ধনাত্মক প্লেটের দিকে যায়, সুতরাং এ আধান ঋণাত্মক। প্লেট ঋণাত্মক হলে ঐ নিঃসৃত আধানকে বিকর্ষণ করে ফলে বর্তনীতে কোনো তড়িৎপ্রবাহ থাকে না। এটাই এডিসন ক্রিয়া নামে পরিচিত। বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী ফ্লেমিং এডিসন ক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে প্রথম ভ্যাকুয়াম টিউব আবিষ্কার করেন। এই টিউব রেকটিফায়ার বা একমুখিকারক হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ এটি দিক পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহকে (এসি) একমুখি তড়িৎ প্রবাহতে (ডিসি) পরিবর্তিত করে। এটিই ইলেকট্রনিক্সের আসল জন্ম।এসময় মার্কনির রেডিওর জন্য ডিটেকটরের খুব প্রয়োজন ছিল।এই টিউব সে অভাব পূরণ করে। এতে দুইটি ইলেকট্রোড ছিল বলে এর নাম ডায়োড।

এর দুই বছর পর আমেরিকার দ্য ফরেস্ট ট্রায়োড নামে আর একটি ভ্যাকুয়াম টিউব আবিষ্কার করেন। এতে তিনটি ইলেকট্রোড ছিল তাই এর নাম দেওয়া হয় ট্রায়োড। এর মধ্যে অ্যানোড ও ক্যাথোড ছাড়া তৃতীয় একটি ইলেকট্রোড ছিল যার নাম দেওয়া হয় গ্রিড। গ্রিড অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে তড়িৎপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। এটা কিন্তুকর যে ট্রায়োড অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। সুতরাং যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিকাশে ট্রায়োড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ডায়োড ও ট্রায়োডের চিত্র)

ডায়োড ও ট্রায়োড তাপতের আকার অনেক বড় হওয়ায় বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে স্থাপন করতে সমস্যা দেখা দেয়। এর জন্য শক্তির ব্যয় বেশি, এটির নির্ভরযোগ্যতা কম এবং একে ঠান্ডা রাখার জন্য অধিক শীতলীকরণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা তাই এর বিকল্প হিসাবে কোনো অর্ধপরিবাহী ডিভাইস খুঁজছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরা p-n

জাংশন ডায়োড আবিষ্কার করেন। এর পর দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তারা n- p-n ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। ট্রানজিস্টর অ্যাম্প্লিফায়ার বা বিবর্ধক হিসাবে কাজ করতে পারে।

অনেকগুলো ইলেকট্রনিক উপাংশকে একটি একক মাদারবোর্ডে সংযোজন করতে সমস্যা দেখা দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভবও হয় না। তাই আবিষ্কৃত হয় সমন্বিত বর্তনী বা আইসি। আইসি হলো সিলিকনের মতো অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করে তৈরি এমন একটি নির্মাণ যাতে আমাদের আঙুলের নখের সমান জায়গায় লক্ষ লক্ষ আণুবীক্ষণিক তড়িৎবর্তনী অন্তর্ভুক্ত থাকে। ১৯৬০ সালে এর আবিষ্কারের পর থেকেই আইসি চিপসের ডিজাইনে বিপ্লব ঘটতে থাকে।

১৩.৭ এনালগ ও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স
Analogue and digital electronics

এনালগ সংকেত : যেসব ঘটনার মান নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হয় তাদের বলা হয় এনালগ। শব্দ, আলো, তাপমাত্রা ও চাপের মান কোনো নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে যেকোনো মান হতে পারে। এনালগ উপাত্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রেরিত হয়। টেলিফোন, রেডিও, টিভি সম্প্রচার ও কেবল টিভি সাধারণত এনালগ ডেটা বা উপাত্ত প্রেরণ করে থাকে।

সুতরাং এনালগ সংকেত হলো নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তনশীল ভোল্টেজ বা কারেন্ট। এই ভোল্টেজ বা কারেন্ট স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত হয় এবং নিম্নতম থেকে উচ্চতম মানের মধ্যে যেকোনো মান গ্রহণ করতে পারে। এনালগ সংকেত আসলে একটি সাইন তরঙ্গ। অডিও ও ভিডিও ভোল্টেজ হলো এনালগ সংকেতের উদাহরণ।

চিত্র ১৩.১: এনালগ সংকেত

চিত্র ১৩.২: ডিজিটাল সংকেত

ডিজিটাল সংকেত : সাধারণভাবে ডিজিট কথাটির অর্থ সংখ্যা। ডিজিটাল কথাটি এসেছে 'ডিজিট' বা সংখ্যা কথাটি থেকে। ডিজিটাল সংকেত বলতে সেই যোগাযোগ সংকেত বোঝায় যা শুধু কিছু নির্দিষ্ট মান গ্রহণ করতে পারে। এরা ছিন্নায়িত মানে পরিবর্তিত হতে পারে এদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে চেনা যায়। এ ব্যবস্থায় বাইনারি কোড অর্থাৎ 0 ও ১ এর সাহায্য নিয়ে যেকোনো তথ্য, সংখ্যা, অক্ষর, বিশেষ সংকেত ইত্যাদি বোঝানো এবং প্রেরিত হয়। এই সংকেত ব্যবস্থায় 'অন' অবস্থার মান ১ এবং 'অফ' অবস্থার মান 0।

চিত্র : ১৩.৩ এনালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তর

কম্পিউটার যেকোনো উপাত্ত (ডেটা) সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রেরণ করে থাকে ডিজিটাল ডেটা হিসেবে। মোডেম এর সাহায্যে এনালগ ডেটাকে ডিজিটাল এবং ডিজিটাল ডেটাকে এনালগ ডেটায় রূপান্তরিত করা যায়। এনালগ ঘড়িতে ঘড়ির কাটা অবিরত ঘুরে সময় দেয়, আর ডিজিটাল ঘড়িতে এক মিনিট পরপর সংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে সময় দেয়।

এনালগ ও ডিজিটাল সংকেতের সুবিধা ও অসুবিধা

এনালগ ও ডিজিটাল সংকেতের মধ্যে কোনোটি উত্তম তা তিনটি বিষয় দিয়ে বিচার করা যায়। এগুলো হলো সংকেতের গুণগত মান, প্রক্রিয়া চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা ও দাম বা ব্যয়।

অধিক দূরত্বে সংকেত প্রেরণের জন্য ডিজিটাল সংকেত উত্তম। কারণ দূরত্ব বেশি হলে এনালগ সংকেতের ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। একে বাঁচিয়ে রাখতে পুনর্বিবর্ধন করতে হয়। কিন্তু এতে নয়েজ বেড়ে যায় ফলে সংকেতের মান হ্রাস পায় বা সংকেত বিকৃত হয় এবং এক সময় হারিয়েও যেতে পারে।। কিন্তু ডিজিটাল সিগন্যাল যেতে যেতে বিবর্ধিত হয়। ফলে সংকেত একই রকম থাকে। অপটিক্যাল ফাইবার দ্বারা সংকেত প্রেরণে ডিজিটাল সংকেত ব্যবহার করা হয়। কারণ সর্বশেষ সংকেতটিরও উত্তম গুণগত মান বজায় থাকে। এছাড়া প্রতি সেকেন্ডে অনেক বেশি সংকেত প্রেরণ করা যায়। এনালগ ডিভাইসের চেয়ে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যয়বহুল হলেও ডিজিটাল সার্ভিসের বেলায় সর্বসমেত ব্যয় কম। এনালগ ডিভাইসে ক্রস কানেকশন হতে পারে, ডিজিটালে তা হয় না।

১৩.৮ অর্ধপরিবাহী ও সমন্বিত বর্তনী

Semiconductor and integrated circuits

অর্ধপরিবাহী: কিছু কিছু পদার্থ (যেমন সিলিকন ও জার্মেনিয়াম) আছে যেগুলো সুপরিবাহী নয়, অন্তরকও নয়। এদের বলা হয় অর্ধপরিবাহী। বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী শীতল অবস্থায় অন্তরকের মতো কাজ করে এবং স্বাভাবিক কক্ষ তাপমাত্রায় খুব সামান্য পরিবাহী। কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট অন্য পদার্থ এর সাথে যোগ করে এর পরিবাহিতা বাড়ানো যায়। কোন পদার্থ যোগ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে অর্ধপরিবাহীকে n- টাইপ ও p- টাইপ হিসেবে ভাগ করা হয়। সিলিকনের সাথে ফসফরাস যোগ করে তৈরি অর্ধপরিবাহী হলো n- টাইপ অর্ধপরিবাহীর একটি উদাহরণ। ফসফরাস পরমাণুর উপস্থিতি এতে ঋণাত্মক ইলেকট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে যা পদার্থের মধ্যে মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে।

সিলিকনের সাথে বোরন যোগ করে তৈরি অর্ধপরিবাহী হলো p- টাইপ অর্ধপরিবাহীর একটি উদাহরণ। বোরন পরমাণু ইলেকট্রন কাঠামোর মধ্যে ফাঁক বা ধনাত্মক হোল তৈরি করে। ইলেকট্রন এক হোল থেকে অন্য হোলে লাফিয়ে লাফিয়ে পদার্থের মধ্যে চলাচল করে।

চিত্র ১৩.৪: ডায়োড ও এর প্রতীক চিহ্ন

যদি p- টাইপ পদার্থের সাথে n- টাইপ অর্ধপরিবাহীর জোড়া লাগানো হয় তাহলে একটি অতি প্রয়োজনীয় ডিভাইস তৈরি হয় যাকে p- n জাংশন ডায়োড বলে। এটি রেকটিফায়ার বা একমুখিকারক হিসাবে কাজ করে।

ডায়োড তড়িৎপ্রবাহকে একমুখি করে অর্থাৎ ডায়োড দিক পরিবর্তী তড়িৎপ্রবাহ (এসি) কে একমুখি তড়িৎপ্রবাহে (ডিসি) রূপান্তরিত করে।

বিভিন্ন কাজে তড়িৎপ্রবাহ ও ভোল্টেজ বিবর্ধনের প্রয়োজন হয়। এ কাজটি যে ডিভাইস দিয়ে করা হয় তার নাম অ্যাম্প্লিফায়ার। ট্রানজিস্টার হলো একটি ডিভাইস যা অ্যাম্প্লিফায়ার ও উচ্চ গতি সুইচ হিসেবে কাজ করে। দুইটি n- টাইপ অর্ধপরিবাহীর মাঝে একটি p- টাইপ অর্ধপরিবাহী স্যান্ডুইচের মতো জোড়া লাগিয়ে ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়। এর তিনটি স্তরকে বলা হয় সংগ্রাহক (collector), ভূমি (base) ও নিঃসারক

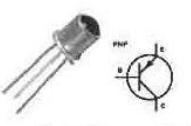

চিত্র ১৩.৫: ট্রানজিস্টার ও এর প্রতীক চিহ্ন

(emitter)। n- টাইপ অঞ্চল হলো ট্রানজিস্টরের সঞ্চায়ক ও নিঃসারক এবং সরু p- টাইপ অঞ্চল হলো ভূমি।

একইভাবে দুইটি p-টাইপ ও একটি n-টাইপ অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করে ট্রানজিস্টর তৈরি করা যায়। যার p-টাইপ অঞ্চল হলো সঞ্চায়ক ও নিঃসারক এবং সরু n-টাইপ অঞ্চল হলো ভূমি।

তড়িৎপ্রবাহ বিবর্ধণের কাজে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়।

সমন্বিত বর্তনী: সমন্বিত বর্তনী বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আইসি (*IC*) নামে বেশি পরিচিত। কম্পিউটার, মোবাইলফোন থেকে শুরু করে মাইক্রোওভেন পর্যন্ত যত রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বর্তমানে আমরা দেখি তার অধিকাংশগুলোতেই আইসির ব্যবহার দেখা যায়। আইসি হলো সিলিকনের মতো অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করে তৈরি এমন একটি নির্মাণ যাতে আমাদের আঙুলের নখের সমান জায়গায় লক্ষ লক্ষ আণুবীক্ষণিক তড়িৎবর্তনী সংযুক্ত বা অঙ্গীভূত থাকে। ১৯৬০ সালে এর আবিষ্কারের পর থেকেই আইসি চিপসের ডিজাইনে বিপ্লব ঘটতে থাকে। প্রথম দিকে আইসি চিপসে শুধু কয়েক শত বর্তনী উপাংশ অঙ্গীভূত ছিল। ১৯৭০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে হাজারে পৌঁছায়। ঐ সময় আইসি শুধু কম্পিউটার ও পকেট ক্যালকুলেটরে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে একটি একক আইসি চিপ লক্ষ লক্ষ উপাংশ ধারণ করতে পারে যা বহু জটিল ডিভাইস বা যন্ত্র চালাতে ব্যবহৃত হয়। বিখ্যাত ইনটেল চিপ এরকম একটি উদাহরণ। মজার ব্যাপার হলো বছরের পর বছর চিপসে উপাংশের সংখ্যা যত বেড়েছে চিপসের আকার তত ছোট হয়ে এসেছে এবং ডিভাইসের মান হয়েছে তত উন্নত।

আইসি চিপস যদি আবিষ্কৃত এবং এভাবে বিকশিত না হত তাহলে আমরা মোবাইলফোন, ইন্টারনেট, এমপিথ্রি প্লেয়ার ও আরও অনেক সৃজনশীল ডিভাইস পেতাম না। আধুনিক আইসি চিপ বিপ্লব এনেছে, দিয়েছে অনেক সুযোগসুবিধা ও আরাম আয়েস।

১৩.৯ মাইক্রোফোন ও স্পীকার

Microphone and speaker

মাইক্রোফোনকে চলতি কথায় মাইক বলে। কোনো বড় সভা বা অনুষ্ঠানে বক্তা যে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন তাকে বলা হয় মাইক্রোফোন বা মাইক। মাইক্রোফোন শব্দকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তর করে। শ্রোতা এই কথা লাউড স্পীকারের মাধ্যমে জোরে শুনতে পান। কারণ স্পীকার মাইক্রোফোনের তড়িৎ সংকেতকে শব্দে পরিবর্তিত করে। তোমাদের স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাইক্রোফোন ও স্পীকারের ব্যবহার তোমরা দেখে থাকবে। টেপরেকর্ডার, টিসিআর ইত্যাদিতে মাইক্রোফোন ও স্পীকার দুটোই থাকে।

মাইক্রোফোন ও এর কার্যক্রম : আমরা আগেই বলেছি যে, মাইক্রোফোন হলো এমন একটি ডিভাইস যা শব্দতরঙ্গকে তাড়িতঅডিও তরঙ্গ বা সংকেতে পরিবর্তিত করে। তাড়িতঅডিও তরঙ্গের কম্পাঙ্ক ও আপেক্ষিক বিস্তার শব্দ তরঙ্গের মতই থাকে। মাইক্রোফোনের মধ্যে একটি চলকুণ্ডলী ও ডায়াফ্রাম নামে ধাতুর একটি পাতলা পাত থাকে। যখন মাইক্রোফোনে কেউ কথা বলে তখন শব্দ তরঙ্গ দ্বারা এ ডায়াফ্রাম কম্পিত হয়। ডায়াফ্রাম হলো মাইক্রোফোনের সে অংশ যা শব্দের কম্পনকে তড়িতে রূপান্তরের জন্য ডিজাইন করা থাকে। বিভিন্ন রকমের শব্দের কম্পন ডায়াফ্রামকে বিভিন্নভাবে কম্পিত করে। এই কম্পন চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ গতিশীল করে। ফলে চলকুণ্ডলীতে পর্যাবৃত্ত তড়িৎপ্রবাহ আবিষ্ট করে। মাইক্রোফোন এভাবেই শব্দ শক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে। একে বলা হয় অডিও সংকেত।

চিত্র ঃ ১৩.৬ : মাইক্রোফোন

এ তড়িৎসঙ্কেতকে বিবর্ধিত করে টেলিফোন লাইন বা রেডিওর মাধ্যমে অনেক দূরে পাঠানো যায়। সুতরাং টিভি এবং রেডিও সম্প্রচার, রেকর্ডিং ও টেলিফোনের ক্ষেত্রে মাইক্রোফোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্পীকার (Speaker) : স্পীকার মাইক্রোফোনের ঠিক বিপরীত কাজটি করে। স্পীকার মাইক্রোফোনের তড়িৎ সঙ্কেতকে অনুরূপ শব্দে রূপান্তরিত করে।

চিত্র ঃ ১৩.৭ স্পীকারের বাহ্যিক রূপ

স্পীকারের কার্যক্রম : অধিকাংশ লাউডস্পীকার হলো চলকুণ্ডলী লাউডস্পীকার। এতে থাকে–

১. বেলনাকৃতির একটি স্থায়ী চুম্বক বা একটি শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে।

২. একটি হোট কয়েল বা তারকুণ্ডলী ঝুলানো থাকে। এই তারকুণ্ডলী চৌম্বকক্ষের মধ্যে মুক্তভাবে অগ্রপশ্চাৎ দুলতে পারে।

৩. তারকুণ্ডলীর সাথে শঙ্কু আকৃতির কাগজ (a paper cone) লাগানো থাকে।

যখন শব্দ থেকে তৈরি পর্যায়বৃত্ত তড়িৎপ্রবাহ এ তারকুণ্ডলী দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তারকুণ্ডলীটি অগ্রপশ্চাৎ যাওয়া আসা করে। এতে কাগজের শঙ্কুটি কম্পিত হয়।ফলে শব্দের সৃষ্টি হয়।

১৩.১০ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

Information and communication technology

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এখন খুবই পরিচিত ও জনপ্রিয় বিষয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজ থেকে শুরু করে পেশাগত জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই করতে পারি। বিংশ এবং একবিংশ শতকের প্রারম্ভে মানুষের কার্যক্রমকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে যোগাযোগ। উনবিংশ শতকে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের বিকাশ উন্নয়নে মানুষের যোগাযোগ ক্ষমতা আরও একধাপ এগিয়ে গেছে। বিংশ শতকে যোগাযোগের বিপ্লব এনেছে রেডিও, টেলিভিশন, সেলফোন, ফ্যাক্স মেশিন।এসব ব্যতিক্রমধর্মী যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট।

রেডিও : রেডিও বিনোদন ও যোগাযোগের একটি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রেডিওতে আমরা খবর,গান বাজনা, নাটক, আলোচনা বিতর্ক এবং পণ্যের বিজ্ঞাপন শুনতে পাই। সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনীতে তথ্য আদান প্রদানের জন্য রেডিও ব্যবহার করা হয়। মোবাইল বা সেলুলার টেলিফোন যোগাযোগে রেডিও ব্যবহৃত হয়। রেডিও আবিষ্কারে যেসব বিজ্ঞানী অবদান রেখেছেন, তারা হলেন ইতালির গুগলিয়েলমো মার্কনি ও বাংলাদেশের বিক্রমপুরের স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু।

চিত্র : ১৩.৮: রেডিও

রেডিওতে আমরা শব্দ শুনতে পাই। এ শব্দ কীভাবে প্রেরিত হয় এবং কীভাবেই বা আমরা শুনতে পাই? কোনো বেতার সম্প্রচার স্টেশনের স্টুডিওতে কোনো ব্যক্তি মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলেন। মাইক্রোফোন ঐ শব্দকে তড়িৎতরঙ্গে রূপান্তরিত করে। এ তরঙ্গের নাম অডিও সঙ্কেত। এ সঙ্কেতের কম্পাঙ্ক বা শক্তি খুবই কম, ২০ হার্জ

থেকে ২০০০০ হার্জ। এ তরঙ্গ বেশি দূর যেতে পারে না। তথ্য বহনকারী কম কম্পাঙ্কের এ তরঙ্গকে তাই এক প্রকার উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের সাথে মিশ্রিত করা হয়। উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট এই তরঙ্গকে বাহক তরঙ্গ বলে। মিশ্রিত তরঙ্গকে বলা হয় মড্যুলেটেড বা রূপারোপিত তরঙ্গ। এ দুই তরঙ্গের মিশ্রণের প্রক্রিয়াকে বলা হয় মডুলেশন। রূপারোপিত তরঙ্গকে বেতার তরঙ্গও বলা হয়। বেতার তরঙ্গকে অ্যাম্প্লিফায়ারে বিবর্ধিত করে প্রেরক যন্ত্রের এন্টেনার সাহায্যে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ হিসেবে শূন্যে (Space) প্রেরণ করা হয়। এ বেতার তরঙ্গ শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভূমি তরঙ্গ (Ground wave) ও আকাশ তরঙ্গ (Sky wave) নামে দুই ধরনের তরঙ্গে ভাগ হয়। ভূমি তরঙ্গ সরাসরি গ্রাহক যন্ত্রের এরিয়েলে পৌঁছায়। আমাদের ঘরে যে রেডিও সেটটি থাকে তাহলো গ্রাহকযন্ত্র। আকাশতরঙ্গ আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং গ্রাহকযন্ত্রের এরিয়েলে ধরা পড়ে।

গ্রাহকযন্ত্র বেতার তরঙ্গকে গ্রহণ করে একে তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করে। এরপর ডি-মডুলেশন বা ডিমডুলেশন বা ডিমডুলেশন প্রক্রিয়ায় বাহকতরঙ্গ হতে শব্দ আলাদা করে নেওয়া হয়। অতঃপর অ্যাম্প্লিফায়ারের সাহায্যে তড়িৎপ্রবাহকে বিবর্ধিত করে এবং লাউডস্পীকারে প্রেরণ করে। লাউড স্পীকার তড়িৎ প্রবাহকে পুনরায় শব্দে রূপান্তরিত করে। এ শব্দ আমরা শুনতে পাই।

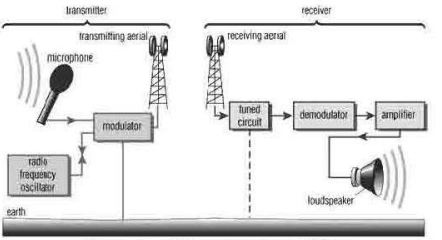

চিত্র ১৩.৯: রেডিও সম্প্রচার ও গ্রহণ প্রক্রিয়া

সুতরাং, রেডিওতে প্রেরক যন্ত্র থেকে শব্দ প্রেরণ করা হয় না। শব্দতরঙ্গকে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গে রূপান্তরিত করে পাঠানো হয়, গ্রাহকযন্ত্র বেতার তরঙ্গ গ্রহণ করে লাউড স্পীকার একে শব্দে রূপান্তরিত করে।

টেলিভিশন: টেলিভিশন হলো এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে আমরা দূরবর্তী কোনো স্থান থেকে শব্দ শোনার সঙ্গে বক্তার ছবি টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাই।

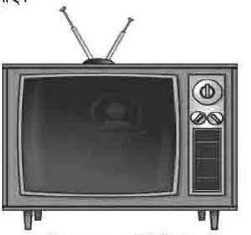

চিত্র ১৩.১০ : টেলিভিশন

লর্জি বেয়ার্ড ১৯২৬ সালে টেলিভিশনে চিত্র প্রেরণে সক্ষম হন। সেদিনকার টিভি শিল্পী ছিল একটি কথা বলা পুতুল।

টেলিভিশন কী করে কাজ করে : আমরা জানি, টেলিভিশনে ছবি দেখার সাথে সাথে শব্দও শোনা যায়। টেলিভিশনে শব্দ ও ছবি প্রেরণের জন্য প্রেরক স্টেশনে থাকে পৃথক পৃথক প্রেরক যন্ত্র, যার সাহায্যে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গরূপে শব্দ ও ছবি প্রেরণ করা হয়।

চিত্র ১৩.১০ : টেলিভিশন সম্প্রচার প্রক্রিয়া

একটি প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে ছবিকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করে প্রেরণ করা হয়। অন্য একটি প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে ছবিকে তড়িৎসংকেতে রূপান্তরিত করে তা তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ হিসেবে প্রেরণ করা হয়। প্রথমে ছবি প্রেরণ ও গ্রহণের কথাই বলা যাক। যে ছবি বা দৃশ্য প্রেরণ করতে হবে তা টেলিভিশন ক্যামেরা তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করে। এ সংকেতকে মডুলেশন প্রক্রিয়ায় উচ্চ কম্পাঙ্কের বাহক তরঙ্গের সাথে মিশ্রিত করা হয়। পরে এন্টেনার সাহায্যে তাড়িতচৌম্বক বেতার তরঙ্গ হিসেবে প্রেরণ করা হয়।

এন্টেনার সাহায্যে টিভি সেট ছবির জন্য প্রেরিত তাড়িতচৌম্বক বাহক তরঙ্গ গ্রহণ করে। রেকটিফায়ার বাহক তরঙ্গ থেকে ভিডিও তড়িৎ সংকেতকে পৃথক করে। বিবর্ধকের সাহায্যে এ তড়িৎ সংকেতকে বিবর্ধিত করা হয় এবং ইলেকট্রনগানে তা প্রদান করা হয়। টিভির পিকচার টিউবের পিছনের প্রান্তে ইলেকট্রন গান সংযুক্ত থাকে। ভিডিও সংকেত গ্রহণের পর ইলেকট্রনগান সুইয়ের ন্যায় সরু ইলেকট্রন বীম ছুঁড়তে থাকে। টিভির পর্দার প্রতিপ্রস্থ ফসফরে ইলেকট্রন গান থেকে যখন ইলেকট্রন বীম এসে পড়ে তখন এতে আলোক ঝলকের সৃষ্টি হয়। এ উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল আলোক বিন্দুর সমন্বয়েই টিভির পর্দায় উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল আলোক বিন্দু ও ঝলকের সৃষ্টি হয়। এ উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল আলোকবিন্দুর সমন্বয়েই টিভির পর্দায় ফুটে উঠে ক্যামেরা থেকে পাঠানো ছবি। টেলিভিশনের পর্দার উপর প্রতি সেকেন্ডে ২৫টি স্থির চিত্র গঠন করে যা আমাদের চোখ চলমান ছবি হিসেবে দেখে।

শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ

টেলিভিশনে যে চিত্র প্রেরণ করা হবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দকেও মাইক্রোফোনের সাহায্যে তড়িত সংকেতে রূপান্তরিত করা হয়। এ তড়িৎ তরঙ্গকে বাহকতরঙ্গ নামক এক প্রকার উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের সাথে মিশ্রিত করা হয় এবং প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরণ করা হয়।

আমরা বাড়িতে যে টেলিভিশন সেট ব্যবহার করি তাতে শব্দ ও ছবি সংকেত গ্রহণের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকে। প্রেরক যন্ত্র কর্তৃক প্রেরিত তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ আমাদের টিভি সেটের এন্টেনায় আসে এবং তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে। এ তড়িৎপ্রবাহ তারের মাধ্যমে টেলিভিশন সেটের গ্রাহকযন্ত্রে যায়। টেলিভিশন সেটের শব্দ গ্রহণকারী গ্রাহকযন্ত্র এ

তড়িৎ সংকেত গ্রহণ করে বিবর্ধিত করে। পরে একে লাউডস্পীকারে প্রেরণ করে। লাউডস্পীকার এ তড়িৎ সংকেতকে মূল শব্দে রূপান্তরিত করে। এ শব্দ আমরা শুনতে পাই।

মোটামুটিভাবে এ হলো সাদাকালো টেলিভিশনের কার্যপ্রণালি।

রঙিন টেলিভিশন: রঙিন ও সাদাকালো টেলিভিশনের মূল কার্যনীতিতে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। রঙিন টেলিভিশন ক্যামেরায় তিনটি মৌলিক রঙ (লাল, আসমানী এবং সবুজ)–এর জন্য তিনটি পৃথক ইলেকট্রনগান থাকে। রঙিন টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রেও তিনটি ইলেকট্রন গান থাকে। রঙিন টেলিভিশনের পর্দা তৈরি হয় তিন রকম ফসফর দানা দিয়ে। একটি বিশেষ রং শুধু তার বিশেষ রঙের ফসফর দানাগুলোকে আলোকিত করে। ফলে টেলিভিশন টিউবের পর্দায় একই সাথে ফুটে উঠে লাল, আসমানী ও সবুজ রঙের বিন্দু এবং এদের বিভিন্ন রকম মিশ্রণে টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে উঠে বিভিন্ন রঙিন ছবি।

টেলিফোন

ভূমিকা : টেলিফোন হলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ, সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় এক জটিল যোগাযোগ মাধ্যম। যেকোনো দেশে কথাবার্তা বলা, ঝর্তা, ফ্যাক্সবার্তা পাঠানো, কম্পিউটার যোগাযোগ, ইমেইল আদানপ্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।

আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell) ১৮৭৫ সালে টেলিফোন আবিষ্কার করেন। বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গ্রাহাম বেলের আবিষ্কৃত টেলিফোন আজকের আধুনিক টেলিফোনে এসে পৌঁছেছে, তৈরি হয়েছে কর্ডলেস, সেলুলার, মোবাইল ইত্যাদি নামের টেলিফোন।

টেলিফোন কীভাবে কাজ করে

প্রতি টেলিফোন সেটেই সংকেত গ্রহণ ও প্রেরণের ব্যবস্থা থাকে। টেলিফোনের হ্যান্ডসেটের মাউথ পিসটি হলো মাইক্রোফোন,এটি হলো প্রেরক এবং ইয়ারপিসটি হলো স্পীকার, এটি হলো গ্রাহক। টেলিফোন সেটে থাকে রিং রিং ঘন্টা বাজানোর একটি রিংগার ও একটি ডায়ালিং ব্যবস্থা। আমরা যখন কথা বলি মাউথপিসের মাইক্রোফোনটি কণ্ঠস্বরের শব্দ তরঙ্গকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করে। এ সংকেত টেলিফোনের তার দিয়ে অপর টেলিফোনের ইয়ারপিসে যায়। ইয়ারপিসের স্পীকার তড়িৎ সংকেতকে শব্দে রূপান্তরিত করে, ফলে গ্রাহক বা শ্রোতা শব্দ শুনতে পান এবং কথার জবাব দেন। এ জবাব শ্রোতার টেলিফোন সেটের মাউথপিসের মাইক্রোফোনের সাহায্যে তড়িৎ সংকেতে পরিণত হয়ে প্রেরকের টেলিফোনে ফিরে আসে এবং প্রেরকের ইয়ারপিসের স্পীকারে শব্দে পরিণত হয়, প্রেরক তখন গ্রাহকের কথা শুনতে পায়। টেলিফোনের তারে তড়িৎ সংকেত এত দ্রুত সঞ্চালিত হয় যে, এতে কোনো বিলম্ব ঘটে না। প্রতিটি টেলিফোন সেট এক আঞ্চলিক প্রধান অফিসের সাথে তারের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। আঞ্চলিক প্রধান অফিসের মাধ্যমে অন্য টেলিফোনের সাথে যোগাযোগ ঘটে।

চিত্র : ১৩.১১: ল্যান্ড ও মোবাইল টেলিফোন

চিত্র : ১৩.১২: ল্যান্ডটেলিফোনের কার্যপ্রণালী

সেল ফোন বা মোবাইল ফোন: মোবাইল ফোন বা মুঠোফোন বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম। শুধু যোগাযোগ নয়, এই ফোনে তোমরা গেইম খেলতে পার,মিউজিক ডাউনলোড করতে পার, গান শুনতে পার, সিনেমা দেখতে পার এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পার। এছাড়া এ ফোনে ক্যাশ পেমেন্ট, বিল পরিশোধ, এয়ারপোর্টে চেকইন এবং কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির দরখাস্ত করতে পার। এ ফোনের সাহায্যে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে অপর যেকোনো প্রান্তে যোগাযোগ করা যায়।

মোবাইলে কল করা ও কল রিসিভ করা

এ ফোন কিন্তু প্রধান অফিস বা অন্য ফোনের সাথে তার দিয়ে সংযুক্ত থাকে না। এ ধরনের ফোন তারের পরিবর্তে রেডিও বা বেতারের সাহায্যে কথাবার্তা বা তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণ করে থাকে। মোবাইল ফোনে টেলিফোন নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ ঘটে এক মোবাইল সেটের কীবোর্ড থেকে অন্য মোবাইলে ডায়াল করার মাধ্যমে। যখন তুমি কোনো মোবাইল থেকে ফোন কর তুমি যেখানেই থাক না কেন কলটি বেতার তরঙ্গ হিসেবে কোনো প্রেরক গ্রাহক টাওয়ারে যায়।

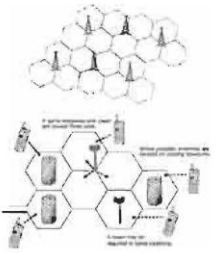

চিত্র ১৩.১৩: মোবাইল নেটওয়ার্ক

এরপর কলটি তার বা মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে মোবাইল সুইচ স্টেশনে যায়। এ স্টেশন কলটিকে স্থানীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জে পাঠায়। সেখানে এটি প্রচলিত ফোন কল হয়ে গ্রাহকের নিকট পৌঁছায়। বর্তমানে প্রচলিত অধিকাংশ মোবাইল ফোন কাজ করে বেতার তরঙ্গ প্রেরণ এবং প্রচলিত টেলিফোন সার্কিট সুইচিং এর সমন্বয়ে।

ফ্যাক্স : ফ্যাক্সিমিল এর সংক্ষিপ্ত নাম ফ্যাক্স। কোনো ডকুমেন্ট হুবহু কপি করে পাঠাতে ফ্যাক্স ব্যবহার করা হয়।

ফ্যাক্স কী : ফ্যাক্স হলো এমন একটি ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে যেকোনো তথ্য, ছবি, চিত্র, ডায়াগ্রাম বা লেখা হুবহু কপি করে প্রেরণ করা যায়। এ যন্ত্রের সাহায্যে যেকোনো মূল দলিল হুবহু পুনরুৎপাদন করা হয়।

১৮৪২ সালে ফ্যাক্স মেশিন আবিষ্কৃত হলেও রেডিও ফ্যাক্স এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৩০ সালে। বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার বেইন ফ্যাক্স আবিষ্কার করেন।

চিত্র ১৩.১৪: ফ্যাক্স মেশিন ও এর কার্যক্রম

ফ্যাক্স কীভাবে কাজ করে : আধুনিক ফ্যাক্স মেশিন হলো একটি অতি উন্নত প্রযুক্তির তড়িৎ আলোকীয় মেশিন। এখানে ইলেকট্রনিক উপায়ে মূল ডকুমেন্টকে স্ক্যানিং করা হয়। এরপর স্ক্যানকৃত সংকেতকে বাইনারি সংকেতে রূপান্তর করা হয়। এই সংকেত স্ট্যান্ডার্ড মোডেম কৌশল ব্যবহার করে টেলিফোনের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। গ্রাহক ফ্যাক্স মেশিন

প্রেরিত ইলেকট্রনিক সংকেত গ্রহণ করে মোডেমের সাহায্যে ডিমডুলেট করে মূল ডকুমেন্টে পরিণত করে। একটি প্রিন্টার এই মূল ডকুমেন্টকে হুবহু ছেপে বের করে।

কম্পিউটার (Computer)

এ যুগ তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার এত বেশি যে এ যুগকে কম্পিউটারের যুগও বলা হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মের অনেক কিছুই কম্পিউটারের ব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে কম্পিউটার হয়ে উঠেছে অপরিহার্য। কম্পিউটার গাণিতিক হিসাব করতে পারে, গাণিতিক যুক্তি দিতে পারে। গাণিতিক হিসাব ছাড়াও কম্পিউটার কোনো কিছু পছন্দ করা বা নির্বাচন করা, নকল করা, তুলনা করা, ধারাবাহিকভাবে সাজানো ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করতে পারে। ব্যবসা, বাণিজ্য, প্রশাসন, শিক্ষা, শিল্প, চিকিৎসা, যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা, বিনোদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের প্রয়োগ দিন দিন বেড়ে চলেছে।

কম্পিউটার কী

কম্পিউটার শব্দের অর্থ গণক বা হিসাবকারী। কম্পিউটার শুধু একটি হিসাবকারী যন্ত্রই নয়, আরো অনেক কিছু। কম্পিউটার হলো একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা উপাত্ত গ্রহণ,প্রক্রিয়াকরণ, রূপান্তর,সংরক্ষণ ও প্রেরণ করে। যে ধরনের কম্পিউটারই হোকনা কেন, প্রতিটি কম্পিউটার প্রোগ্রামকৃত নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা কম্পিউটারকে বলে দেয় তাকে কী করতে হবে ?

চিত্র ১৩.১৫ : কম্পিউটার

কম্পিউটারের গঠন

কম্পিউটার একটি উন্নত ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। কম্পিউটার তথ্য সংগ্রহ করে, সুনির্দিষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে এবং প্রয়োজনানুযায়ী ফলাফল উপস্থাপন করে। কম্পিউটার যেখানে তথ্য গ্রহণ করে তাকে বলা হয় অন্তর্গামী (Input) বা গ্রহণমুখ। এখানে কম্পিউটারের উপাত্ত প্রদান করা হয়। এজন্য যেসব ইনপুট ডিভাইস সাধারণত ব্যবহার করা হয় তাহলো কীবোর্ড, মাউস টাচপ্যাড, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন। যেখানে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে তাকে বলা হয় সিপিইউ বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (Central Processing Unit)। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে থাকে স্মৃতি ইউনিট, নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও গাণিতিক যুক্তি ইউনিট। যে প্রান্ত থেকে ফলাফল পাওয়া যায় তাকে বলা হয় বহির্গামী (Out put) বা নির্গমণ মুখ। আউটপুট ডিভাইস হিসাবে প্রধানত থাকে মনিটর, স্পীকার ও প্রিন্টার। এদের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকৃত ডেটা বা উপাত্ত আমরা পাই। নিচে কম্পিউটারের একটি মৌলিক কাঠামো দেওয়া হলো :

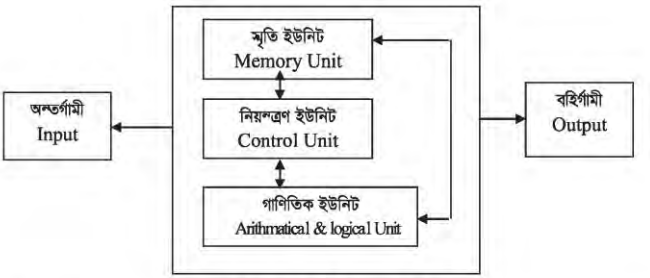

চিত্র : ১৩.১৬: কম্পিউটারের গঠন

যে সকল ভৌত ডিভাইস দিয়ে কম্পিউটার তৈরি তাদের বলা হয় হার্ডওয়্যার। যেমন–কীবোর্ড, মাউস, প্রসেসর, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি। সফটওয়্যার হলো কতগুলো নির্দেশনা যার ভিত্তিতে কম্পিউটার কাজ করে। এগুলোকে সাধারণত কম্পিউটার প্রোগ্রাম বলা হয়। প্রয়োজনের উপর ভিত্তিকরে কম্পিউটার প্রোগ্রামাররা প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করছে। হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটারের দেহ এবং সফটওয়্যার হলো কম্পিউটারের প্রাণ।

এর কাজ করার দ্রুততা, তথ্য জমা করে রাখার ক্ষমতা, সঙ্গতিপূর্ণতা, নির্ভুলতা, ক্লান্তিহীনতা ও স্বয়ংক্রিয়তা জন্য কম্পিউটার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র হিসেবে বিবেচিত। কম্পিউটার দ্রুত কাজ করতে পারে, সেকেন্ডে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ গাণিতিক হিসাব করতে পারে।

কম্পিউটারের ব্যবহার

আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো হলো :

চিকিৎসা : রোগীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট, পরিচয়, ঠিকানা, রোগের লক্ষণ, ইত্যাদি রেকর্ড করে রাখা, ঔষধ নির্বাচন, চোখ পরীক্ষা, এক্সরে বা অন্যান্য পরীক্ষা, হার্ট অপারেশন ও চিকিৎসা গবেষণায় কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

ব্যবসা বাণিজ্য : পণ্যের মজুদ নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসায়িক যোগাযোগ, টিকেট বুকিং, ব্যাংকিং সিস্টেম, স্টাফদের বেতন, আয়–ব্যয়ের বাজেট ও হিসাব নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবসায়িক কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

যাতায়াত ব্যবস্থা : জাহাজ, বিমান ও মোটরগাড়ি, ট্রেন ইত্যাদি যানবাহনের ট্রাফিক কন্ট্রোল, গতি নিয়ন্ত্রণ, টিকেট বুকিং ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মহাশূন্যযান পাঠানো, নিয়ন্ত্রণ, চালনা ইত্যাদিতে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে।

শিল্প কারখানা : পণ্য উৎপাদনে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের গুণগত মান যাচাই, তথ্য সংগ্রহ, কর্মচারীদের বেতন–ভাতা, কাজের সিডিওলের হিসাব ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। পারমাণবিক রিএ্যাক্টর চালনা বা এ ধরনের জটিল ও আধুনিক সব যন্ত্রের ব্যবহারে কম্পিউটার অপরিহার্য।

শিক্ষা : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ, স্বশিখন, পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

প্রতিরক্ষা : সেনাবাহিনী পরিচালনা, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

গবেষণা : বিভিন্ন গবেষণা কর্মে কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

মুদ্রণ : কম্পিউটারের ব্যবহার মুদ্রণ শিল্পে বিপ্লব এনেছে। মুদ্রণের জন্য কম্পোজ, ডিজাইন ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে অস্বাভাবিক মুদ্রণ ব্যয় কমে এসেছে।

ইন্টারনেট ও ইমেইল (Internet and e-mail) : ইন্টারনেট ও ইমেইল এর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। যারা শহরে বাস কর তাদের অনেকে বাসায় বা স্কুলে হয়ত ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইমেইল পাঠিয়েছ। কিন্তু তোমরা যারা গ্রামে বাস কর তাদের অনেকে হয়ত ইমেইল ও ফ্যাক্সের দোকান থেকে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবকে ইমেইল পাঠিয়েছ। ইমেইল বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত ডাক মাধ্যম।

ইন্টারনেট কী ? ইন্টারনেট হলো 'নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক' বা 'সকল নেটওয়ার্কের জননী'। এটি একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক যা সংযুক্ত করেছে বিভিন্ন দেশের প্রায় ৪,০০,০০০ এর বেশি ছোট ছোট নেটওয়ার্ককে। ১৯৬৯ সালে আমেরিকান প্রতিরক্ষা বিভাগ ইন্টারনেট চালু করেছে। ইন্টারনেট হলো এমন একদল নেটওয়ার্ক যা অসংখ্য কম্পিউটার, মোডেম, টেলিফোন লাইন দিয়ে তৈরি। এসব উপাদান পরস্পরের সাথে ভৌতভাবে সংযুক্ত। এ নেটওয়ার্ক পরস্পরের সাথে যেকোনো তথ্য বা উপাত্ত আদান প্রদানে সক্ষম। ইন্টারনেট অনেকগুলো নেটওয়ার্কের সমষ্টি এবং সকলে মিলে একটি একক নেটওয়ার্কের মতো কাজ করে।

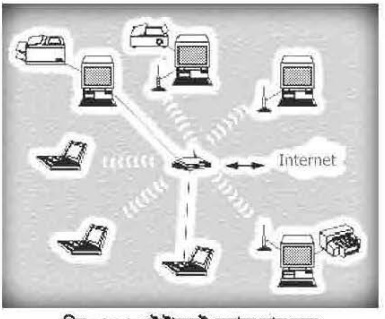

চিত্র : ১৩.১৭ ইন্টারনেট যেভাবে কাজ করে

ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা ওয়েব সাইট ব্রাউজিং করতে পারি, ইমেইল পাঠাতে এবং গ্রহণ করতে পারি ও ভিডিও কনফারেন্সিং করতে পারি। আড্ডা দিতে পারি এবং গল্প গুজব করতে পারি,ট্রেন, বাস বা প্লেনের টিকিট বুকিং দিতে পারি এবং ইলেকট্রনিক কমার্স বা ব্যবসাবাণিজ্য, ইব্যাংকিং ও শপিং করতে পারি। ইলেকট্রনিকভাবে যেকোনো ফাইল, ডকুমেন্ট ইত্যাদি পাঠাতে ও গ্রহণ করতে পারি। এছাড়া যেকোনো সময় অনলাইন লাইব্রেরির হাজারহাজার, লক্ষ লক্ষ বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন ইত্যাদির সন্ধান পেতে পারি এবং প্রয়োজনে পাঠ করতে পারি অথবা 'ডাউনলোড' করে ছেপে বের করে নিতে পারি।

ইমেইল: ইলেকট্রনিক মেইলকে সংক্ষেপে বলা হয় ইমেইল। ইমেইল হলো ইন্টানেটের মাধ্যমে বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠি, আত্মীয়স্বজন বা সহকর্মীদের সাথে দ্রুত এবং দক্ষ যোগাযোগের উপায়। এই মেইল বা চিঠি পাঠাতে কোনো স্ট্যাম্প, পোস্টকার্ড বা এনভেলপ বা কোনো ডাকপিয়নের দরকার হয় না। ইন্টারনেটের সাহায্যে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে চিঠি পাঠানো ও গ্রহণ করা যায়, ডকুমেন্ট, চিত্র, ছবি এবং যেকোনো তথ্য আদানপ্রদান করা যায়। ইমেইল কীভাবে পাঠানো হয় তার একটি ব্লক চিত্র নিচে দেওয়া হলো :

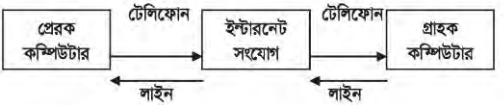

চিত্র : ১৩.১৮ : ইমেইল গ্রহণ ও প্রেরণ

ইমেইল, ইলেকট্রনিক মেসেজ বা বার্তা ও ফাইলকে এক বা একাধিক ইলেকট্রনিক মেইলবক্স বা ডাকবক্সে কপি করে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ইমেইল বার্তা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারে এবং বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে বার্তা সেকেন্ডের মধ্যে আসতেও পারে। ইমেইল ব্যবহারের জন্য প্রেরক ও গ্রাহক উভয়ের প্রয়োজন হয় ইমেইল এড্রেস বা ঠিকানার। নিচের ইমেইল এড্রেসটি লক্ষ কর ঃ

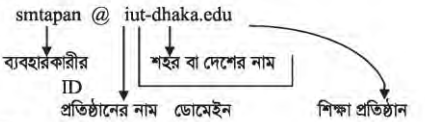

আরও একটি সহজ ইমেইল এড্রেস হতে পারে,

smtapan@gmail.com

তথ্য ও যোগাযোগ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির কার্যকর ব্যবহার

যোগাযোগের জন্য আমরা ব্যবহার করছি নানান রকম যন্ত্রপাতি যেমন ফোন (ল্যান্ড, মোবাইল ও কর্ডলেস), রেডিও, টেলিভিশন, ফ্যাক্স মেশিন, কম্পিউটার ইত্যাদি। এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে পৃথিবী যেমন চলে এসেছে আমাদের হাতের মুঠোয়, তেমনি সৃষ্টি হয়েছে নানান রকম সমস্যা। সুতরাং এদের থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে এদের কার্যকর ব্যবহার করতে হবে।

আমাদের দেশে বিদ্যুতের খুব অভাব তাই এসব ডিভাইস অযথা ব্যবহার করে বিদ্যুতের অপচয় করব না। অনেকে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে নানান রকম অপরাধমূলক কাজ করে। এদের থেকে সাবধান হব এবং এর সাহায্যে আমরা নিজেরাও কোনো অপরাধের কাজ করব না।

অধিকক্ষণ ধরে কম্পিউটার ব্যবহার করব না। কারণ, যারা অধিকক্ষণ ধরে কম্পিউটার নিয়ে কাজ করেন, কম্পিউটারের কীবোর্ড ও মাউসের দীর্ঘক্ষণ ও দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে তাদের হাতের রগ, স্নায়ু, কব্জি, বাহুতে, কাঁধ ও ঘাড়ে অতিরিক্ত টান (stress) বা চাপ পড়ে। ফলে কাজের ফাঁকে যথেষ্ট বিশ্রাম না নিলে এসব অঙ্গে ব্যথাসহ নানান রকম সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে হাত, বাহু ও আঙুলের ব্যথা, আঙুল ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম না নিয়ে দীর্ঘদিন ও দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারে কাজ করলে চোখে নানান রকম সমস্যার সৃস্টি হয়, একে বলা হয় কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম। এই সিনড্রোমের মধ্যে রয়েছে চোখ জ্বালা পোড়া করা, চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া, চোখ চুলকানো, চোখ লাল হয়ে যাওয়া এবং চোখের পানি শুকিয়ে যাওয়া।

কম্পিউটারে কাজ করার সময় সঠিকভাবে বসতে হবে এবং সোজা সামনে তাকাতে হবে। টাইপ করার সময় হাত যেন কোনো কিছুর উপর রাখা না থাকে এবং হাত ও আঙুল যেন সোজা থাকে। কম্পিউটারের স্ক্রিন বা পর্দাটি যেন অবশ্যই চোখ হতে ২০ থেকে ২৪ ইঞ্চি (প্রায় ৫০–৬০ সেমি) দূরে থাকে। মাথার উপর বাতির আলো এবং টেবিলের বাতির আলো এমনভাবে কমিয়ে দিতে হবে যেন তোমার চোখে বা কম্পিউটারের পর্দায় তা না পড়ে।

রেডিও এবং টেলিভিশন থেকে যে সমস্যা দেখা দেয় তা প্রধানত শব্দদূষণজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা। আমরা অনেকে খুব হাইভলিয়ুমে রেডিও ও টেলিভিশন চালাই। এতে নিজের কানের যেমন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, তেমনি আমাদের আশেপাশের বাড়িতে যারা বাস করেন, তাদের মধ্যে যদি উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত রোগী এবং হৃদরোগী থাকেন বা অন্য যেকোনো অসুস্থ রোগী থাকেন শব্দ দূষণজনিত কারণে তারা আরও বেশি অসুস্থতা ও অস্থিরতা বোধ করতে পারেন। যারা খুব বেশি শব্দে রেডিও বা টিভি চালান, তারা মাথা ব্যথা, কানে কম শোনা, অবসন্নতা ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়তে পারেন। সুতরাং বেশি জোরে টিভি ও রেডিও চালাব না।

অনেকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে মানুষকে বিরক্ত করে। এসব কাজ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

১। তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে নির্গত আলফা কণা কী?

(ক) একটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস (খ) একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস

(গ) একটি তড়িৎ নিরপেক্ষ কণা (ঘ) একটি ঋণাত্মক কণা

২। তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের ফলে যে বিটারশ্মি নির্গত হয় তা আসলে কী?

(ক) ঋণাত্মক ইলেকট্রনের স্রোত (খ) একটি তড়িৎ নিরপেক্ষ কণা

(গ) একটি ধনাত্মক নিউক্লিয়াস (ঘ) ধনাত্মক প্রোটনের স্রোত

৩। কোন সিলিকন চিপে লক্ষ লক্ষ বর্তনী সংযোজিত হলে তাকে কী বলে?

(ক) সমান্তরাল বর্তনী (খ) অর্ধপরিবাহী ট্রানজিস্টর

(গ) সমন্বিত বর্তনী (ঘ) অর্ধপরিবাহী ডায়োড

৪। টেলিভিশন সম্প্রচারে ক্যামেরার কাজ কী?

(ক) ছবিকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তর করা (খ) ছবিকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করা

(গ) তড়িৎ সংকেতকে ছবিতে রূপান্তর করা (ঘ) শব্দ তরঙ্গকে ছবিতে রূপান্তর করা

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী, আমরা বাস করছি গ্লোবাল ভিলেজে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পৃথিবীর সকল মানুষকে কার্যকর ও দক্ষতার সাথে সংযুক্ত করেছে। যোগাযোগের প্রধান বাহনগুলো হচ্ছে টেলিভিশন, রেডিও এবং টেলিফোন।

(ক) যোগাযোগ যন্ত্র কাকে বলে?

(খ) কীভাবে টেলিফোন কাজ করে ব্যাখ্যা কর।

(গ) কীভাবে রেডিও স্টেশন নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের সংকেত সঞ্চালন করে এবং তা গ্রাহকের নিকট পৌঁছায়, চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) যোগাযোগের যন্ত্র হিসাবে টেলিভিশন ও রেডিওর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ ও তুলনা কর।

২। শ্রীলঙ্কার প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলাটি ভূউপগ্রহের মাধ্যমে বিটিভি সম্প্রচার করছে।ফলে ঘরে বসেই টেলিভিশনে খেলাটি উপভোগ করা যাচ্ছে।

(ক) এনালগ সংকেত কাকে বলে?

(খ) চিত্রের সাহায্যে একটি ডিজিটাল সংকেত ব্যাখ্যা কর।

(গ) টেলিভিশনে খেলাটির সম্প্রচার কৌশল ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) এ ধরনের যোগাযোগ প্রযুক্তি জীবনমানকে কীভাবে উন্নত করছে –আলোচনা কর।

গ. সাধারণ প্রশ্ন

১। তেজস্ক্রিয়তা কী ব্যাখ্যা কর।

২। আলফা ও বিটা কণার পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

৩। সমন্বিত বর্তনী কী?

৪। ইন্টারনেট কাকে বলে? এর দ্বারা কী কী কাজ করা যায়?

৫। ফ্যাক্স কীভাবে কাজ করে বর্ণনা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

জীবন বাঁচাতে পদার্থবিজ্ঞান

PHYSICS TO SAVE LIFE

[পদার্থবিজ্ঞানের সাথে জীববিজ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন করে একটি নতুন বিষয়ের বিকাশ ঘটেছে তার নাম জীবপদার্থবিজ্ঞান। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের দরকার সুস্থ, সবল ও নিরোগ দেহ। সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজন সঠিক চিকিৎসা। চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে নানা ধরনের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি। এসকল যন্ত্রপাতি পদার্থবিজ্ঞানের কোনো নীতি বা তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে কাজ করে। এমন কিছু যন্ত্রপাতি সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।]

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১. জীবপদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে পারব।

২. জীবপদার্থবিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব।

৩. মানবদেহ পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে পরিচালিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

৪. চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতে পদার্থবিজ্ঞানের ধারণা ও তত্ত্বের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।

৫. আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা এবং প্রতিরোধের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।

৬. সঠিক চিকিৎসার জন্য রোগ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিজে সচেতন হবো এবং অন্যদের সচেতন করতে পারব।

৭. রোগ নির্ণয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রশংসা করতে পারব।

১৪.১ জীবপদার্থবিজ্ঞান এর ভিত্তি
Background of bio-physics

জীবপদার্থবিজ্ঞান হলো এমন এক বিজ্ঞান যা বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জীবপদার্থবিজ্ঞানে জীববিজ্ঞানের কোনো ব্যবস্থাকে অধ্যয়নের জন্য ভৌতবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। জীববিজ্ঞান হলো জীবজগৎ অধ্যয়নের বিজ্ঞান। কীভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী খাদ্য আহরণ করে, যোগাযোগ রক্ষা করে, পরিবেশ সম্পর্কে উপলব্ধি লাভ করে এবং বংশবৃদ্ধি করে এ বিষয়গুলো জীববিজ্ঞানে বর্ণনা করা হয়। অন্যদিকে প্রকৃতি যে সব গাণিতিক নিয়ম মেনে চলে সেগুলো হলো পদার্থবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। দীর্ঘদিন একটি ধারণা বিজ্ঞানীরা পোষণ করে এসেছেন যে জীবজগতের নিয়ম ও ভৌতজগতের নিয়ম আলাদা। কিন্তু ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের অগ্রগতির ভিতর দিয়ে এই দুই আপাত ভিন্ন শৃঙ্খলার মধ্যে গভীর মিল পাওয়া গেছে। প্রথমে পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান দুইটি ভিন্ন বিষয় হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির মধ্য দিয়ে এই দুই বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে মনে করা হতো প্রাণিজগত ভিন্ন এক নিয়মে চলে এবং জড় পদার্থের ক্ষেত্রে শুধু ভৌতবিজ্ঞানের নিয়মগুলো প্রযোজ্য। কিন্তু আমরা এখন জানি প্রাণিদেহকে অনেক দিক থেকে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায় এবং প্রাণিদেহের অনেক আচরণকে ভৌত নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বস্তুত পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো সার্বজনীন। ফলে শুধু জড়জগত নয়, প্রাণিজগতকেও পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এটিই জীবপদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি।

জীবপদার্থবিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ হলো কীভাবে জীবনের নানা জটিলতাকে পদার্থবিজ্ঞানের সহজ নিয়মের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়। গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে জীবনের নানাবিধ রহস্য অনুসন্ধান ও বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর গভীরে প্রবেশ করার শক্তিশালী মাধ্যম হলো জীবপদার্থবিজ্ঞান। জীবপদার্থবিজ্ঞান হলো জীববিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধ স্বরূপ।

১৪.২ জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান
Contributions of Jagadish Chandra Bose

আচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন একাধারে একজন প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী, অন্যদিকে একজন জীববিজ্ঞানী। আমদের উপমহাদেশে তিনিই প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী। বসু পরিবারের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল নামক গ্রামে। ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর জগদীশচন্দ্র বসু ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ফরিদপুর জেলার একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। প্রথমে ফরিদপুরের গ্রামীণ বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় লেখাপড়া শুরু করেন। পরে কোলকাতার হেয়ার স্কুল ও সেন্ট জেভিয়ার স্কুল ও কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। ১৮৮০ সালে বি.এ পাশ করার পর ঐ বছরই তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড যান। ইংল্যান্ডে তার শিক্ষা জীবন ছিল ১৮৮০–১৮৮৪ সাল পর্যন্ত। ঐ সময়ে তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বি.এ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৮৮৫ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণার তেমন সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও তিনি সেখানে গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। দিনের বেলায় সময় না থাকায় বেশিরভাগ সময় তাঁকে রাতের বেলায় গবেষণার কাজ করতে হতো।

গবেষণাগারে তিনি কীভাবে দূরবর্তী স্থানে তারের সাহায্য ছাড়া কোনো রেডিও সংকেতকে পাঠানো যায় এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা করেন এবং সফল হন। ১৮৯৫ সালে তিনি ইতিহাসে প্রথম বারের মতো দূরবর্তী স্থানে বিনা তারে রেডিও সংকেত প্রেরণ করে জনসমক্ষে দেখান। মাইক্রোওয়েভ গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনিই প্রথম উৎপন্ন তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে মিলিমিটার (প্রায় ৫ মিলিমিটার) পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সক্ষম হন। তিনিই প্রথম রেডিও সংকেতকে সনাক্ত করার কাজে অর্ধপরিবাহি জাংশনের ব্যবহার করেন। এই আবিষ্কার থেকে ব্যবসায়িক সুবিধা নেওয়ার পরিবর্তে তিনি তাঁর আবিষ্কারকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন, যেন অন্যরা এই গবেষণাকে আরো সমৃদ্ধ করার সুযোগ পায়।

চিত্র ১৪.১: আচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বের উপর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেন। এগুলোর মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি রেকর্ড করার জন্য 'ক্রেস্কোগ্রাফ' আবিষ্কার, অতিসীমিত মাত্রায় নড়াচড়া এবং কীভাবে উদ্ভিদ বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয় তা উলেখযোগ্য।

জীবপদার্থবিজ্ঞানে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো, উদ্ভিদ কীভাবে উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়, এর পরিবহনের প্রকৃতি নিয়ে। আগে ধারণা করা হতো বিভিন্ন উদ্দীপনায় উদ্ভিদের সাড়া দেওয়ার প্রকৃতি রাসায়নিক কিন্তু তিনি দেখাতে সমর্থ হলেন যে এর প্রকৃতি বৈদ্যুতিক।

১৯১৭ সালে উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। জগদীশচন্দ্র বসুর বাংলা ভাষায় রচিত রচনাবলী 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ হলো 'Response in the Living and Non-Living'। ১৯৩৭ সালের ২৩ শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্র বসু মৃত্যুবরণ করেন।

১৪.৩ মানবদেহ এবং যন্ত্র
Human body and machine

প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা নানা ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করি। যেমন– অটোমোবাইল, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, অন্তর্দহন ইঞ্জিন ইত্যাদি। মানবদেহকে অনেকে একটি যন্ত্রবূপে অভিহিত করে থাকেন। যদিও মানবদেহ আসলে যন্ত্র নয়, তবু এটি অনেকাংশে যন্ত্রের ন্যায় আচরণ করে। যন্ত্রের মতো এটিও অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা অঙ্গ নিয়ে গঠিত; যার একটির অভাবে বা বিকল হয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণ দেহের কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়। যন্ত্রের প্রত্যেকটি অংশ যেমনিভাবে বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে, তেমনিভাবে মানবদেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ আলাদা আলাদা কাজে নিয়োজিত। মানবদেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ একে অন্যের সাথে আন্তসম্পর্কিত, প্রত্যেকটি অঙ্গ নিজস্ব গতিতে চলে, কিন্তু সবগুলো কাজই সুনির্দিষ্ট এবং এদের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণেই মানবদেহ মানবসৃষ্ট সবচেয়ে জটিল যন্ত্রের সমতুল্য।

মানবদেহের এমন অংশগুলোর মধ্যে রয়েছে হৃৎযন্ত্র, বৃক্ক, ফুসফুস, যকৃত ইত্যাদি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হৃৎপিণ্ড আসলে একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্প, যা বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই নিজস্ব বৈদ্যুতিক সিগন্যাল দ্বারা সমগ্রদেহে

রক্ত সঞ্চালন করতে সক্ষম। অপরদিকে, বৃক্ক একটি বিশেষ ছাঁকন যন্ত্র যা মানুষের শরীরের নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে থাকে। এরকম অসংখ্য ছোট ছোট যন্ত্রের কাজের সমন্বয়ের ফলে সম্পূর্ণ মানবদেহ সচল থাকে।

মানবদেহ একটি জৈবযন্ত্র স্বরূপ। যন্ত্র দ্বারা কাজ করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। বিভিন্ন ইঞ্জিনে আমরা পেট্রোল, ডিজেল, সি.এন.জি ইত্যাদি জ্বালানি ব্যবহার করে রাসায়নিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করি। ঠিক তেমনিভাবে, খাদ্য গ্রহণ ও শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবদেহও রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তি ও যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। সুতরাং মানবদেহ আসলে একটি জৈবিক যন্ত্রের মতো। কিন্তু অনেক দিক দিয়ে মানবদেহ মানবসৃষ্ট জটিলতম যন্ত্রের চেয়েও বিস্ময়কর। মানবদেহ এমন কিছু কাজ করতে পারে, যা কোনো যন্ত্রের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যেমন– মানুষের দেহ একটি মাত্র কোষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই একটি কোষই পূর্ণাঙ্গ মানবদেহে পরিণত হয়, যা লক্ষ কোটি কোষ দ্বারা গঠিত। কিন্তু কোনো যন্ত্রেই এমনটি ঘটে না। কখনো কখনো শরীরের একটি মাত্র অংশ বিকল হলে সমগ্র মানবদেহের কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। যেমন– হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া থেমে গেলে শরীরের অন্যান্য সকল অঙ্গাগুলোর কর্মকাণ্ডও বন্ধ হয়ে যায় এবং খুব দ্রুত মস্তিস্কের ক্রিয়াও থেমে যায়।

১৪.৪ রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি

Instruments used for diagnosis of diseases

এক সময় চিকিৎসকগণ রোগীর বাহ্যিক বিভিন্ন লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় করতেন এবং সে অনুযায়ী ঔষধ ও পথ্য দিতেন। সে সময় রোগ নির্ণয়ের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়নি। ফলে বাইরে থেকে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঠিক অবস্থান বোঝা যেত না। এছাড়া রোগীর কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গ কী মাত্রায় রোগাক্রান্ত হয়েছে, তাও জানা সম্ভব ছিল না। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে রোগ নির্ণয়ের জন্য অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ যন্ত্রপাতিগুলোর সাহায্যে সঠিকভাবে রোগ নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে। সঠিক যন্ত্রপাতি ছাড়া চিকিৎসকের পক্ষে সঠিকভাবে রোগ নিরূপণ করা সম্ভব নয়, যেটির সাহায্যে ঐ প্রয়োজনীয় পরীক্ষাটি সম্পন্ন করতে হবে। আধুনিক বিভিন্ন যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে রোগের কারণ নির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। এক সময় অজ্ঞতার কারণে মানুষ রোগসংক্রান্ত অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাস করতো। আধুনিক সমাজে মৃত্যুহার অনেক কমে গেছে, তার প্রধান কারণ রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় বিভিন্ন ভৌত যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ অনুচ্ছেদে রোগ নির্ণয়ের জন্য সাধারণত যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় এর কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

এক্সরে

X-ray

এক্সরে হলো এক ধরনের তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ। এক্সরের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক কম। এই রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-10} m এর কাছাকাছি। ১৮৯৫ সালে উইলহেলোম রন্টজেন এক্সরে আবিষ্কার করেন। রঞ্জনরশ্মির আরেক নাম এক্সরে। রঞ্জনরশ্মির প্রকৃতি যখন জানা ছিল না তখন অজানা রশ্মি হিসেবে এর নামকরণ করা হয় এক্সরে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত ছোট হবে এক্সরের কোনো পদার্থ ভেদ করার ক্ষমতা তত বেশি হবে। সাধারণ আলো দৃশ্যমান এবং বিভিন্ন রঙে বিভক্ত কিন্তু এক্সরে দৃশ্যমান নয়। সাধারণ আলোর পথে কোনো অস্বচ্ছ পদার্থ থাকলে তা ভেদ করতে পারে না। অপরদিকে এক্সরে উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন। এক্সরে নলে এক্সরে উৎপন্ন

হয়। এক্সরে নল একটি বায়ুশূন্য কাচ নল। কাচ নলের দুইপ্রান্তে দুইটি তড়িৎদ্বার বা ইলেকট্রোড লাগানো থাকে। এদের একটির নাম ক্যাথোড এবং অপরটি অ্যানোড। ক্যাথোডে টাংস্টেন ধাতুর একটি কুণ্ডলী থাকে, একে ফিলামেন্ট বলে। ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎপ্রবাহ ক্যাথোডকে উত্তপ্ত করে। ফলে ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয় এবং বের হয়ে আসে। ক্যাথোড এবং অ্যানোডের মধ্যে খুব উচ্চ বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা হলে ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রনগুলো খুব দ্রুতগতিতে ছুটে যায় এবং লক্ষবস্তু অ্যানোডকে আঘাত করে। দ্রুতগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতুকে (অ্যানোড) আঘাত করলে তা থেকে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এবং উচ্চ ভেদনক্ষমতা সম্পন্ন এক প্রকার বিকিরণ উৎপন্ন হয়। এ বিকিরণকে এক্সরে বা এক্স রশ্মি বলে। চিত্র ১৪.১–এ এক্সরে টিউবের প্রয়োজনীয় অংশগুলো দেখানো হয়েছে।

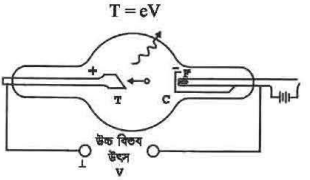

চিত্র ১৪.১: এক্সরে টিউব

চিত্র ১৪.২: এক্সরে পরীক্ষা

এক্সরে নানা কাজে ব্যবহার করা যায়। রোগ নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর অবদান অপরিসীম।

১. স্থানচ্যুত হাড়, হাড়ে ফাটল, ভেঙে যাওয়া হাড় ইত্যাদি এক্সরের সাহায্যে খুব সহজেই সনাক্ত করা যায়।
২. মুখমণ্ডলের যেকোনো ধরনের রোগ নির্ণয়ে এক্সরের ব্যবহার অনেক যেমন– দাঁতের গোড়ায় ঘা এবং ক্ষয় নির্ণয়ে এক্সরে ব্যবহৃত হয়।
৩. পেটের এক্সরের সাহায্যে অন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা (Intestinal obstruction) সনাক্ত করা যায়।
৪. এক্সরের সাহায্যে পিত্ত থলি ও কিডনির পাথরকে সনাক্ত করা যায়।
৫. বুকের এক্সরের সাহায্যে ফুসফুসের রোগ যেমন– নিউমোনিয়া, ফুসফুসের ক্যান্সার ইত্যাদি নির্ণয় করা যায়।
৬. চিকিৎসার কাজেও এক্সরে ব্যবহার করা যায়। এটি ক্যান্সার কোষকে মেরে ফেলতে পারে। রেডিওথেরাপি প্রয়োগ করে ক্যান্সারের চিকিৎসা করা যায়।

এক্সরের অপ্রয়োজনীয় বিকিরণসম্পাত যাতে রোগীর ক্ষতি করতে না পারে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এজন্য এক্সরে নেওয়ার সময় রোগীকে সীসা নির্মিত এপ্রোন দ্বারা যথাসম্ভব আচ্ছাদিত করতে হবে। অতি জরুরি না হলে গর্ভবতী মহিলাদের উদর এবং পেলভিক অঞ্চলের এক্সরে করা উচিত নয়। অন্য কোনো এক্সরে পরীক্ষা প্রয়োজন হলে সীসা নির্মিত এপ্রোন অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

আল্ট্রাসনোগ্রাফি

Ultrasonography

আল্ট্রাসনোগ্রাফি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দের প্রতিফলনের উপর নির্ভরশীল। উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ যখন শরীরের গভীরের কোনো অঙ্গ বা পেশি থেকে প্রতিফলিত হয় তখন প্রতিফলিত তরঙ্গের সাহায্যে ঐ অঙ্গের অনুরূপ একটি প্রতিবিম্ব মনিটরের পর্দায় গঠন করা হয়।

রোগ নির্ণয়ের জন্য যে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করা হয় সেই শব্দের কম্পাঙ্ক 1-10 মেগাহার্টজ হয়ে থাকে। আল্ট্রাসনোগ্রাফি যন্ত্রে ট্রান্সডিউসার নামক একটি স্পর্শকে কৈত্যতিকভাবে উত্তেজিত বা উদ্দীপিত করে উচ্চ কম্পাঙ্কের আল্ট্রাসনিক তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয়। আল্ট্রাসনোগ্রাফি যন্ত্রে আল্ট্রাসনিক তরঙ্গগুলোকে একটি সরু বিমে পরিণত করা হয়। পরে এই বীমটিকে যে অঙ্গের প্রতিবিম্ব রেকর্ড করতে হবে তার দিকে প্রেরণ করা হয়। যে অঙ্গের দিকে এটি নির্দেশ করা হয় সেই তলের প্রকৃতি অনুযায়ী বীমটি প্রতিফলিত, শোষিত বা সংবাহিত হয়। যখন বীমটি বিভিন্ন ঘনত্বের পেশির (যেমন– মাংসপেশি, রক্ত) বিভেদতলে আপতিত হয় তখন তরঙ্গের একটি অংশ প্রতিধ্বনি হিসাবে পুরনায় ট্রান্সডিউসারে ফিরে আসে। পরে এই প্রতিধ্বনিগুলোকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করা হয়। এই তড়িৎ সংকেতগুলো একত্রে মনিটরের পর্দায় পরীক্ষণীয় বস্তু বা পেশির একটি প্রতিবিম্ব গঠন করে।

আল্ট্রাসনোগ্রাফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার স্ত্রীরোগ এবং প্রসূতিবিজ্ঞানে লক্ষ করা যায়। এর সাহায্যে ভ্রূণের আকার, পূর্ণতা, ভ্রূণের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক অবস্থান জানা যায়। প্রসূতিবিদ্যায় এটি একটি দ্রুত, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য কৌশল। আল্ট্রাসনোগ্রাফির সাহায্যে জরায়ুর টিউমার এবং অন্যান্য শ্রোণিতল মাংসের (Pelvic Mass) উপস্থিতিও সনাক্ত করা যায়।

চিত্র ১৪.৩ :আল্ট্রাসনোগ্রাফি

বিভিন্ন ধরনের ডায়াগ্নস্টিক পরীক্ষা যেমন– পিত্তপাথর, হৃদযন্ত্রের ত্রুটি এবং টিউমার সনাক্তকরণে আল্ট্রাসনোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করার জন্য যখন আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহার করা হয় তখন এ পরীক্ষাকে ইকোকার্ডিওগ্রাফি বলে।

এক্সরের তুলনায় আল্ট্রাসনোগ্রাফি অধিকতর নিরাপদ রোগ নির্ণয় পদ্ধতি। তবুও আল্ট্রাসাউন্ড খুব সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া ট্রান্সডিউসারকে সবসময় নড়াচড়ার মধ্যে রাখতে হবে, যেন এটি কোনো নির্দিষ্ট স্থানে স্থির না থাকে।

সিটিস্ক্যান

CT Scan

সিটিস্ক্যান শব্দটি ইংরেজি Computed Tomography Scan এর সংক্ষিপ্ত রূপ। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এটি প্রতিবিম্ব তৈরির একটি প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় কোনো ত্রিমাত্রিক বস্তুর কোনো ফালি (Slice) বা অংশের দ্বিমাত্রিক প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয় সে প্রক্রিয়াকে টমোগ্রাফি বলে। সিটিস্ক্যান একটি বৃহৎ যন্ত্র। এ যন্ত্রে এক্সরে ব্যবহৃত হয়। এক্সরে যেখানে শরীরের অভ্যন্তরের কোনো ত্রিমাত্রিক অঙ্গের দ্বিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠন করে, সেখানে সিটি স্ক্যান যন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবিম্ব ত্রিমাত্রিক।

সিটিস্ক্যান যন্ত্র ডিজিটাল জ্যামিতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে কোনো বস্তুর অভ্যন্তরের ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠন করে। একটি ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে অনেকগুলো দ্বিমাত্রিক এক্সরে প্রতিবিম্ব নেওয়ার পর এগুলোকে একত্রিত করে ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়। এ কাজটি কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। বৃত্তাকার পথে ঘুরার সময় সিটিস্ক্যান যন্ত্র পরপর অনেকগুলো সরু এক্সরে বীম রোগীর শরীরের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করে। অথচ এক্সরে করার সময় রোগীর দেহে শুধুমাত্র একবার এক্সরে বীমটি অতিক্রম করে। ফলে এক্সরের তুলনায় সিটিস্ক্যানের চিত্র অনেক নিখুঁত এবং বিস্তৃত হয়। সিটিস্ক্যান যন্ত্রে ব্যবহৃত এক্সরে ডিটেকটরটির সাহায্যে রোগীর দেহের বিভিন্ন ঘনত্বের শত শত স্তর সনাক্ত করা যায়। ডিটেকটর দ্বারা সংগৃহীত ডাটা কম্পিউটারে প্রেরণ করা হয়। কম্পিউটার পরে শরীরের কোনো অংশের ত্রিমাত্রিক ছবি গঠন করে এবং পর্দায় ডিসপ্লে করে।

চিত্র ১৪.৪: সিটিস্ক্যান যন্ত্র

সিটিস্ক্যানের সাহায্যে শরীরের নরম টিস্যু, রক্তবাহী শিরা বা ধমনী, ফুসফুস, ব্রেন ইত্যাদির ত্রিমাত্রিক ছবি পাওয়া যায়। যকৃত, ফুসফুস এবং অগ্নাশয়ের ক্যান্সার সনাক্ত করার কাজে সিটিস্ক্যান ব্যবহৃত হয়। সিটিস্ক্যানের প্রতিবিম্ব চিকিৎসককে টিউমার সনাক্তকরণ, টিউমারের আকার, অবস্থান এবং টিউমারটি পার্শ্ববর্তী অন্য টিস্যুকে কী পরিমাণ আক্রান্ত করেছে তা নির্ধারণেও সাহায্য করে। মাথার সিটিস্ক্যানের সাহায্যে মস্তিষ্কের ভেতরে কোনো ধরনের রক্তপাত, ধমনীর ফুলা এবং টিউমারের উপস্থিতি সম্পর্কে জানা যায়। সিটিস্ক্যানের দ্বারা রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা আছে কিনা তাও জানা যায়। সাধারণত গর্ভবতী মহিলাদের সিটি স্ক্যান পরীক্ষা করা হয় না। সিটি স্ক্যান পরীক্ষায় 'ডাই' ব্যবহৃত হলে এলার্জিজনিত বিক্রিয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এমআরআই
Magnetic Resonance Imaging

এমআরআই ইংরেজি Magnetic Resonance Imaging এর সংক্ষিপ্তরূপ। এমআরআই যন্ত্রে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র এবং রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে শরীরের কোনো স্থানের বা অঙ্গের বিস্তৃত প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়। নিউক্লীয় চৌম্বক অনুনাদ বা Nuclear Magnetic Resonance এর ভৌত এবং রাসায়নিক নীতির উপর ভিত্তি করে এমআরআই যন্ত্র কাজ করে। এই নীতি ব্যবহার করে কোনো অণুর প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য জানা যায়।

এমআরআই হলো ব্যথাহীন এবং নিরাপদ রোগ নির্ণয় প□তি। এই যন্ত্রে এক্সরে বা অন্য কোনো ধরনের বিকিরণ ব্যবহার করা হয় না। শরীরের যে অংশের এমআরআই স্ক্যান করা হয় সেখান থেকে প্রাপ্ত সংকেতকে একটি কম্পিউটারের সাহায্যে পরিবর্তিত করে সেই অংশের অত্যন্ত সঠিক প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়। প্রত্যেকটি প্রতিবিম্ব শরীরের কোনো স্থানের এক একটি ফালি বা স্লাইসের মতো কাজ করে। এভাবে অনেকগুলো প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয়, যেগুলো শরীরের ঐ অংশের সকল বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলে।

চিত্র ১৪.৫: এমআরআই যন্ত্র

এমআরআই এর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিবিম্বকে পাউরুটির এক একটি ফালির সঙ্গে তুলনা করা যায়। যখন পাউরুটি থেকে এক একটি ফালি উঠানো হয়, তখন ফালির সাথে সাথে পাউরুটির ভেতরের সবটুকু দেখা যায়। একইভাবে এমআরআই এর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি প্রতিবিম্ব শরীরের অভ্যন্তরের সবকিছু দেখতে সাহায্য করে।

পায়ের গোড়ালির মচকানো এবং পিঠের ব্যাথায় এমআরআই ব্যবহার করে জখমের বা আঘাতের তীব্রতা নিরূপণ করা হয়। ব্রেন এবং মেরু রজ্জুর (Spinal cord) বিস্তৃত প্রতিবিম্ব তৈরির জন্য এমআরআই হলো অত্যন্ত মূল্যবান পরীক্ষা।

ইসিজি

ECG

ইসিজি হলো ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (Electrocardiogram) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইসিজি এমন একটি রোগ নির্ণয় প□তি যার সাহায্যে নিয়মিতভাবে কোনো ব্যক্তির হৃৎপিন্ডের বৈদ্যুতিক এবং পেশিজনিত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা যায়। আমরা জানি যে, বাহিরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎযন্ত্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক সংকেত উৎপন্ন করে। এই বৈদ্যুতিক সংকেত হৃৎযন্ত্রের পেশির মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, এর ফলে হৃৎযন্ত্র সংকুচিত হয়। ইসিজি যন্ত্রের সাহায্যে আমরা এই তড়িৎ সংকেতসমূহকে সনাক্ত করি। ইসিজি এর সাহায্যে আমরা হৃৎপিন্ডের স্পন্দনের হার এবং হৃদময়তা পরিমাপ করতে পারি। এটি হৃৎপিন্ডের মধ্যে রক্তপ্রবাহের পরোক্ষ প্রমাণ দেয়।

শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত তড়িদ্বার বা ইলেকট্রোডসমূহ হৃৎযন্ত্রের বিভিন্ন দিক থেকে আগত বৈদ্যুতিক সংকেতগুলোকে সনাক্ত করে। হৃৎপিন্ডের একটি সম্পূর্ণ ছবি পাবার জন্য দশটি ইলেকট্রোড ব্যবহার করে বারোটি বৈদ্যুতিক সংকেতকে সনাক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি হাতে এবং পায়ে একটি করে মোট চারটি এবং বাকী ছয়টি ইলেকট্রোড হৃৎপিন্ডের প্রাচীর বরাবর স্থাপন করা হয় [চিত্র ১৪.৬]। প্রত্যেকটি ইলেকট্রোড দ্বারা সংগৃহীত তড়িৎ সংকেতকে রেকর্ড করা হয়। এই রেকর্ডসমূহের মুদ্রিত রূপই হলো ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম।

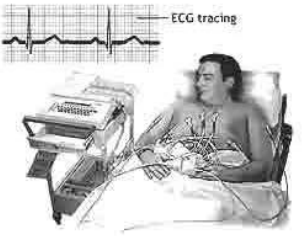

চিত্র ১৪.৬: ইসিজি প□ তি

সুস্থ মানুষের জন্য প্রত্যেক ইলেকট্রোড থেকে প্রাপ্ত তড়িৎ সংকেতের একটি স্বাভাবিক নকশা থাকে। যদি কোনো ব্যক্তির হৃৎযন্ত্রে কোনো ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থা লক্ষ করা যায় তখন ইলেকট্রোডসমূহ থেকে প্রাপ্ত নকশা স্বাভাবিক নকশা থেকে ভিন্নতর হবে।

সাধারণত কোনো রোগের বাহ্যিক লক্ষণ যেমন– বুকের ধড়ফড়ানি, অনিয়মিত ও দ্রুত হৃৎস্পন্দন, বুকে ব্যাথা ইত্যাদির কারণ নির্ণয় করার জন্য ইসিজি পরীক্ষা করতে হয়। এছাড়াও নিয়মিত পরীক্ষার অংশ হিসেবে যেমন– অপারেশনের পূর্বে ইসিজির সাহায্য নেওয়া হয়।

হৃৎপিন্ডের যে সকল অস্বাভাবিক প্রকৃতি ইসিজির মাধ্যমে সনাক্ত করা যায় এগুলো হলো–

১. হৃৎপিন্ডের অস্বাভাবিক স্পন্দন যেমন– হৃৎপিন্ডের স্পন্দনের হার বেশি বা কম বা অনিয়মিত হলে;

২. হার্ট অ্যাটাক যা সম্প্রতি বা কিছুদিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছে;

৩. সম্প্রসারিত হৃৎপিন্ড অর্থাৎ হৃৎপিন্ডের আকার বড় হয়ে যাওয়া।

এন্ডোসকোপি
Endoscopy

এন্ডোসকোপি বলতে সাধারণভাবে কোনো কিছুর ভিতরে দেখাকে বুঝায়। কিন্তু এন্ডোসকোপি বলতে আমরা বুঝি চিকিৎসাজনিত কারণে বা প্রয়োজনে দেহের অভ্যন্তরস্থ কোনো অঙ্গ বা গহ্বরকে বাহির থেকে পর্যবেক্ষণ। এন্ডোসকোপি যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা শরীরের ফাঁপা অঙ্গসমূহের অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা করে থাকি।

চিত্র ১৪.৭: এন্ডোসকোপি যন্ত্র

এন্ডোসকোপ যন্ত্রে দুইটি নল থাকে, এদের একটির মধ্য দিয়ে বাইরে থেকে রোগীর শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গে আলো প্রেরণ করা হয়। আলোক তন্তুর ভিতরের দেয়ালে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে উজ্জ্বল আলো রোগীর দেহ গহ্বরে প্রবেশ করে। এই আলো রোগাক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গকে আলোকিত করে। দ্বিতীয় আলোক তন্তু নলের

ভিতর দিয়ে আলোর প্রতিফলিত অংশ একইভাবে ফিরে আসে। প্রতিফলিত আলো অভিনেত্র লেন্সের মাধ্যমে চিকিৎসকের চোখে প্রবেশ করে। ফলে চিকিৎসক পরীক্ষণীয় অঙ্গের অভ্যন্তরে কী ঘটছে বা হচ্ছে তা দেখতে পারেন।

এন্ডোসকোপির মাধ্যমে চিকিৎসকগণ শরীরের অভ্যন্তরে যেকোনো ধরনের অস্বস্তিবোধ, ক্ষত, প্রদাহ এবং অস্বাভাবিক কোষবৃদ্ধি পরীক্ষা করে থাকেন। নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন অঙ্গ পরীক্ষা করার জন্য এন্ডোসকোপি ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো–

(ক) ফুসফুস, বুকের কেন্দ্রীয় বিভাজন অংশ; (খ) পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র বা কোলন; (গ) স্ত্রী প্রজনন অঙ্গ; (ঘ) উদর এবং পেলভিস; (ঙ) মূত্রথলির অভ্যন্তরভাগ; (চ) নাসাগহ্বর এবং নাকের চারপাশের সাইনাসসমূহ; (ছ) কান।

রেডিওথেরাপি
Radiotherapy

রেডিওথেরাপি শব্দটি ইংরেজি 'Radiation Therapy' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি ব্যবহার করে বিভিন্ন রোগ যেমন– ক্যান্সার, থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক প্রকৃতি, রক্তের কিছু ব্যাধির চিকিৎসা করা হয়। সাধারণত রেডিওথেরাপি উচ্চশক্তিসম্পন্ন এক্সরে ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে। এটি টিউমার কোষের অভ্যন্তরস্থ ডিএনএ (DNA) -কে ধ্বংসের মাধ্যমে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি করার ক্ষমতা বিনষ্ট করে ফেলে। মূলতঃ এটি হলো কোনো রোগের চিকিৎসায় আয়নসৃষ্টিকারী (তেজস্ক্রিয়) বিকিরণের ব্যবহার।

রেডিওথেরাপি দুই ধরনের: (১) বাহ্যিক বীম বিকিরণ বা বাহ্যিক রেডিওথেরাপি (২) অভ্যন্তরীণ রেডিওথেরাপি।

বাহ্যিক রেডিওথেরাপির ক্ষেত্রে শরীরের বাহির থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন এক্সরে, কোবাল্ট বিকিরণ, ইলেকট্রন বা প্রোটন বীম ব্যবহার করা হয়। শরীরের যে স্থানে টিউমারটি অবস্থিত, সেই দিকে তাক করে বীমটি প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি এবং বিভাজন ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ায় অল্প সংখ্যক সুস্থ কোষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবুও আমাদের উদ্দেশ্য হলো কম সংখ্যক সুস্থ কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বেশি সংখ্যক ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করা। ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশে সুস্থ কোষ নিজে থেকে এই ক্ষতি মেরামত করে ফেলে।

চিত্র ১৪.৮: রেডিওথেরাপি যন্ত্র

অভ্যন্তরীণ রেডিওথেরাপির ক্ষেত্রে রোগীকে শরীরের ভেতর থেকে রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় রোগী তেজস্ক্রিয় তরল পদার্থ পানীয় হিসেবে গ্রহণ করে অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে রোগীর দেহে তেজস্ক্রিয় তরল পদার্থ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। রক্তের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এ তরল পদার্থে তেজস্ক্রিয় ফসফরাস, হাড়ের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় স্ট্রনশিয়াম এবং থাইরয়েড ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ব্যবহার করা হয়। এ প্রক্রিয়াকে ব্রাকিথেরাপি বলে।

ইটিটি

ETT

ইংরাজি Exercise Tolerance Test এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ETT বা ইটিটি। উর্ধ্বপেশির হৃৎযন্ত্রের একটি পরীক্ষা হলো ইটিটি। ব্যায়াম বা অনুশীলন চলাকালীন হৃৎপিন্ডের বৈদ্যুতিক সক্রিয়তা বা কর্মক্ষমতা (স্পন্দনের হার, ছন্দময়তা) ইটিটি পরীক্ষার মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়। এটি আসলে অনুশীলনরত অবস্থায় রোগীর ইসিজি পরীক্ষা। করোনারী আর্টারী ডেজিজ রোগ নিরূপণের জন্য এ পরীক্ষাটি খুবই উপকারী। এই পরীক্ষার সময় হৃদযন্ত্রের উপর অনুশীলনের অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করা হয়। পরীক্ষাটির মাধ্যমে হৃৎপিন্ডের করোনারী ধমনীতে সৃষ্ট আংশিক অবরুদ্ধ অবস্থা (Partial Blockage) নির্ণয় করা যায়ে থাকে। সাধারণত বিরামে থাকা অবস্থায় রোগীর দেহে এ ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থা সনাক্ত করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

চিত্র ১৪.৯: ইটিটি পরীক্ষা

পরীক্ষার সময় রোগীকে একটি স্থির ব্যায়সাইকেল চালাতে বলা হয় অথবা একটি ট্রেডমিল যন্ত্রে অনবরত হাঁটার নির্দেশনা দেওয়া হয়। অনুশীলন চলা অবস্থায় চিকিৎসক রোগীর ইসিজি রেকর্ড করেন। পরীক্ষার সময় চাকার ঘূর্ণন গতি এবং তাদের চাপ উপযোজনের মাধ্যমে যান্ত্রিক শীড়নের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হয়। ইটিটি পরীক্ষার মাধ্যমে অনুশীলনের সময় রোগীর হৃৎযন্ত্রে যে সকল পরিবর্তন সংঘটিত হয় চিকিৎসক লেন্সের সাহায্যে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হন।

এনজিওগ্রাফি

Angiography

এনজিওগ্রাফি হলো এমন একটি প্রতিবিম্ব তৈরির পরীক্ষা যেখানে পরীক্ষার রক্তনালিকাসমূহ দেখার জন্য এক্সরে ব্যবহার করা হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তবাহী শিরা বা ধমনীগুলোর সরু, ব্লক ও প্রসারিত অংশে কী পরিমাণ ব্লক রয়েছে তা নির্ণয় করা যায়। রক্তনালিতে ব্লক এবং রক্তনালি সরু এবং অস্বাভাবিক প্রসার চিহ্নিত করা যায়। এনজিওগ্রাম করার সময় চিকিৎসক রোগীর দেহে একটি ক্যাথেটার একটি সরু ও নমনীয় নলের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেন। ক্যাথেটারটিকে 'তার' এবং নলটিকে ক্যাথেটার বলে। এই তার ব্যবহারের ফলে রক্তবাহী নালিকাগুলো এক্সরের সাহায্যে দৃশ্যমান হয়। এই তার পরে বিপদ এবং মুছে মাধ্যমে পরীক্ষা থেকে বের করে নেয়া হয়। একটি নির্দিষ্ট প্রবেশ বিন্দুর মধ্য দিয়ে ক্যাথেটারটিকে নির্দিষ্ট ধমনী বা শিরায় প্রবেশ করানো হয়। প্রবেশ বিন্দুটি পরীক্ষা করে কোনো সমস্যা রক্তনালিতে হতে পারে। ব্যবহৃত তরলটিকে কখনো কখনো কৈরূপ্য বা Contrast হিসেবে অভিহিত করা হয়।

চিত্র ১৪.১০: এনজিওগ্রাম

সাধারণত যে সকল কারণে চিকিৎসকগণ এনজিওগ্রাম করার পরামর্শ দেন, এগুলো হলো–

(ক) হৃৎপিন্ডের বাহিরে ধমনীতে ব্লকেজ হলে;

(খ) ধমনী প্রসারিত হলে;

(গ) কিডনির ধমনীর অবস্থা বুঝার জন্য;

(ঘ) শিরার কোনো সমস্যা হলে।

কখনো কখনো চিকিৎসকগণ এনজিওগ্রাম করার সময় একই সময়ে সার্জারী ছাড়াই রক্তনালির ব্লকের চিকিৎসা করে থাকেন। যে কৌশলে বা প্রক্রিয়ায় এনজিওগ্রাম করার সময় ধমনীর ব্লক মুক্ত করা হয় তাকে এনজিওপ্লাস্টি বলে।

আইসোটোপ এবং এর ব্যবহার

Isotopes and its uses

আইসোটোপগুলো হলো একটি নির্দিষ্ট মৌলের রূপভেদ। বিভিন্ন ভরসংখ্যাবিশিষ্ট একই মৌলের পরমাণুকে ঐ মৌলের আইসোটোপ বলে। অর্থাৎ কোনো মৌলের আইসোটোপসমূহে প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকে, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন হয়। কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যা মৌলটিকে অনন্যরূপে সনাক্ত করে। কিন্তু নীতিগতভাবে একটি মৌলের যেকোনো সংখ্যক নিউট্রন থাকতে পারে। মৌলের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন এবং নিউট্রনের সংখ্যাই হলো এর ভরসংখ্যা। এ কারণেই কোনো মৌলের প্রত্যেকটি আইসোটোপের ভরসংখ্যা বিভিন্ন হয়। উদাহরণ হিসেবে কার্বনের কথা বলা যেতে পারে। কার্বনের তিনটি আইসোটোপ ${}^{12}_{6}C$, ${}^{13}_{6}C$ এবং ${}^{14}_{6}C$, যাদের ভরসংখ্যা যথাক্রমে 12,13,14। কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা 6, অর্থাৎ প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণুতে ছয়টি প্রোটন আছে। যার ফলে কার্বনের আইসোটোপগুলোতে যথাক্রমে 6,7এবং 8 টি নিউট্রন রয়েছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে 'পরমাণু চিকিৎসায়' তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রধানত দুই ধরনের ব্যবহার আছে।

(ক) রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে

(খ) রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে

রোগীর শরীরে কোনো স্থানে বা অঙ্গে ক্ষতিকর ক্যান্সার টিউমারের উপস্থিতি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে সনাক্ত করা যায়। কোবাল্ট-60 (^{60}Co) আইসোটোপ থেকে নির্গত শক্তিশালী গামা রশ্মি ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। কোবাল্ট-60 থেকে নির্গত গামা রশ্মির সাহায্যে অপারেশনের যন্ত্রপাতি রোগ জীবাণুমুক্ত করা হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ডের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত রোগের চিকিৎসায় আয়োডিন-131(^{131}I) ব্যবহৃত হয়। টেকনিশিয়াম-99m রোগ নির্ণয়ের জন্য পরমাণু চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। এটির সাহায্যে ব্রেন, লিভার, প্লীহা এবং হাড়ের ইমেজিং বা স্ক্যানিং সম্পন্ন করা হয়। রক্তের শ্বেত কণিকার অত্যধিক বৃদ্ধি ফলে রক্তাল্পতা (Blood-Leukaemia) রোগের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় ফসফরাস-32 (^{32}P) এর ফসফেট ব্যবহৃত হয়। পরমাণু চিকিৎসায় রোগ নির্ণয়ের জন্য শিরার মধ্য দিয়ে ইনজেকশনের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয়। রোগীর কোনো অঙ্গের পরীক্ষা করা হবে তার উপর নির্ভর করেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্বাচন করা হয়। এছাড়া কৃষিক্ষেত্রে, খাদ্যসংরক্ষণে, কীটপতঙ্গ দমনে এবং শিল্পক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

১। বিজ্ঞানী জগীশচন্দ্র বসুর সাথে কোন বিষয়টি সংশ্লিষ্ট?

i) বসু মন্দির প্রতিষ্ঠা
ii) তেজস্ক্রিয় মৌলের ব্যবহার
iii) ক্রেস্কোগ্রাফ আবিষ্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii
গ) i ও iii ঘ) i,ii ও iii

২। X-ray ফিল্মে হাড়ের ছবি স্পষ্ট দেখা যাওয়ার কারণ–

ক) হাড় X-ray দ্বারা অভেদ্য খ) মাংসপেশি X-ray দ্বারা অভেদ্য
গ) তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক বেশি ঘ) উঁচু ভেদনক্ষমতাসম্পন্ন

৩। সূক্ষ্ম রক্তনালিকার ব্লকেজ পরীক্ষা করার প্রযুক্তির নাম হলো–

ক) এনজিওগ্রাম খ) এনজিওপ্লাস্টি
গ) ইটিটি ঘ) ইসিজি

৪। হৃদ স্পন্দনের হার ও ছন্দময়তা পরিমাপ করা হয় কী উপায়ে?

ক) তড়িৎ সংকেত সনাক্ত করে খ) X-ray এর মাধ্যমে
গ) নিউক্লীয় চৌম্বক অনুনাদের মাধ্যমে ঘ) শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

বিনুর চাচী মা হতে চলেছেন। চেক আপের জন্য তিনি নিয়মিত ডাক্তারের কাছে যান। কোন এক মাসে ডাক্তার ভ্রূণের সঠিক অবস্থান ও আকার জানার জন্য তাকে একটি পরীক্ষা করার পরামর্শ দিলেন। আলট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে তিনি পরীক্ষাটি করালেন এবং এর মাধ্যমে ডাক্তার ভ্রূণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করেন।

ক) এম আর আই এর পূর্ণরূপ কী?

খ) আইসোটোপগুলো একটি নির্দিষ্ট মৌলের রূপভেদ কেন?

গ) ভ্রূণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভে আলট্রাসনোগ্রাফির ভূমিকা আলোচনা কর।

ঘ) মিনার চাচীর পরীক্ষাটি অন্য কোনো চিকিৎসা প্রযুক্তির মাধ্যমে করা যাবে কি?–উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

গ. সাধারণ প্রশ্ন

১। ভৌতজগৎ ও জীবজগৎ কী সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে চলে?

২। জীবপদার্থবিজ্ঞানের সূচনা কীভাবে হলো।

৩। পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো কেন জীবজগতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়?

৪। পদার্থবিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান বর্ণনা কর।

৫। জীবপদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান কী?

৬। মানবদেহ কখনো কখনো যন্ত্রের মতো আচরণ করে ব্যাখ্যা কর।

৭। মানবদেহ একটি জৈব যন্ত্র– এর সপক্ষে যুক্তি দাও।

৮। পদার্থবিজ্ঞানের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি কীভাবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কাজে লাগে।

৯। রোগ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত কতগুলো যন্ত্রপাতির নাম লিখ।

১০। এক্সরে কী ? রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর ব্যবহার লিখ।

১১। আল্ট্রাসনোগ্রাফি কীভাবে চিকিৎসাক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করে।

১২। এমআরআই এর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিবিম্বের বর্ণনা দাও।

১৩। ইসিজির সাহায্যে কোন কোন রোগ নির্ণয় করা যায়?

১৪। এন্ডোসকোপি যন্ত্র কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

১৫। চিকিৎসাক্ষেত্রে রেডিওথেরাপি কেন ব্যবহার করা হয়?

১৬। ইটিটি এক ধরনের ইসিজি পরীক্ষা– বর্ণনা কর।

১৭। কোন কোন ক্ষেত্রে এনজিওগ্রাম করা হয়?

১৮। আইসোটোপ কী? চিকিৎসাক্ষেত্রে এটি কী কাজে লাগে?

–০–

২০১৭
শিক্ষাবর্ষ
৯–১০ পদার্থ

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সমুদয় কাজই সাহস ও সকলের
ওপর নির্ভরশীল

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯২১ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘন্টা সার্ভিস) ফোন করুন

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য